ভেলাকিদিদির জন্য

অনুকম্পায়ী পাঠকবৃন্দ সহজেই আবিষ্কার করবেন, ছোটো-বড়ো যে-প্রবন্ধগুচ্ছ 'সমাজ, স্মৃতি, সাহিত্য' শিরোনামে তাঁদের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলি অধিকাংশই গত এক বছর-দু'বছরের মধ্যে লেখা। অস্থির সময়, অস্থির সমাজ, সেই অস্থিরতার কিছু-কিছু বৃত্তান্ত নিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলা, এবং তা পড়শিদের শোনানোর জন্য হয়তো একটু সন্তর্পণ ইচ্ছা। সেই সঙ্গে খুঁজে-পেতে কয়েকটি পুরোনো লেখাও এখানে জড়ো করা হয়েছে, অন্যথা তারা একেবারেই হারিয়ে যেত। তবে তাতে মহাভারত যে অশুদ্ধ হতো এমন নয়।

কারো-কারো কাছে সন্নিবিষ্ট রচনাগুলিকে একটু পাঁচমিশেলি গোছের মনে হতে পারে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী তো সেই কবেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, 'সহিত' থেকে 'সাহিত্য', সমাজ থেকেই সাহিত্যের সঞ্চার। যা যোগ করবার, সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তিক স্মৃতি মাঝে-মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে, এই বইয়ের জন্য প্রবন্ধ নির্বাচনে সেরকম সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে।

'তাঁর সময় আর এলো না' প্রবন্ধটি কয়েক বছর আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত আবুল হাশিম স্মারক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। অন্য রচনাগুলি নিম্নোল্লিখিত পত্রিকাদিতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল : 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'একক মাত্রা', 'একুশ শতক', 'এবং এই সময়', 'কোরক', 'দেশ', 'নন্দন', 'নীললোহিত', 'বইয়ের দেশ', 'বাংলার আভাষ'।

অশোক মিত্র

সূচি

আপাততঃ ১

স্মৃতি থেকে ইতিহাস ৯

বাধ্যবাধকতা ১৫

একটি বিনীত প্রস্তাব ২০

চিন্তা করে ডিম পাড়ুন ২৮

ইনকিলাব মুর্দাবাদ ৩৫

আদর্শ বনাম আদর্শবিস্মৃতি ৪৪

দোহাই, উদ্ধৃতি দেবেন না ৫৬

দক্ষিণায়ন ৬২

বাড়ি, পাড়া, পরিবৃত্ত ৭০

কিছু আর্ত জিজ্ঞাসা ৭৫

নিয়তি কেন বাধ্যতে ৮৩

পঞ্চাশ বছর আগেকার এক রোমাঞ্চ কাহিনী ৮৮

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে ৯৬

একদা নিশীথকালে ১০৫
বঙ্গ সংস্কৃতি ১১১
অগ্রগামী নিরক্ষরতা ১১৮
তাঁর সময় আর এলো না ১২২
বাংলা গদ্যের যুগ্ম পিতৃত্ব ১৩০
এক শতাব্দী পিছিয়ে ১৩৭
'বিস্মৃত বাংলা' ১৪২
মহানুভব আদর্শবাদী চিন্তাবিদ ১৫০
গোয়েন্দা গল্প থেকে দর্শনে ১৫৭
হালকা চালে গভীর কথা ১৬৪
বিজ্ঞানে ভুলে আমাকো মা ১৭১
'দুনিয়াদারী'? ১৭৮
সমাজ অব্যবস্থা ১৮৬
বাংলার নানা মুখ ১৯২
আভিধানিক ১৯৮
অন্য ভূমিকায় জীবনানন্দ ২০১
আসুন, পরিমিতিবোধে ফিরি ২০৭
যোতন কোথায় ২১৬
গদ্য, যা কবিতারও অধিক ২১৯
আকাশের নীল শূন্যে? ২৩১
কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে ২৩৯
আমার মৃত্যুর পর ২৪৩

সমাজ, স্মৃতি, সাহিত্য

আপাতত

একটা সময় ছিল বাঙালি সাংস্কৃতিক মহলে অবৈকল্য শব্দটি বহু ব্যবহৃত হতো। এখন হয় না। হয় না তার প্রধান কারণ সম্ভবত সমসাময়িক সমাজবর্তীরা কেউই আর অবিকল থাকা পছন্দ করেন না। বিশ্বায়নের ঘোরের মধ্যে আছি আমি, আপনি ও অন্য পড়শিরা। কেবল ঘুরছি এবং ঘুরছি এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে · আমরা বদলে যেতে চাই, পাল্টে যেতে চাই। অবৈকল্য পীড়ায় ভুগছি এমন অপবাদ আমাদের যেন কেউ না দিতে পারেন।

শ্রেণি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের বহুধা বিভাগে আরক্ত দেশ, কিন্তু যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তি, তাঁদের স্থূলে ভুল নেই। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী অতীতের গর্ভে পুনরায় সেঁধিয়ে যেতে চান। যদি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অন্ধ পুরাণ-প্রেমের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়, তা হলে তো কথাই নেই। আসলে গোটা দেশটা তো শেষ পর্যন্ত অর্থ ব্যবস্থার ক্রীড়নক। শ্রেণিভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে, এবং তদুপরি প্রসারিত করতে হলে, ফের কলোনি বনে যাওয়াই উত্তম সিদ্ধান্ত। আদৌ কোনো চিন্তাভাবনা করতে হবে না তাহলে। বিদেশি মালিকরা সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেবেন, দেশের উচ্চবিত্ততরদের জন্য তাঁরা করুণায় উথলে উঠে তাদের জন্য অনন্তকাল

সচ্ছল ভরণপোষণের আয়োজন রাখবেন। সারা পৃথিবী জুড়ে যে-জীবনদর্শন চালু হয়েছে, তাতে বিন্দুতম ফাঁকফোকর নেই। দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছক কাটা হয়েছে : (ক) মহান বিশ্বে একমাত্র বড়োলোক টিকে থাকবে, এবং (খ) টিকে থাকা প্রতিটি দেশেই প্রায় তেমনি, একমাত্র বড়োলোকরাই টিকে থাকবে, গরিবদের কোতল করা হবে, খতম করা হবে। বড়োলোক দেশগুলি ভর্তুকি দিয়ে যে-যে পণ্য উৎপন্ন করবে, সে-সব বিনাশুল্কে গরিব দেশগুলিতে ঢুকে পড়ে সেখানকার বাজার দখল করবে, দখল-করা দেশে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষরা মারা পড়বেন। কিন্তু গরিব কোনো দেশের কোনো এক্তিয়ার থাকবে না এই মারা-পড়তে-যাওয়া মানুষগুলিকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করার। দরিদ্র দেশে রাষ্ট্র থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ্রমিকদের টিকিয়ে রাখা চলবে না, কৃষকদের অনুদান দেওয়া নিষিদ্ধ হবে, চড়া-বাজারে-পণ্য-কিনতে-অক্ষম জনগণের জন্য ভর্তুকি দিয়ে খাদ্য বিলোনো চলবে না, এবং এটা যোগ করা তো বাহুল্য গরিব দেশের পণ্যাদি বিনাশুল্কে বিনা বাধায় ধনী দেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে না।

অসম ব্যবস্থা, কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে অসম ব্যবস্থাই নাকি ন্যায়ধর্ম। ন্যায়-অন্যায় জানিনে-মানিনে ব্যাপার নয়, যা এতদিন প্রচলিত দর্শনের প্রজ্ঞায় অন্যায় বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে, এখন থেকে তা-ই ন্যায়, অনৃতভাষণই সত্যবাদিতা, দ্বিরাচার যথার্থ চারিত্র্যলক্ষণ।

আপাতত ইতিহাসের প্রগতি-উন্মুখ ভূমিকায় বিশ্বাস রাখা তাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। আপাতত আমাদের এই উথালপাথাল ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়েই পথ কেটে এগোতে হবে, অর্থাৎ এগোনোর অছিলায় পিছিয়ে যেতে হবে। সমাজচেতনা দুর্বল তথা অস্বচ্ছ, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণিবিভাজনের কলুষতায় দরিদ্রতর শ্রেণি সহস্র-বিচ্ছিন্ন,

আন্দোলন স্তব্ধ। স্রেফ মুখের কথায় পাঁচ লক্ষ রাজকর্মচারী-শিক্ষককুলকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বরখাস্ত করতে পারেন, কারাগার কক্ষে নিক্ষেপ করতে পারেন। কোনো প্রতিবাদের উচ্চারণ উত্থিত হয় না, সর্বোচ্চ বিচারালয় মুখ্যমন্ত্রীকে তারিফ জানান, এবং বরখাস্ত-হওয়া কয়েক লক্ষ জনকে নির্দেশ জ্ঞাপন করেন, ভালো চাও তো আভূমি লম্বিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি হয়তো বেছে-বেছে তোমাদের মধ্য থেকে সুবাধ্য কয়েক জনকে ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারেন। এখানে-ওখানে একটি-দুটি সংগঠন, একজন-দুজন বিবেকবান ব্যক্তি নিচুস্বরে প্রতিবাদ জানাতে প্রয়াসবান হন। তাঁদের কণ্ঠস্বর হাওয়ায় ভেসে যায়। বিশ্বায়িত শাসকবর্গ, বিশ্বায়িত সংবাদ, বিশ্বায়িত উচ্চবিত্তদের চেতনা, তাঁরা তো বাঁচবেন, তাঁরা তো ফুলবেন, গরিবরা না বাঁচলে ক্ষতি কী? একেই তো গরিবরা নোংরা জামাকাপড় পরে থাকে, অপরিচ্ছন্ন ভাষায় কথা বলে, সভা-মিছিল করে পরিবেশ দূষণে মগ্ন হয়, এদের ঝেড়ে নির্বংশ করাই তো জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে শ্রেয়তম কর্তব্য।

খোলাখুলি এ ধরনের মত ব্যক্ত হয়, স্বতঃসিদ্ধতা হিশেবে মেনে নেওয়া হয়। কারণ যে রাহুগ্রস্ত অবস্থায় আমরা আছি, বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল না মেলালে আমাদেরও ঘটিবাটি যাবে, আমরাও বিনষ্ট হবো। মার্কিন দর্শন সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছে, আমি বেঁচে-বর্তে থাকলেই হলো, আমার পড়শি বাঁচলো কি মরলো তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

একজন-দুজন বদ্ধ পাগল খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে হয়তো একটু অন্যরকম কথা বলবার চেষ্টা করবে, তারা পরিত্যাজ্য, তাদের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে তারা শূন্যত্বপ্রাপ্ত হবে।

তবে ভয়ে-ভাবনায়-আশঙ্কায় যদিও আপাতত অবস্থান, তা হলেও মাঝে-মাঝে সমর সেনের কবিতা পেড়ে বলতে ইচ্ছা করে একদিন এই পঙ্গু পৃথিবীতেও আকাশগঙ্গা নামবে, কারণ গোটা মানবজাতিকে কিছুদিন মাদক খাইয়ে বেহুঁশ রাখা যায়, সত্যকে অসত্য, ন্যায়কে অন্যায় বলে জাহির করা যায়, কিন্তু আখেরে ইতিহাস পুনরায় তার নির্দিষ্ট ঘরানায় স্থিত হবে, অবৈকল্য প্রত্যাবর্তন করবে, সেই অবৈকল্য থেকে সরে এসে সমাজ বিকল হবে, সমাজে বিপ্লব ঘটবে, আপাতত অনাদরে যারা কুণ্ঠিত, ভবিষ্যৎ তাদের চিনে নিয়ে সাদরে বরণ করবে।

এবং, কে জানে, লক্ষণাদি দেখে সন্দেহ হয়, এই চাকা ঘোরার পালা শুরু হবে হয়তো খোদ মার্কিন দেশেই, এবং, সেই সঙ্গে, পশ্চিম এশিয়ায়। এডওয়ার্ড সইদ-একবাল আহমেদদের প্রেরণায় ভর দিয়ে আরব জাতি ক্রমশ শ্রেণিদ্বন্দ্বের ব্যাকরণ রপ্ত করবে, প্রতিটি আরব দেশে বিস্ফোরণ ঘটবে। তা ছাড়া ল্যাটিনরা তো ক্ষেপেই আছে, ক্রমশ আরো খেপছে। যে-বিদ্রোহের বীজ একদা নিঃসঙ্গ কিউবা দ্বীপে উপ্ত ছিল, তা ছড়িয়েছে ব্রাজিলে, ভেনেজুয়েলায়, আর্জেন্টিনায়, বলিভিয়ায়; আরো ছড়াবে।

কিন্তু নিজের দেশ ভারতবর্ষ নিয়ে আশায় উদ্বেল হতে পারি না, এমন কী পশ্চিম বাংলা নিয়েও পারি না। অচলায়তনে ফাটল ধরাতে গেলে প্রায়োগিক কুশলতা রপ্ত করতে হয়, তার আগে রপ্ত করতে হয় প্রায়োগিক বিজ্ঞান। কিন্তু আদর্শের পলিমাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিজ্ঞানসাধনায় উন্নতি ঘটানো অসম্ভব। অথচ আদর্শের ফসলেই আপাতত দেশ জুড়ে খামতি। পুরাণ-প্রেমিকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও চলে : তাঁরা অন্তত তাঁদের লক্ষ্যে-আদর্শে স্থির আছেন, তাঁরা জানেন কোন সর্বনাশের প্রত্যন্তে তাঁরা পৌঁছুতে চান, সেই

সর্বনাশের বিষকুম্ভে তাঁরা সততসঞ্চারমান হবেন। তারপর কী ঘটবে সেই প্রশ্ন করা অভব্যতা হবে, অন্তত তাই তাঁরা মনে করেন। রামরাজ্যে সর্বাচ্ছন্দ-অখণ্ডতা নিয়ে সংশয় মারাত্মক অপরাধ, যার শাস্তি তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু বামপন্থী আদর্শবাদের কী অবস্থা, বিশেষ করে বঙ্গভাষী বামপন্থী চিন্তাবিদদের? তাঁদের একটি বড়ো অংশ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওয়ের দিন পেরিয়ে এসেছেন। বিশেষত সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসানের পর তাঁরা এমন কী তোতাপাখির মতো নামতা পড়তেও আর আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁদের এটাও উপলব্ধির বাইরে যে কোনো একটি আদর্শকেন্দ্রিক পরীক্ষা কোথাও ধুলোয় অবগুণ্ঠিত হলেও তা সেই আদর্শের অলীকত্ব প্রমাণ করে না। এদেশে-ওদেশে কমিউনিস্ট পার্টিতে যেহেতু ঘুণ ধরেছিল, অতএব বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বও বাস্তবে ভিত্তিহীন স্বপ্নবিলাস, তা কোনো যুক্তিতেই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু একদঙ্গল নেতা হীনম্মন্যতায় ভুগছেন, আর পাশে থেকে তাঁদের উৎসাহ জুগিয়ে দিচ্ছেন আর একদঙ্গল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। এঁদের ধ্যানধারণা অনেকটা এরকম : আমাদের তো এখন ফাঁসিকাঠে লটকাতে হবেই, সুতরাং, আসুন, আজ সবাই মিলে শেষ প্রহরে একটু ফিস্টি-ফূর্তি করা যাক।

রবীন্দ্রনাথই তো অতি খাঁটি কথা বলে গেছেন, যারা যেতে চায় তাদের যেতে দাও। সুতরাং বিশ্বায়নে যাঁরা গলে গিয়ে ঢলে পড়তে চান, হালের মার্কিন ভাবনার শরীরে নিজেদের চিন্তা মিশিয়ে দিতে চান, তাঁদের নিয়ে আলোচনার সার্থকতা নেই। সমস্যা অন্যত্র, সমস্যা তাঁদের নিয়ে, যাঁরা মনে করেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বড়ো মান্ধাতার আমলের ব্যাপার হয়ে গেছে, তাকে সম্যক পরিমাণে পরিমার্জনা করে নতুন সংস্করণের আকার না দিলে শেষ রক্ষা সম্ভব নয়। এখন যত্রতত্র

তাই অনেক ধরনের চতুরালি প্রকাশ পাচ্ছে। সেদিন এক পণ্ডিতপ্রবরের বই হাতে এলো। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা অনেক গবেষণা করে নিজেদের কাছে প্রমাণ করেছেন, ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব আসলে প্রতিবিপ্লব, আমলাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানোর লক্ষ্য নিয়ে সাধিত সেই তথাকথিত বিপ্লব; যেহেতু ১৯২১ সালে মিখাইল গর্বাচভ ও বরিস ইয়েলৎসিনের যুগ্ম প্রযোজনায় সেই লক্ষ্মীছাড়া প্রতিবিপ্লব, টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, এই দুই মহারথী, গর্বাচভ ও ইয়েলৎসিন, যথার্থ বিপ্লবী, বিপ্লবের যুগ শুরু ১৯২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে।

যে-কোনো নৈরাজ্যের মুহূর্তে যে-কেউ নিজেকে মহৎ বলে প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লাগতে পারেন; যেহেতু প্রত্যেকেই নৈরাজ্য গঠনে ব্যস্ত, অপরের ক্ষ্যাপামি আর কাউকেই বিচলিত করে না। উত্তর-ঔপনিবেশিক মার্কসবাদী তথা উত্তর-আধুনিকবাদীরা এই সুযোগ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছে মার্কস-লেনিন-স্তালিন-মাও উচ্চারণে পাপ না হয়ে পারে না; তবে ওই ইটালিয়ান ভদ্রলোকের নাম নিতে অসুবিধা নেই, তিনি তো একটু অন্যরকম কথা বলেছিলেন, দলের বাইরেও যে-মানবসমাজের অস্তিত্ব, তার বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন, অতএব তাঁর বুলি মাঝে-মাঝে ছুঁইয়ে আসা যেতে পারে। অথচ এই পণ্ডিতবর্গ স্বচ্ছন্দে ভুলে যান, আন্তেনিও গ্রামশি ইটালীয় পার্টির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক, তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি সমস্তই পার্টি সংগঠনের পরিকাঠামো ঘিরে, সেই পরিকাঠামোকে একটি উন্নততর সর্গে পৌঁছনোর নিমিত্তে। তবে এ-সমস্ত আজেবাজে কথা বলে উত্তর-মার্কসবাদী উত্তর-আধুনিকদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। তাঁরাই তো এখন বাঙালি সমাজে ভাবনার আসর জাঁকিয়ে বসেছেন--

জনে-জনে একে-ওকে-তাকে ডেকে শাসাচ্ছেন, আপনাদের মস্তিষ্ক মার্কসীয় তত্ত্বের গোবরে ঠাসা, তা আগে পুরোটা বের করে দিন, তারপরেই বিচূর্ণীকরণের তত্ত্ব ও দর্শন উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনারা কি তৈরি? আপনাদের যদি তৈরি হতে বিলম্ব থাকে, আপনাদের ফেলেই আমরা এগিয়ে যাবো, আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাঁধবে।

যে-কোনো যুগে যে-কোনো কালে এরকম হয়ে এসেছে, হওয়া সম্ভব। আদি বিশ্বাসের খুঁটি নড়ে গেছে, পিছনের দিকে কি ছিল তা দেখা যাচ্ছে না, সামনের দিকেও সমান অস্পষ্ট। এই অবস্থায় আদর্শের বন্ধন আলগা হয়ে আসে, পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্যরা কেরামতির দিকে ঝোঁকেন, উত্তর-আধুনিকরাও ঝুঁকেছেন। সার্ত্র-ব্যুভিয়ের দ্বারা লালিত অস্তিত্ববাদ অণুর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছিল। সেই ঘোষণা নিয়ে একদা প্রচুর জল ঘোলা, মানবমুক্তির সম্ভাবনা কতটা পরাহত সেই তর্কের অন্তিমেও কিন্তু এই সিদ্ধান্তে স্থিত হওয়া : কম্যুনিস্ট পার্টিকে মানি বা না মানি, কমিউনিস্ট সৌভ্রাত্রকে অস্বীকার অকল্পনীয়। তারপর তো আরো অনেক ঘটনাক্রমের পরম্পরাগত শোভাযাত্রা। ফুকো, অ্যালথুসর, দেরিদা, সবার উপরে টুকরো সত্য তার উপরে নেই। অস্তিত্বকেই টুকরো করে নাও, চেতনাকে ছোরার ফলা বসিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করো: কোনো সামগ্রিক দর্শন নয়, খণ্ডিত শব্দই স্বয়ম্ভু খণ্ডিত অনুভূতি, মানব ইতিহাস। যে-কোনো পত্রপত্রিকা খুলে দেখুন, দিস্তা-দিস্তা তত্ত্ব কপচানো হচ্ছে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে, দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে, ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

এক হিশেবে উত্তর-আধুনিক দার্শনিকম্মন্যদের উল্টোরথের পথ দেখিয়েছেন এক শ্রেণির নব-ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানীরা। তাঁরা অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, সমাজকল্যাণ বলে কিছু নেই, কিছু থাকতে

পারে না; সমাজ একটি কল্পিত সমষ্টি, কিন্তু তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, একটি মানুষের আচার-বিচার পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের বিচরণ-বিভঙ্গ-মতামতকে সমসূত্রে গাঁথবার কোনো প্রকরণকুশলতা নেই, যেহেতু ধনবিজ্ঞানে নেই, অতএব সমাজবিজ্ঞানেও নেই, ইত্যাকার সমীকরণ অসম্ভব। আপাতত এই অসম্ভবপরতার তত্ত্ব নিয়ে অর্থনীতিবিদরা উত্তেজিত কী চমৎকার কথা ওঁরা বলেছেন, শুনে হৃদয় জুড়িয়ে যায়। সমাজ বলে কোনো বস্তুই নেই, অতএব সমাজভাবনাও বরবাদ।

দুনিয়া এখন থেকে হবে কত মজাদার। আমরা ব্যক্তিস্বার্থ নিয়েই বেঁচে-বর্তে থাকতে পারবো। উত্তর-আধুনিকরা বিমূর্ত বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে গভীর থেকে গভীরতরতায় যাবেন, অসম্ভবপরতা তত্ত্বের উপাসকরাও যাবেন। আমাদের বাঙালি সমাজে মানসভূমিতে নতুন করে উপনিবেশবাদ শিকড় গেড়ে বসবে।

স্মৃতি থেকে ইতিহাস

জাতির স্মৃতি, সমাজের স্মৃতি, পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষের স্মৃতিও। জাতি ও সমাজের স্মৃতি, বিবিধ উপাদানের সাহায্যে, ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়। শিলালিপি, পুঁথিতে উল্লিখিত বৃত্তান্ত, লোকগাথা, হুমায়ুন-নামা গোছের চরিতমালায় বিধৃত সমসাময়িক মন্তব্য-টীকা-টিপ্পনী, ইত্যাকার উপকরণ ইতিহাসবিদদের প্রতিভার জাদুতে সুচারু আদল পায়, জাতি তথা সমাজের ইতিবৃত্ত জন্মগ্রহণ করে। কখনো-কখনো এমনধারা রচিত ইতিহাস, ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের অন্তর্গত বিভিন্নতার পরিণামে, বিশেষ-বিশেষ আদল পায়, অনেকটা সেই বিখ্যাত জাপানি চলচ্চিত্র 'রশোমন'-এ দৃষ্টান্তিত একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যানের মতো।

তবে ব্যক্তিমানুষের স্মৃতিও তো ইতিহাসের উপাদান। যাঁরা বাণভট্টের মতো হর্ষবর্ধনের সময়কার সমাজবিন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কিংবা যাঁরা মুঘল দরবারের কীর্তিকলাপ নিয়ে প্রতি দিন বা প্রতি সপ্তাহে ব্যক্তিগত রোজনামচা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, তাঁরা ইতিহাসের উপাদান চয়নের দায়িত্ব পালন করেছেন, হয় অন্যমনস্কতার সঙ্গে, নয়তো সজ্ঞান

কর্তব্যবোধের তাড়নায়। একগুচ্ছ আত্মস্মৃতি পর পর সাজিয়ে নিলে তা বোধ হয় একটি নির্দিষ্ট যুগের অনেকটা ইতিহাস জুগিয়ে দিতে পারে।

'সমসাময়িক ইতিহাস' আখ্যা-ভূষিত একটি একটু নতুন ধরনের বিদ্যাচর্চা এখন বিদগ্ধমহলে জায়গা করে নিয়েছে। অনতি-অতীত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা একশো-দুশো বছর বাদে আরো ভারিক্কি চেহারা নেবে, 'সমসাময়িক' বিশেষণটি তার বৈশিষ্ট্য হারাবে। তবে এক হিশেবে ব্যক্তিমানুষের স্মৃতিও তো সমসাময়িক ইতিহাসের গোত্রভুক্ত। যে-মানুষটি আশি-নব্বুই বছর বেঁচে রয়েছেন, তাঁর স্মৃতির খাঁচায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী ষাট-সত্তর বছরের সামাজিক ইতিহাসের একটি বয়ান অবশ্যই আটকে আছে। তাঁর জন্মের বেশ কয়েক দশক বাদে যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন, ইতিহাসের কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁরা যদি এই এখনো-টিঁকে-থাকা বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের স্মৃতির সাক্ষ্য পুরোপুরি অবজ্ঞা না করেন, তাতে ক্ষতি বৃদ্ধির চেয়ে ক্ষতি লাঘবেরই সম্ভবত অধিকতর সম্ভাবনা।

কথাটি মনে হলো হুগলি জেলার সিঙ্গুর অঞ্চলে কৃষিভূমি অধিগ্রহণান্তে টাটা গোষ্ঠীর প্রস্তাবিত মোটর কারখানা তৈরি করা নিয়ে যে-বিতর্ক শুরু হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে। যাঁরা এই কারখানা দ্রুত তৈরি হওয়ার ব্যাপারে ঘোর উৎসাহী, তাঁদের একজন সম্প্রতি খুব জোর দিয়ে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : (ক) টাটা গোষ্ঠী যখনই যেখানে শিল্পোদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন, সেই অঞ্চলে তাঁরা অচিরে জাদু ঘটিয়েছেন, অঞ্চলের জনগণ ঐশ্বর্য-বৈভবের প্রাচুর্যে প্লাবিত হয়েছেন; এবং (খ) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যেমন কখনো সূর্য অস্ত যেত না, টাটা গোষ্ঠী-পরিচালিত সমস্ত শিল্পেও তেমনই শ্রমিক-অশান্তি ব্যাপারটি আদৌ নেই, কদাচ নেই; গোষ্ঠীর কর্তাব্যক্তিরা এত

হৃদয়বান, সুবিবেচক, শ্রমিকশ্রেণির জন্য তাঁদের সর্বদা এত প্রাণ পোড়ে যে তাঁদের কোনো কারখানায় কোনো দিন ধর্মঘট ঘটেনি, ঘটে না।

সমসাময়িক ইতিহাস কিংবা ব্যক্তিমানুষের স্মৃতির সাক্ষ্য কিন্তু এই দুটি উক্তির যাথার্থ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবে। টাটা গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি জামশেদপুরের ইস্পাত শিল্পের কথাই ধরুন না কেন। জামশেদপুরে টাটাদের বিভিন্ন কারখানায় কয়েকশো, বড়োজোর কয়েক হাজার, প্রধানত ভিন্ন রাজ্যের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত চাকুরের সংস্থান হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিহার বা ঝাড়খণ্ডের কথা বিবেচনা করুন, বিবেচনা করুন গোটা ছোটনাগপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা। টাটাদের কারখানা পত্তনের পর একশো বছর গড়িয়ে গেছে, ঝাড়খণ্ড যে-তিমিরেই সেই তিমিরেই। আদিবাসী সম্প্রদায় ধুঁকেপুকে কোনো ক্রমে টিকে আছে কি নেই, ইস্পাত প্রস্তুত ও তজ্জনিত অন্য নানা শিল্পবিন্যাস থেকে এমনকী 'পরোক্ষ' শুভফলও আদিবাসী-অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডীদের উপর ছিটেফোঁটাও বর্ষিত হয়নি। একশো বছরের শবরী প্রতীক্ষার পর তাঁদের মধ্যে কারো যদি এখন 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা সংগ্রহের সাধ জাগে, অভিযোগের আঙুল কোন দিকে তুলবো আমরা?

ধর্মঘটের কলুষহীন টাটা সাম্রাজ্যের চমকপ্রদ কাহিনীটিও সমান অলীক। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে দীর্ঘতম শ্রমিক ধর্মঘটের তালিকার একেবারে শীর্ষস্থানে ১৯৫৮ সালে জামশেদপুরে টাটা ইস্পাত কারখানায় তিন-মাসব্যাপী ধর্মঘট। শ্রমিকদের ন্যূনতম সুবিধাদি ও মর্যাদার দাবিতে সংঘটিত সেই ধর্মঘট সফল পরিচালনার কৃতিত্ব পুরোটাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন তৎকালীন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের। ইতিমধ্যে অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত, কিন্তু কিছু-কিছু

ব্যক্তিমানুষের স্মৃতিতে সেই ধর্মঘটের গৌরবময় কাহিনী এখনো উজ্জ্বল। যেমন একদা-সাংসদ, বর্তমানে শিলচর নিবাসী অসম রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নুরুল হুদা সেই ধর্মঘটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন।

ইতিহাস ঠিক হারিয়ে যায় না, কখনো-সখনো সম্ভবত সাময়িক ভাবে, চোরাগোপ্তা রাহাজানির শিকার হয়। ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি কিন্তু অহরহ চিরতরে হারিয়ে যায়। সেজন্যই, সানুনয় নিবেদন, গরজ যেহেতু, আপনারা মনে করছেন, বড়ো বালাই কোনো বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীকে বন্দনা করুন, তবে, দোহাই, একটু রয়ে-সয়ে, মাত্রাজ্ঞান না হারিয়ে, এবং সাচ্চা থেকে ঝুট-কে ঈষৎ একটু ছেঁকে নিয়ে।

ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি-প্রসঙ্গের সূত্রেই সম্পূর্ণ ভিন্ন বৃত্তের একটি তথ্যও হঠাৎ মনের দরজায় কড়া নাড়লো। অতি সম্প্রতি জনৈকা প্রবাসিনী ভারতীয় তরুণী তাঁর রচিত উপন্যাসের জন্য একটি সুখ্যাত, অতি মহার্ঘ বিদেশি পুরস্কার পেয়েছেন। স্বভাবতই চার দিকে ধন্যি-ধন্যি রব, সেই সঙ্গে এই প্রতিভাবতীর ঠিকুজি-কুলজি নিয়ে গবেষণা। তাঁর বহুদিন-প্রয়াত বঙ্গজ মাতামহের খোঁজ পেয়ে বাঙালি মহল আপাতত গর্বিত-উল্লসিত। ঘটনাক্রমে তরুণীটির মাতামহীর সঙ্গে একদা আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছিল।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মধ্য কলকাতার এক ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রতিবেশী ছিলাম আমরা। মহিলা জার্মান, ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অতি দয়াবতী, পরোপকারিণী, পরমসৌজন্যভূষিতা এই মহিলাকে মনে-মনে এই এতগুলি বছর ধরে বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসেছি, কিন্তু, অস্বীকার করা অসাধুতা হবে, পরিবারটির প্রতি আমার আগ্রহের প্রধান কারণ একটি বিশেষ বাল্যকৈশোর স্মৃতি। জার্মান মহিলাটির

শ্বশুরমহোদয় গত শতকের বিশের-তিরিশের দশকে ঢাকা জেলার অতি সম্মাননীয় গান্ধিবাদী নেতা বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। গান্ধি মহারাজের মন্ত্রে উৎসর্গীকৃত তাঁর দিনযাপন—সর্ব-জাগতিক-মোহত্যাগী, শাদামাটা নিরেট বাঙালি মধ্যবিত্ত, চরকা কাটায় ক্লান্তি নেই। পায়ে হেঁটে গ্রামে-গ্রামে সর্বোদয়ের বাণী প্রচারে রত, অঙ্গে মোটা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। ধুতি হাঁটু ছাড়িয়ে কখনো নীচে নামে না, কাঁচা-পাকা গোঁফ, যত দূর মনে পড়ে ভুরুতেও পাক ধরেছে। সভাসমিতিতে তেমন রপ্ত ছিলেন না, কিন্তু নিয়মিত বাড়ি-বাড়ি ঘুরতেন, দেশের সমস্যা নিয়ে গৃহস্থকুলেব সঙ্গে নিপাট কাপট্যরহিত আলোচনা চালাতেন।

বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৩৭ সালে ঢাকা সাধারণ কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্য হিশেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি, এবং ঢাকা (পূর্ব) গ্রামাঞ্চল থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্য মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৩৯ সালের মধ্য ঋতুতে বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন। ঢাকা-গোয়ালন্দ মেলে তখনকার দিনের ইন্টার ক্লাসের যাত্রী (যদিও বিধানসভার সদস্য হিশেবে তাঁদের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণের অধিকার ছিল, নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীদ্বয় তা ভাবতেই পারতেন না), গভীর নিশীথে কুষ্ঠিয়া শহরের কাছাকাছি মাজদিয়া স্টেশনে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, বেশ কয়েকটি কামরা চূর্ণ-বিচূর্ণ, ষাট জনেরও বেশি নিহত, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন।

ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি। পুরস্কারপ্রাপ্তা প্রবাসিনী ভারতীয় মহিলার বংশলতিকার অন্বেষণে সাংবাদিককুল তাঁর মাতামহ-মাতামহী পর্যন্ত পৌঁছুতে সমর্থ। নেহাতই ব্যক্তিস্মৃতি, তরুণী লেখিকার পুরস্কারপ্রাপ্তির

খবরে আমার অথচ মনে পড়ে গেল তাঁর প্রমাতামহের কথা। সেই আদর্শনিষ্ঠ গান্ধিবাদী ভদ্রলোক, অর্ধমলিন খদ্দরের পরিধেয়, কাঁচা-পাকা ভুরু, সমস্ত অবয়ব জুড়ে বিনয়ের অভিব্যক্তি। হয়তো আর কারো চেতনাতেই বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ধূসরতম স্মৃতিটুকুও অবশিষ্ট নেই। প্রবাসিনী ভারতীয় মহিলা উপন্যাস লিখে মস্ত পুরস্কার পেয়েছেন, আমার মন তবু বিষাদে ছেয়ে আসে।

বাধ্যবাধকতা?

কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার উপাখ্যান। পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। এখনো নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করেন এমন এক রাজনৈতিক দলের সভা। বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে সে সময় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আমূল পরিবর্তনের জন্য সারা দেশে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছিল। রাজ্যগুলির হাতে আরো অনেক অনেক আর্থিক ক্ষমতা দিতে হবে, আইন করার ক্ষমতা দিতে হবে, প্রশাসনিক ক্ষমতা দিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। উক্ত তথাকথিত বামপন্থী দলটি এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী, সেই সোচ্চার বিরোধিতা জ্ঞাপন করতে সভাটির আয়োজন। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তাঁদের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত একটি-দুটি যুক্তির তরঙ্গ হাওয়ায় ভেসে এসে কানে প্রবেশ করছিল।

সেই বক্তব্যে কোনো জড়তা ছিল না। গোটা দেশে শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ করে বিপ্লব ঘটানোর পূর্বশর্ত একটি শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপস্থিতি। ধনতন্ত্রের কাঠামো মজবুত হলেই, ধনতন্ত্র শোষণের মাত্রা বাড়ালেই, ক্রমশ শ্রমজীবী মানুষেরা নিজেদের ঐক্য আরো মজবুত করবে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যত শক্তিশালী

হবে, শ্রমিক আন্দোলনও ক্রমশ তত শক্তিশালী হবে, এবং একদিন এতটাই শক্তিধর হবে যে, ধনতন্ত্রকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করবে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমাজতন্ত্রের পতাকা পতপত করে উড়বে।

এই যুক্তির নির্ভরেই ওই তথাকথিত বামপন্থী দল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করছিলেন। তাঁদের ধারণা, আমাদের এই কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন সফল হলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হবে, পুঁজিবাদ-প্রবক্তা কেন্দ্র দুর্বল হওয়া মানেই দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ পিছিয়ে পড়া। ধনতন্ত্রের এমনতরো পদস্খলন অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা না হয়ে পারে না, কারণ তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনও পিছিয়ে পড়বে। একটি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ধনতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার স্বার্থে, ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ না ঘটলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব; যাঁরা ধনতন্ত্রের অগ্রগতিকে চিমটি কেটে ব্যাহত করতে চান, তাঁরা তাই আখেরে সমাজতন্ত্রেরই শত্রু। সেই হিশেবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবিও প্রতিক্রিয়াশীল, সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক।

গত এক কুড়ি-দেড় কুড়ি বছরে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে ওই রাজনৈতিক দলের বক্তব্যে এবং হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত ওই সভার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ফের মনে পড়লো আমাদের পশ্চিম বাংলায় বেসরকারি পুঁজি নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক চলছে তার প্রেক্ষিতে। সেই বামপন্থী দলটির বক্তব্যেরই যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি এখন আমাদের কিছু-কিছু অতি সন্নিকট বন্ধুদের কাছ থেকে। তাঁরা আদাজল খেয়ে নামতে চাইছেন এ-পাড়া ও-পাড়া-বেপাড়া থেকে পুঁজি—তা সে পুঁজির চেহারা-চরিত্র যা-ই

হোক না কেন—জড়ো করে পশ্চিম বাংলার মাটিতে বিনিয়োগ হিশেবে পুঁততে। আরো যা শঙ্কার, তাঁদের ঝোঁকটা গিয়ে পড়েছে নিছক বেসরকারি পুঁজির উপর। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে এদেশে-ওদেশে এলোমেলো অনেক উপায়ে অর্জিত পয়সাকড়ি পড়ে আছে। স্ব-স্ব দেশে এসব পুঁজির মালিক যাঁরা, তাঁরা সেই টাকা তেমন ভালোভাবে খাটাবার সুযোগ পাচ্ছেন না। নিজেদের দেশে অতীতে বিনিয়োগের নামে তাঁরা অনেক কীর্তিকাহিনী স্থাপন করেছেন, তা দেশের মানুষেরা পছন্দ করেনি এবং এখনো করে না। তা ছাড়া চাহিদার সমস্যা, নিজেদের দেশে বিনিয়োগের সুযোগ কম। তাঁরা তাই বিদেশ-মুখো, যেমন ভারতবর্ষ-মুখো, যেমন পশ্চিমবঙ্গ-মুখো। তাঁরা তো সেখানে চেনা বামুন নন, তাই তাঁদের পৈতেটা আসল না নকল তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। অন্য পক্ষে, আমাদের মধ্যে থেকে যাঁরা প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন, তাঁরাও অনেকে ওই একদা-বামপন্থী দলের মতো ভাবতে শুরু করেছেন। আশু কর্তব্য, প্রধান কর্তব্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা। তা করতে গেলে বিনিয়োগের অঢেল টাকা প্রয়োজন। এই বিদেশিরা যখন এত-এত টাকা বিনিয়োগ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হচ্ছেন, কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আমাদের নানা রঙিন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, সে-সব স্বপ্নের জালে যদি বাঁধা পড়ি, কী এমন ক্ষতি তাতে? যদি বিদেশিরা এসে আমাদের রাজ্যে ধনতন্ত্র পাকাপোক্ত করে দিয়ে যায়, আমরা তা হলে অতঃপর ধীরে-সুস্থে সমাজতন্ত্র গড়বার সুযোগ পাবো।

গোপাল অতি সুবোধ বালক, যা পায় তাই খায়, যে বুদ্ধি তাকে দেওয়া হয় সেই বুদ্ধি সে সরল মনে অধিগ্রহণ করে। দেশে ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধনতন্ত্রের প্রাক-প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিদেশি

পুঁজিপতিরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন এমন প্রস্তাব বাতুলতা। যাঁরা পুঁজির মালিক, যাঁরা অন্য দেশে পুঁজির সম্ভার নিয়ে বিহার করতে যান, তাঁরা পুঁজিবাদের ধর্ম মেনেই আচরণ-বিচরণ করেন। তাঁদের লক্ষ্য মুনাফা, তাঁদের লক্ষ্য শোষণ। ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মায়ায় আমাদের পরিপাটি স্বপ্নে তাঁদের বিন্দুতম আগ্রহ নেই, তাঁরা আমাদের দেশে যখন টাকার ঝোলা নিয়ে আসবেন, তাঁদের ক্রিয়াকর্ম সাধিত হবে তাঁদের অগ্রাধিকার অনুযায়ী, তাঁদের চক্রান্ত অনুযায়ী, তাঁদের অভিসন্ধি অনুযায়ী। একই কথা দিশি পুঁজিপতিদের সম্বন্ধেও খাটে। জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকার পাল্লায় পড়ে আমরা পথভ্রষ্ট হতে পারি, পুঁজিওয়ালারা কখনো হন না। বরঞ্চ আমাদের মতো কিছু গোবেচারাদের হাতের মুঠোয় পেয়ে তাঁরা ল্যাজে খেলান, ল্যাজে-গোবরে করেন।

অবশ্যই আমাদের পুঁজির প্রয়োজন। অবশ্যই পশ্চিম বাংলা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্য অনেক রাজ্যের থেকে পিছিয়ে আছে। এই রাজ্যগুলি কিন্তু এগিয়ে গেছে বিদেশি পুঁজির উপর নির্ভর করে নয়। তাদের উন্নয়নের উৎস কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদার প্রসাদ। গত শতাব্দীর ষাটের-সত্তরের-আশির-নব্বুইয়ের দশকে এইসব রাজ্য এগিয়ে যেতে পেরেছে, কারণ বেসরকারি মালিকানায় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, সে সব কারখানায় খাটানো মূলধনের শতকরা আশি-নব্বুই ভাগ কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে এসেছে।

আমাদের পশ্চিম বাংলায়ও রাজ্য সরকারের নায়কত্বে এবং তত্ত্বাবধানে নতুন-নতুন শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব। সে-সব শিল্পোদ্যোগের শতকরা নব্বুই ভাগ মূলধনের জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি রাখতে পারি। কেন্দ্র তার অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে

নির্দেশ দিতে পারে, পশ্চিম বাংলার প্রতি অতীতে যে-অন্যায় করা হয়েছে, তা পূরণ করতে এখন থেকে তারা এখানে অঢেল লগ্নি করুক।

আমাদের রাজ্যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রযুক্তিবিদ-বৈজ্ঞানিক-অর্থনীতিবিদ-সংখ্যাতত্ত্ববিদ হিশেবরক্ষক কোনো কিছুরই অভাব নেই। রাজ্য সরকারের উদার ছত্রতলে যদি সমাজতান্ত্রিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পের বন্যা বইয়ে দেওয়া যায়, সে-সব শিল্পে যদি কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থাদি থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা যায়, কয়েক দশকের মধ্যে পশ্চিম বাংলার রূপ পাল্টে যেতে বাধ্য। ধনতন্ত্রের সযত্ন বিকাশের জন্য তা হলে আর স্বদেশি-বিদেশি পুঁজিওয়ালাদের কাছে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে না।

আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের। বিশ্বায়নের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হয়, কিন্তু কেন্দ্রের নিজস্ব ভাণ্ডারে অঢেল টাকা, বিপুল উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাণ্ডারে। রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে সেসব সূত্র থেকে পশ্চিম বাংলার জন্য বিনিয়োগের অর্থ সংগ্রহ করার সঙ্গে বাধ্যবাধকতার কী সম্পর্ক? বিশ্বায়ন হয়েছে বলেই, দেশে সরকারি খাতে বিনিয়োগ নিযুক্ত করার মতো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেদিকে না তাকিয়ে, বিদেশি পুঁজির বন্দনায় মেতে থাকবো, তা মেনে নেওয়া যায় না, কিছুতেই যায় না।

একটি বিনীত প্রস্তাব

বাজারি ব্যবস্থার মধ্যে আছি, বাজারদরের সার্বভৌমত্ব না মেনে উপায় কী। জমির দামের ক্ষেত্রেও বাজারই নিরূপক। হায়দরাবাদ শহরের উপকণ্ঠে জনৈক দরিদ্র কৃষক সম্প্রতি তাঁর সম্বল এক একর কৃষিভূমি বাইশ কোটি টাকায় বিক্রি করতে সমর্থ হয়েছেন — তিনি আর দরিদ্র নন! — সেই জমিতে তথ্যপ্রযুক্তি কারখানা গড়া হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গও বাজার-মাহাত্ম্যে তেমন একটি পিছিয়ে নেই। কলকাতার অনেক অঞ্চলে এক কাঠা জমির জন্য পঞ্চাশ লাখ থেকে এক কোটি টাকা হাঁকা হচ্ছে অর্থাৎ একর প্রতি পঁচিশ কোটি থেকে পঞ্চাশ কোটি। হাওড়া, দমদম বা ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চলে জমির বাজারদর হয়তো সামান্য কম, কিন্তু তা-ও ক্ষীণজীবী বাঙালিদের ঊর্ধ্বনেত্র করবার পক্ষে যথেষ্ট।

শিল্পক্ষেত্রে আমাদের একদা-আহৃত সম্মান ফিরে পেতে হলে নতুন করে শিল্পস্থাপন অবশ্যই প্রয়োজন, সেজন্যই জমির অনুসন্ধান। তবে এই লক্ষ্যে নেমে উর্বর কৃষিভূমির দিকে হাত না বাড়িয়ে একদা-সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চলে বর্তমানে বন্ধ বা রুগ্‌ণ হয়ে যাওয়া কলকারখানার পড়ে-থাকা জমিতে কেন নতুন শিল্প গড়ার উদ্যোগ

নেওয়া হচ্ছে না, সেটা ধোঁয়াশাই থেকে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, বন্ধ বা রুগ্‌ণ কারখানার জমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আইন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাণভোমরা এখন বামপন্থী সাংসদদের হাতে, নতুন দিল্লির প্রশাসনিক কর্তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে, বকে-ঝকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলিকে সংশোধন করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? সন্দেহ হয়, আসল সমস্যাটি অন্যত্র, সেই বাজারদর সংক্রান্ত। দমদম-ব্যারাকপুর-হাওড়ায়, কিংবা আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে, বন্ধ বা রুগ্‌ণ কারখানার জমি কিনতে বা অধিগ্রহণ করতে গেলে মূল্য হিশেবে ন্যূনতম বাজারদর না দিয়ে উপায় নেই, সম্ভবত প্রতি কাঠার জন্য তা ক্ষেত্রবিশেষে দশ, কুড়ি, পঁচিশ বা পঞ্চাশ লাখ টাকার কম হবে না। ধরুন এ-সব অঞ্চলে তাঁদের গাড়ির কারখানার জন্য স্বয়ং টাটা গোষ্ঠী কিংবা তাঁদের হয়ে রাজ্য সরকার যদি এক হাজার একর জমি কিনতে উদ্যোগী হতেন, এক সঙ্গে একই জায়গায় যদি এত জমি পাওয়া যেত কাঠা প্রতি দশ লক্ষ টাকা হিশেবে জমির জন্য তা হলে একুনে খরচ দাঁড়াত পাঁচ হাজার কোটি টাকা।

অথচ যদি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার উষর অনুন্নত পতিত জমি পেতে টাটারা আগ্রহী হতেন, খরচের হিশেব আমূল পালটে যেত। ও সব অঞ্চলে এমনকী বিঘে প্রতি তিন-চার হাজার টাকায়, অর্থাৎ মাত্র দেড় লক্ষ-দু'লক্ষ টাকায় এক একর জমি হস্তগত করা সম্ভব হতো। টাটা গোষ্ঠী ইচ্ছে করলে পনেরো-কুড়ি কোটি টাকায় তাঁদের প্রয়োজন মতো এক হাজার একরের অধীশ্বর হতে পারতেন।

সে-রকম অবশ্য হয় না। টাটা কিংবা অন্য কোনো শিল্পগোষ্ঠী বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগী হতে উৎসাহী নন, ও-সব অঞ্চলে পরিকাঠামোর অভাব, রেল-জাতীয়

সড়ক-বিমান সংযোগ হাতের নাগালে নয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করা দুরূহ, দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহও তত সহজ নয়। সরকারকে তাই তাঁরা ধরে পড়েন কলকাতার কাছাকাছি, পরিকাঠামোর মোটামুটি ব্যবস্থাসম্পন্ন জমি পাইয়ে দেওয়ার জন্য। রাজ্য সরকার যেহেতু রাজ্যে দ্রুত শিল্পসঞ্চারে উন্মুখ, এবং বিবিধ কারণে তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে শিল্পবিস্তারে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান বলে তাঁরা মনে করেন, শিল্পগোষ্ঠীদের জন্য জমি অন্বেষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সোৎসাহে সম্মত হন। যেমন তাঁরা হুগলী জেলায় টাটাদের গাড়ি কারখানার জন্য প্রায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। এই জেলার গ্রামাঞ্চলে জমির বাজারদর কাঠা প্রতি দশ হাজার টাকার কাছাকাছি। সিঙ্গুর অঞ্চলে টাটা গোষ্ঠীর জন্য জমির দখল নিতে রাজ্য সরকার আজ অবধি সত্তর কোটি টাকার চেক বিলিয়েছেন। যত দূর জানা গিয়েছে, এক হাজার একর পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করতে সব মিলিয়ে প্রায় একশো কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, অর্থাৎ কিনা একর প্রতি দশ লক্ষ টাকা, বিঘা প্রতি চার লক্ষ টাকা, কাঠা প্রতি কুড়ি হাজার টাকা, যা কিনা বাজারদরের প্রায় দ্বিগুণ। সরকারের পক্ষ থেকে তাই স্বচ্ছন্দে বলা হতে পারে—বলা হচ্ছেও— জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বঞ্চনার কোনো প্রশ্নই নেই, এবং জমির মালিকদের একটি অংশই সম্ভবত যা ঘটছে তা নিজেদের সৌভাগ্য বলেই ধরে নিচ্ছেন, তাই অভিযোগ করা চলবে না যে তাঁদের উৎখাত করা হচ্ছে। অবশ্য অন্য দুটি সমস্যা থেকেই যায়; যে-টাকা জমির মালিকরা জমির মূল্য হিশেবে পেলেন, তার কত পরিমাণ বর্গাদারদের প্রাপ্য, আর অধিগৃহীত জমিতে এত দিন খেটে খাওয়া দিনমজুরদের কী গতি হবে।

ধরে নেওয়া যাক, আইন করে সরকার উভয় সমস্যারই নিরসন

ঘটাবেন। কিন্তু তা হলেও অন্য একটি বড়ো প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া আমাদের পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। কী কী শর্তে টাটা গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে গাড়ির কারখানা স্থাপন করতে রাজি হয়েছে, এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই শর্তাবলি স্থিরীকৃত হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হলে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, এ সব-কিছুর সঙ্গে 'বাণিজ্যিক গোপনীয়তা' জড়িয়ে আছে, জনসাধারণকে জানানো যাবে না। সঙ্গে-সঙ্গে দেশের প্রাচীনতম কমিউনিস্ট নেতা ও সর্বাগ্রগণ্য রাজনীতিবিদ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সরকারি ক্রিয়াকর্মে 'বাণিজ্যিক গোপনীয়তা' বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না।

তথ্যের অধিকার-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে না গিয়েও তাই আশা করা যায়, টাটা গোষ্ঠীকে কী ভিত্তিতে জমি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। এমন ধারণা করাও হয়তো অমূলক নয়, কথাবার্তা এখনো চলছে, পাকাপাকি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আরো খানিকটা সময় লাগবে। এমন অনুমানের উপর নির্ভর করে, এবং পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা মনে রেখে, এখানে একটি বিশেষ প্রস্তাব আলোচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

অধিগৃহীত প্রায় এক হাজার একর জমি কীসের ভিত্তিতে টাটা গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করবেন, সে ব্যাপারে তিনটি বিকল্প নীতি গ্রহণ সম্ভব : (ক) টাটারা আমাদের রাজ্যে শিল্প গড়তে সম্মত হয়েছে, সেজন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিনামূল্যে এই বিরাট পরিমাণ জমি উপঢৌকন দেওয়া ও যে-একশো কোটি টাকা খরচ করে জমি কেনা হয়েছে, সেই ব্যয়ভার রাজ্য সরকারের পুরোপুরি বহন করা; (খ) যে-দাম দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তা পুরোটা টাটাদের কাছ থেকে আদায় করা, অর্থাৎ কিনা এক হাজার একর জমি নাও, একশো কোটি টাকা

রাজ্য তহবিলে জমা দাও; এবং (গ) শুধু জমি কিনতে ব্যয়িত একশো কোটি টাকা টাটাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা নয়, সেই সঙ্গে তাঁদের কাছে আরো কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করা।

এই তৃতীয় বিকল্পের সপক্ষে একাধিক যুক্তি দাঁড় করানো চলে। দেশের পূর্বাঞ্চল বাদ দিয়ে খুব বেশি রাজ্যে এক সঙ্গে একই জায়গায় হাজার একরের মতো জমি আড়াইশো-তিনশো কোটি টাকার কমে পাওয়া সম্ভব নয়। টাটারাও তা জানেন, তাঁরা এটাও জানেন, রাজ্য সরকার নিজের আইন প্রয়োগ করে এই বিশাল বর্গক্ষেত্রের ভূমিখণ্ড সংগ্রহ করে না দিলে, তাঁদের পক্ষে তা সংগ্রহ সুদূরপরাহত থেকে যেত। গাড়ির কারখানা স্থাপন করে এক বছর-দু'বছরের মধ্যে তাঁরা অঢেল মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবেন, কৃতজ্ঞতা তথা সৌজন্য-হেতুই তাই জমি অধিগ্রহণ বাবদ দেয় অর্থ ছাড়াও রাজ্য সরকারকে আরো বাড়তি কিছু দেওয়া তাঁদের উচিত।

রাজ্য সরকারের পক্ষেও অনুরূপ দাবি পেশ করা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত বাড়তি একটি কারণে। রাজ্য সরকার বলছেন, শিল্পস্থাপনের জন্য তাঁদের তহবিলে টাকা নেই, বাধ্য হয়ে তাই বেসরকারি পুঁজিপতিদের আহ্বান করে আনতে হচ্ছে। কিন্তু এই বেসরকারি পুঁজির উপর নির্ভরতা কি অনন্তকাল ধরে চলবে? সরকার কি আদৌ কোনো দিন আর শিল্প ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ভাবনা নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন না? বামপন্থী চিন্তাধারায় যুগ-যুগ ধরে যাঁরা দীক্ষিত, তাঁরা কি বরাবরের মতো হাল ছেড়ে দেবেন? না কি অহরহ সুযোগ অনুসন্ধান করবেন, কী উপায়ে সরকারি খাতে উপার্জন বাড়ানো যায়, কী ভাবে সেই বাড়তি উপার্জনের উপর নির্ভর করে নব কলেবরে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব হয়?

সে রকম একটি সুযোগই এখন পশ্চিম বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের

সম্মুখে উপস্থিত। শুধু টাটা গোষ্ঠীরই নয়, সারি দিয়ে একের পর এক দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শিল্প তথা বণিক গোষ্ঠী এই রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য হাজির হচ্ছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রার্থনা, তাঁদের পছন্দমতো, পরিমাণমতো জমি রাজ্য সরকার সংগ্রহ করে দিন, সেই জমিতে তাঁরা শিল্প গড়বেন, সড়ক বানাবেন, বাণিজ্যমেলা বসাবেন, তথ্যপ্রযুক্তির পসার সাজাবেন, স্বাস্থ্য উদ্যান গড়বেন, পর্যটক টানবার জন্য স্বপ্ন-নগরী রচনা করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের প্রত্যেককে বলা হোক, হ্যাঁ, আপনারা পছন্দের জমি পাবেন, সরকার থেকে অন্য সাহায্যাদিও পাবেন, কিন্তু দুটি শর্তের বিনিময়ে : (১) সরকার জমি অধিগ্রহণে যত টাকা খরচ করবেন, আপনাদের হাতে জমি অর্পণের মুহূর্তে তার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ নজরানা হিশেবে সরকারি তহবিলে আপনাদের জমা দিতে হবে; এবং (২) আপনাদের প্রস্তাবিত শিল্প বা বাণিজ্য প্রকল্পের ন্যূনতম এক-পঞ্চমাংশ স্বত্ব রাজ্য সরকারকে বিনা মূল্যে লিখে দিতে হবে, অর্থাৎ প্রতিটি প্রকল্পেই সরকার অংশীদার হিশেবে আইনি স্বীকৃতি পাবেন।

এই দুই শর্ত মানতে যদি জমি-কাঙ্ক্ষী বিনিয়োগকারীদের সম্মত করা যায় তা হলে অনেকগুলি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার অবারিত হয়। টাটাদের প্রস্তাবিত গাড়ি কারখানার উদাহরণ দিয়েই কী বলতে চাইছি তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক হাজার একর জমির দাম হিশেবে টাটারা প্রথমে একশো কোটি টাকা সরকারের হাতে তুলে দেবেন। তার পর আরো একশো কোটি টাকা দেবেন নজরানা হিশেবে। এই নজরানার টাকা সরকারের হাতে এলে সঙ্গে-সঙ্গে সরকারি উদ্যোগে নানা নতুন ছোটো মাঝারি-বড়ো শিল্পে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরি হবে। তা ছাড়া টাটা কারখানার গাড়ি যখন থেকে বাজারে বিক্রি শুরু হবে, প্রকল্পটি লাভের মুখ দেখতে শুরু করবে; বছরে নিট লাভ যদি

হয় এক হাজার কোটি টাকা, এক-পঞ্চমাংশ স্বত্বের অধিকারী রূপে সরকারের প্রাপ্য হবে দুশো কোটি টাকা; যদি বাৎসরিক লাভের বহর দাঁড়ায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা, রাজ্য সরকার তা হলে হাতে হাতে পাবেন এক হাজার কোটি টাকা, যা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রসারের মস্ত পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে। আরো কল্পনা করা সম্ভব, ফাটকা বাজারে গাড়ি প্রকল্পের শেয়ার মূল্য তিন গুণ-আট গুণ-কুড়ি গুণ হচ্ছে; সামগ্রিক শেয়ারের এক-পঞ্চমাংশের ভাগীদার রাজ্য সরকার; সেই এক-পঞ্চমাংশ শেয়ারের দামও আকাশচুম্বী হবে, প্রয়োজন দেখা দিলে রাজ্যের করতলগত শেয়ারগুলির ঈষৎ ভগ্নাংশ বিক্রি করে যে-কোনো মুহূর্তে সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

অন্য একটি শুভ পরিণামের প্রসঙ্গ উল্লেখও সম্ভবত প্রয়োজন। রাজ্য সরকার প্রকল্পটির অংশীদার। সুতরাং সংস্থার ভিতর থেকেই শ্রমস্বার্থ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার পর্যাপ্ত অধিকার ও সুযোগ রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে, বেসরকারি পুঁজিপতিদের খামখেয়ালিপনায় রাশ টানা সম্ভবপরতার গণ্ডির মধ্যে আসবে।

টাটা গোষ্ঠীর মতো আরো যাঁরা-যাঁরা পশ্চিম বঙ্গে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাবেন, তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই দুই শর্ত যদি আরোপ করা যায়, সরকারের তাৎক্ষণিক অর্থ উপার্জন যেমন বাড়বে, ভবিষ্যৎ বছরগুলির জন্যও অর্থের প্রতুলতা নিশ্চিত করা যাবে, বেসরকারি শিল্প প্রসারের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত হবে।

অধিগৃহীত জমির ব্যাপ্ত বর্গক্ষেত্র এক দিক থেকে দেখলে সরকারের পুঁজি। সেই পুঁজির সুষ্ঠু, বিচক্ষণ ব্যবহারেই বামপন্থী আন্দোলনের আদর্শ ও ঐতিহ্য অটুট রাখার অঙ্গীকার বিধৃত নয় কি?

আশা করবো, যে প্রস্তাব উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে পেশ করা হলো, তা নিয়ে এই রাজ্যে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা একটু ভাববেন। সম্প্রতি কেরলে এ ধরনের একটি প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। কেরলে যে-পরীক্ষা চলছে, পশ্চিম বঙ্গেও সেই ধাঁচে পরীক্ষা শুরু হলে লাভ বই ক্ষতি হবে না এমন আশা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে।

তবে যদি ইতিমধ্যে এখানে নতুন নীতিবোধে পৌঁছে যাওয়া হয়ে গিয়ে থাকে, শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ পাপ, তাতে ধনতন্ত্রের বিশুদ্ধ বিকাশ ব্যাহত হয়, তা হলে অন্য কথা।

চিন্তা করে ডিম পাড়ুন

টাটা গোষ্ঠী কর্তৃক প্রস্তাবিত এই রাজ্যে ছোটো মোটরগাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছে, আরো গড়াবে; নন্দীগ্রামের ঘটনাবলি তার প্রমাণ। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এখন সেটাই দ্রষ্টব্য।

যে-বাকবিতণ্ডা ও ততোধিক গোলেমালে হরিবোল চলছে, টাটা গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির একটি সাম্প্রতিক মন্তব্যে তাতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ওই প্রস্তাবিত কারখানার জন্য অধিগৃহীত জমি নিয়ে যা চলছে, তা, তাঁর উক্তি অনুযায়ী, নিছক রাজনীতি নয়, তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু অন্য পুঁজিপতিরাও এই ব্যাপারে জড়িত; অর্থাৎ টাটাদের পশ্চিম বঙ্গ বিজয়ে তাঁদের চোখ টাটাচ্ছে, তাই তাঁরা বাগড়া দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন, জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যাঁরা ঘড পাকাচ্ছেন, তাঁদের মদত দিচ্ছেন।

অভিযোগের তীর দ্বিমুখী। প্রথমত, রতন টাটা মশাই আন্দোলনকারী রাজনীতিবিদদের আন্তরিকতা তথা সততা সম্পর্কে কটাক্ষপাত করেছেন। রাজনীতিবিদদের নিয়ে এ ধরনের কটূক্তি আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রকাশ্যে

করতে সাহস পেতেন না, তাঁরা তখন রাজনৈতিক কর্মীদের সমীপে ভয়ে কুঁকড়ে থাকতেন। এখন পরিবর্তন। বিশ্বায়ন ও আর্থিক উদারীকরণ হেতু সমাজে শিল্পপতিদের কদর বেড়েছে, পৃথিবী টাকার বশ এই বাণী যত বেশি উচ্চারিত হচ্ছে, টাকার পাহাড়ের উপর সমাসীন শিল্পপতি সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিমাণও তত বেশি ভারি হচ্ছে। তাঁদের সাহসের পরিমাপও তাই বর্ধমান। তা ছাড়া বিশেষ করে গত দুই দশক ধরে, বিভিন্ন স্তরে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অসদাচরণের এত বেশি বৃত্তান্ত প্রচারিত, ও বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত, যে লোকমানসে একটি নতুন ব্যাকরণ-মীমাংসার উদয় হয়েছে : রাজনীতিবিদরা তস্কর, না তস্কররা রাজনীতিবিদ। বৃত্তিগত ভোগান্তির হাত থেকে অতএব পরম সাধু রাজনীতিবিদেরও রেহাই নেই। রতন টাটার মতো যে-কেউই বাঁকা-বাঁকা কথা বললে হজম করে নিতে হয়; মানহানির মামলা এনে অশ্বডিম্বপ্রাপ্তিই জুটবে।

কিন্তু রতন টাটা মশাইয়ের কটাক্ষ তথা অভিযোগের আঙুল তো তাঁরই কিছু সহযোগী শিল্পপতিদের দিকে লক্ষ্য করে। টাটাদের পশ্চিমবঙ্গীয় সৌভাগ্যে তাঁদের নাকি চোখ টাটাচ্ছে। এখানেই খটকা লাগে। এমনটা তো হওয়ার কথা না, কাক যে কাকের মাংস খায় না, শুধু তা-ই নয়, টাটা গোষ্ঠীর মতো অনেক, আরো অনেক শিল্পগোষ্ঠীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটো মোটরগাড়ি কারখানা তৈরি নিয়ে ভাবছেন, হোন্ডা, সুজুকি, প্রিমিয়ার, প্রত্যেকেই। বিশ্বায়নের দৌলতে দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গাড়ির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। তার জোগান দিতে অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কারখানার জন্য জমি পেতে আপাতত তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে অন্বেষণে ব্যস্ত। বাজার এত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে যে, শিল্পপতিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নিয়ে ভাবিত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের পক্ষ থেকে তো জানানোই হয়েছে, প্রতিদিন জানানো হচ্ছে, এখানে অবারিত দ্বার, যে-শিল্পপতিই আসুন না কেন, তাঁকে অভিভূত অভ্যর্থনা দেওয়া হবে, একেবারে সাজাবো যতনে-ভূষণে রতনে-কেয়ূরে কঙ্কণে কায়দায়। সবাইকেই তো, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সমান আদরে আহ্বান করা হচ্ছে। একমাত্র টাটা গোষ্ঠীই ছোটো গাড়ি তৈরির প্রস্তাব নিয়ে এই রাজ্যে এসেছিলেন, তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে। অন্য কেউ এলে তাঁকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেরাতেন বলে মনে হয় না। সুতরাং বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীদের কারো সিঙ্গুরের টাটা কারখানা নিয়ে ঈর্ষান্বিত হওয়ার, এবং সেই ঈর্ষার কারণে বাগড়া দেওয়ার, কোনো কারণ হঠাৎ ভেবে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না।

যা মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য তা নয়। রতন টাটা তো সম্পূর্ণ অকারণে এমন একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করবেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। হয়তো সত্যি-সত্যিই টাটার প্রস্তাবিত কারখানা প্রকল্প কোনো না কোনো শিল্প গোষ্ঠীর অসূয়ার উদ্রেক করেছে। হয়তো তাঁরা গোপনে খবর পেয়েছেন, টাটারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এমন কিছু-কিছু সুবিধার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যা তাঁরা অন্যান্য রাজ্যে পাচ্ছেন না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঔদার্যের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজ্য সরকারকে হারিয়ে দিয়েছেন; টাটা গোষ্ঠীকে যে-যে লোভনীয় শর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গেঁথে ফেলেছেন, অন্য রাজ্যগুলিতে অন্যান্য শিল্প গোষ্ঠীর সেরকম ভাগ্য উদয় হয়নি।

এখানেই ধন্দ। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ জানেন না কোন শর্তাবলির ভিত্তিতে টাটা গোষ্ঠী এই রাজ্যে গাড়ির কারখানা তৈরি করছেন। এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ভঙ্গিমা, সে আমার গোপন কথা, বলবো না, ওলো সই। এই রাজ্যের জনগণের যেন সুযোগ বা অধিকার নেই, তাঁরা জানতে পারছেন না, পারবেন না রাজ্য সরকার টাটাদের সঙ্গে কী

চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, সেই চুক্তির বিশদ ধারাগুলিই বা কী। টাটাদের সহযোগী শিল্প গোষ্ঠীরা কিন্তু চর লাগিয়ে তা জেনে ফেলেছেন এবং যা জেনেছেন তাতে তাঁদের মন খারাপ : ইস্, টাটারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আবদার জানিয়ে এত-এত সুবিধা আদায় করে নিল, অথচ অন্যান্য রাজ্যে আমরা সে ধরনের বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারিনি, আদায় করার চেষ্টা পর্যন্ত করিনি। তা ছাড়া পশ্চিম বাংলায় এই বাড়তি সুবিধাগুলি পাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতার বাজারে টাটা গোষ্ঠী যথার্থই ঈষৎ লাভবান হবেন, তাঁদের প্রস্তুত ছোটো গাড়ি অন্যদের তৈরি গাড়ি থেকে একটু কম দামে বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে। এই খবরগুলি জানার পর সহযোগী কিছু শিল্প গোষ্ঠী হয়তো সত্যিই টাটাদের বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার চেষ্টায় নেমে পড়েছেন। অন্তত টাটারা তা-ই মনে করেন, এবং সেরকম মনে করেন বলেই রতন টাটার প্রকাশ্য অভিযোগ।

সব মিলিয়ে অবশ্যই মন খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা, অথচ সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হওয়ার কথা পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষজনের। কী কী চমৎকার শর্তে রাজ্য সরকার ও টাটা গোষ্ঠী স্বাক্ষর মিলিয়েছেন, তার বিশদ বিবরণ রাজ্য সরকার জানেন, টাটা গোষ্ঠী জানেন, চর লাগিয়ে অন্যান্য শিল্প গোষ্ঠীও তা জেনে গিয়েছেন। জানে না একমাত্র এই রাজ্যের জনগণ, রাজ্য সরকার তাঁদের এ সব তথ্য জানানোর যোগ্য বলে স্পষ্টতই মনে করেন না।

জনগণ যেহেতু শর্তগুলি জানেন না, হাওয়ায় গুজব ছড়ায়। যেমন একটি গুজব : সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে, এখন দেখা যাচ্ছে, প্রায় দেড়শো কোটি টাকা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু রাজ্য সরকার নাকি টাটাদের কথা দিয়েছেন, বিনি পয়সার ভোজের ব্যবস্থা, এই জমির জন্য তাঁদের কানাকড়িও দিতে হবে না, এই প্রায় হাজার একর জমি সরকার তাঁদের উপঢৌকন

দেবেন। এতটা বদান্যতা অন্য কোনো রাজ্যের সরকার অন্য কোনো শিল্পপতিকে দেখাননি। টাটাদের সৌভাগ্যে শিল্পপতিদের একটি অংশ তাই জ্বলছেন-পুড়ছেন।

আর একটি গুজব : রাজ্য সরকার নাকি রাজি হয়েছেন, টাটা কারখানায় প্রস্তুত ছোটো গাড়ির ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় মূল্যযুক্ত কর পুরোপুরি মকুব করা হবে; এই গাড়ির বিক্রি তাই বাজারে অন্য সব গাড়িকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবে। অবশ্য মূল্যযুক্ত কর থেকে এবংবিধ মুক্তি পাঁচ-দশ বছরের মেয়াদে, না অনন্তকালের জন্য, তা নিয়ে গুজবদাতারা এখনো নিশ্চিত কিছু জানাতে পারেননি।

তৃতীয় আরো একটি ভয়ঙ্কর গুজব, টাটারা আবদার জানিয়েছেন, এবং রাজ্য সরকার নাকি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, টাটা কারখানায় প্রস্তুত প্রতিটি গাড়ির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে-অন্তঃশুল্ক প্রাপ্য, তার-ও পরিপূর্ণ দায় রাজ্য সরকার বহন করবেন, হয়তো অনন্তকালের জন্য, হয়তো পাঁচ-দশ বছরের জন্য।

যেহেতু রাজ্য সরকার কোনো কিছু বলছেন না, টাটাদের গাড়ি কারখানা তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে সব মিলিয়ে কত টাকা গুণাগার দিতে হবে, তা অনুমান করা এই মুহূর্তে অসম্ভব। যেমন অসম্ভব এত-এত টাকা ঢেলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থব্যবস্থায় কোন ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে, কত হাজার বেশি পরিমাণ রাজ্যসন্তানরা দুধে ভাতে থাকবে, তার অঙ্ক কত। এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দেনার দায়-বওয়া রাজ্য সরকার, ধরে নিচ্ছি, অন্তত গোপনে, এ সব হিসেব-নিকেশ করে সন্তুষ্ট। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যের মতো, এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের স্বস্তিবোধেই পশ্চিম বাংলার জনগণের স্বস্তি।

তবে, গোস্তাকি যদি দয়া করে মাফ করা হয়, অন্য একটি

কৌতূহলের কথা বলতে হয়। সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে, টাটা গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ফাটকা বাজারে শেয়ার কিনে কোরাস ইস্পাত গোষ্ঠীর দখলদারি নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁরা জানিয়েছিলেন, শেয়ার প্রতি ৪.৫৫ পাউন্ড দাম হাঁকতে তাঁরা প্রস্তুত, এবং সংস্থাটির পরিচালনা ব্যবস্থায় প্রাধান্য পেতে শেয়ার কিনতে তাঁরা ৫.৪ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করতে রাজি।

আমাদের প্রায় মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো অবস্থা। কারণ ৫.৪ বিলিয়ন পাউন্ড আমাদের মুদ্রার হিশেবে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫,০০০ কোটি টাকায়। এবং এখানেই একটু তাজ্জব বনে যেতে হয়। যাঁরা আন্তর্জাতিক ফাটকা বাজারে অবলীলায় ৪৫,০০০ কোটি টাকা খাটাবেন, যাঁদের অর্থের অভাব নেই, পশ্চিম বাংলার মতো একটি হতদরিদ্র রাজ্য থেকে কেন তাঁদের দেড়শো-দু'শো কোটি টাকা কিংবা তারও বেশি উপহার দেওয়া।*

অন্য একটি চিন্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই রচনার ইতি টানবো। টাটাদের জন্য মাত্র এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে যত হ্যাপা পোয়াতে হচ্ছে, তাঁদের কাঙ্ক্ষিত মোট চল্লিশ হাজার একর জমি অধিগ্রহণে আরো কত দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার আশঙ্কা, তা নিয়ে কেউ আদৌ ভাবছেন কি? বাকি উনচল্লিশ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে, যাঁরা শিল্প বা শিল্প পরিকাঠামো গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, গোপন কথাটি রবে না গোপনে, তাঁরাও,

* টাটা গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত কোরাস সংস্থাটি কিনতে সফল হয়েছিলেন, সফল হতে গিয়ে তাঁদের যত গুণাগার দিতে হয়েছে, ভারতীয় টাকায় তার পরিমাণ ৪৫,০০০ কোটি টাকা নয়, ৫৫,০০০ হাজার কোটি টাকা।

কে জানে, হয়তো আহ্লাদ জ্ঞাপন করবেন, টাটাদের গোপনে যে-সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রদান করতে হবে।

হয়তো বলা হবে, আগ বাড়িয়ে এসব আলতু-ফালতু চিন্তার দরকার কী, এক বছর আগে শিল্পবিকাশের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করে বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার জনগণের বিপুল সমর্থন আমরা তো আদায় করেইছি। মুশকিল হলো চার বছর বাদে ফের তো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নিজেদের পরীক্ষা দিতে হবে, তার জন্যও তো একটু পূর্ব ভাবনা দরকার।

কিশোরকালে শোনা একটি চিনদেশীয় প্রবাদ অনুসরণ করে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাবো : ডিম পেড়ে তারপর চিন্তামগ্ন হবেন না, চিন্তা করে তবেই ডিম পাড়ুন।

ইনকিলাব মুর্দাবাদ

মনে হয় ইনকিলাব জিন্দাবাদের দিন গিয়েছে। এমনকী বামপন্থীদের দ্বারা আহূত সভাসমিতিতেও 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' এমন শপথ আর উচ্চারিত হতে শোনা যায় না। দিন পাল্‌টেছে, বিপ্লব নিয়ে বাগাড়ম্বর আপাতত স্তব্ধ। কিছু-কিছু একদা-নিকষ বামপন্থী এখন প্রাজ্ঞজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ; মার্কসবাদ, তাঁরা বলেন, একটি পবিত্র বিজ্ঞান, বিবর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি ঘূর্ণনের সঙ্গে মার্কসবাদ বিজ্ঞানের সত্তাস্বরূপও বিবর্তিত হয়; মার্কসবাদ থেকে বাস্তবকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়; আপাতত পৃথিবীর রাজনৈতিক আদল আমূল রূপান্তরিত, বিশ্বায়নের ঘোড়া জোরকদমে ছুটছে, ধনতন্ত্র নতুন করে ভুবন জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এই অবস্থায় বিপ্লবের সম্ভাবনা, যে-কোনো দেশেই না কি, পরাহত। সুতরাং আমাদের দেশেও একদা-বিপ্লবের-গদা-ঘোরাতে-মহাব্যস্ত বীর-বিক্রমশালীরা অন্য চিন্তায় প্রবিষ্ট। দিগন্তের পানে তাকিয়ে থেকে অনেক ঢুঁড়েও বিপ্লবের আসন্নতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, আরো বেশ কয়েক বছর যাবেও না। সুতরাং বাস্তবকে মেনে নিয়ে অন্য চিকীর্ষায় নাকি মগ্ন হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য শাঁসালো বামপন্থীরা সভা সমিতিতে

গলা ফাটিয়ে, অথবা পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ফেঁদে, বিপ্লবের বাণী ঘোষণা থেকে বিরত থাকছেন, পরিবর্ত হিশেবে তাঁরা এখন উন্নয়নকে আঁকড়ে ধরেছেন, সকাল-সন্ধ্যা উন্নয়নের মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে। আদর্শবাদী দলের প্রধান লক্ষ্যই, সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে, সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে, তা মেনে নিয়ে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অবিচল ধাবিত হওয়া।

গোল বেঁধেছে এখানেই। বিপ্লবের বিকল্পরূপে উন্নয়নকে কর্মসূচি হিশেবে অবশ্যই গ্রহণ করা নিয়ে পার্টি যে-স্লোগানই দিক, বিষ্ণু দে তো সেই কবেই বলে গেছেন, তাতে জোগান দিতে আমাদের ক্লান্তি নেই, 'কিউ' করবো আমরা। তবু মুশকিল, উন্নয়নের সংজ্ঞার সঙ্গে কোনো আদর্শের প্রতিভাস মেলানো দুরূহ কাজ। উন্নয়ন তো আসলে আর্থিক দিক থেকে উত্তমতর অবস্থায় উত্তরণ। একটি 'সমাজধর্মী' প্রলেপ অবশ্য সেঁটে দেওয়া যায় : আমরা সমগ্র সমাজের আর্থিক উন্নতি চাইছি, শুধু মধ্যবিত্তভামদির আমার-আপনার জন্য নয়, গরিব-নিঃস্বদের অবস্থারও মোড় ফেরাতে চাইছি। যখন বিপ্লবের কথা বলা হতো, তখনো অবশ্য সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নের অন্তিমলগ্নে শ্রেণিহীন, শোষণহীন, আর্থিক সমাজব্যবস্থার কথাই বলা হতো, বলা হতো এমন এক সমাজের কথা যেখানে আর্থিক প্রাচুর্য উপচে পড়বে, সে-প্রাচুর্যে সকলের সমান অধিকার থাকবে, যার অপর নাম সমাজতন্ত্র। কিন্তু যে-ভবিষ্যতের মানচিত্র এখন আঁকা হচ্ছে, তাতে সমাজবিপ্লব সাধনের প্রসঙ্গ বরবাদ, আদর্শের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত, সকলের জন্য সমান অধিকারের মতো আজেবাজে ব্যাপারও অনুচ্চারিত।

আদর্শের প্রসঙ্গ উহ্য রেখে স্রেফ উন্নয়ন নিয়ে নিরেট চিন্তাভাবনা তর্ক-প্রতর্ক ঈষৎ ন্যাড়া-ন্যাড়া ঠেকে। তালিকা থেকে আদর্শ ছেঁটে

ফেলা হয়েছে, কুছ পরোয়া নেই, উন্নয়নের নিশানা তো আছে। সেই লাক্ষাই দলের অগণিত সমর্থক সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, আদর্শ-ফাদর্শের দরকার নেই : বোধহয় নেতারা, যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই, এরকম ভাবছেন, এরকম ছক কষছেন। অনেকটা অমরনাথ যাত্রার মতো আয়োজন, একটু পা চালিয়ে চলুন। একবার উন্নয়নকামী বস্তুটিকে পাকড়াও করতে পারলেই কেল্লা ফতে। এই অভিযাত্রায় আদর্শহীনতাই একমাত্র আদর্শ। উন্নয়ন প্রসঙ্গটির আষ্টেপৃষ্ঠে স্বার্থপরতার চিহ্ন, ব্যক্তিস্বার্থ, শ্রেণি সংঘর্ষের আকৃতি থেকে তা বহু যোজন দূরে।

বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের আদর্শউহ্য আশাবাদ চর্চা অবশ্য অভূতপূর্ব নয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দেশে তথাকথিত নতুন আর্থিক প্রকল্পের জমানায় নিকোলাই বুখারিন এ ধরনের কথাবার্তা বলেছিলেন। সোনার পাথরবাটিতে তাঁর আস্থা ছিল, সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে মুনাফা ব্যবস্থাকে পুনঃস্থাপন তাঁর কল্পনাকে উত্তেজিত করেছিল। উদাত্ত কণ্ঠে সোভিয়েত জনগণকে বুখারিন তাই আহ্বান জানিয়েছিলেন, আসুন, সবাই মিলে আমরা বড়োলোক হই, আসুন, পুঁজিপতি-ধনী কৃষকদের কাছে গিয়ে বলি, আপনারাও এগোন আমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে, আপনাদের মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে সেই সঙ্গে আমরাও এগোই। তাঁর সেই মহান পরীক্ষা সোভিয়েত দেশে আদৌ বেশি দূর গড়ায়নি; গরিব-গুর্বোদের ধনী বানাতে হলে পুঁজিপতি-ধনী ভূস্বামীদের লোভের মাত্রা, লাভের মাত্রা কমাতে হয়। তাতে তাঁদের সম্মতি ছিল না। অতএব বিপ্লব-উত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁদের উৎখাত করতে বাধ্য হয়েছিল, রাষ্ট্রের হাতে সেই ক্ষমতা ছিল। ভারতবর্ষের মতো যে-সব দেশে বিপ্লবই সংসাধিত হয়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে নিছক

কল্পকথা, রাষ্ট্রশক্তি যেখানে পুরোপুরি পুঁজিপতি তথা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির কুক্ষিগত, সেখানে সার্বিক উন্নয়নের কথা বলার মধ্যে মস্ত অবাস্তবতার ছায়া পড়ে। সকলের উন্নয়ন চাই, গরিবদেরও উন্নয়ন চাই, এ সব বিবৃতি শুনতে ভালো লাগে, অথচ যেহেতু সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করছি, যে-উন্নয়ন ঘটাতে চাই তার কলকাঠি একদা-আদর্শবাদীদের হাতে নেই, প্রয়োজনানুগ রেস্ত বা ক্ষমতা তাঁদের নেই, তাঁদের নির্ভর করতে হবে সামন্তবাদী তথা ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির দাক্ষিণ্যের ওপর।

এই রাজ্যের বাঘা-বাঘা বামপন্থী নেতাদের অন্তত এটুকু বাহবা দিতে হয়, তাঁরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেননি। তাঁরা বলেছেন, আপাতত সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন, শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার চিন্তা, তাঁদের মনের গহন-গোপন কন্দরেও নেই। তাঁরা যে-উন্নয়ন ঘটাবেন তা পুঁজিবাদের উপর নির্ভর করেই ঘটবে, যে-উন্নয়ন ঘটবে বলে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হচ্ছেন, তা ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন।

এখানেই খটকা লাগে। আমরা বামপন্থী দল সংগঠন করেছি, আমাদের শপথ ছিল বিপ্লবের জাদু ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে অতঃপর সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংসাধন। আমরা এখনো বামপন্থী হিশেবেই নিজেদের দাবি করছি, অথচ কাজের বেলা, তথাকথিত বাস্তবতার দোহাই দিয়ে, ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে এগোচ্ছি। এটা কি তালগোল পাকানো ব্যাপার হয়ে গেল না, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অবসাদ-সমাচ্ছন্ন অন্য কিছু? মার্ক্সবাদ আমাদের শিখিয়েছে, ধনতন্ত্রের ভিত্তিই হলো শোষণের উপর দাঁড়িয়ে। আমরা যেহেতু নিজেদের বাস্তববাদী বলে দাবি করছি, এবং পুঁজিবাদের সঙ্গে আপস করে উন্নয়ন ঘটাতে চাইছি, যে-উন্নয়ন ঘটবে তা তো সুতরাং শোষণভিত্তিক হতে বাধ্য। আমরা বাস্তববাদী হয়েছি বলেই পুঁজিবাদ

তার নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করতে উদগ্রীব হবে না। পুঁজিবাদ শোষণের মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত থেকেই গরিবদের উপর পুঁজিওয়ালারা উৎপীড়ন চালাবে, সব ঋতুতেই চালাবে। ধনতন্ত্রের প্রচ্ছায়ায় যে-উন্নয়ন, তাতে গরিবদের তা হলে কতটুকু উন্নয়ন ঘটবে? পুঁজিওয়ালারা তো বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে কোনো আগাম চুক্তি করেননি যে, যে-উন্নয়ন ঘটবে তাতে তাঁরা শোষণের মাত্রা একটু কমিয়ে দেবেন, যাতে গরিবদের হাল খানিকটা অন্তত ফেরে। পুঁজিওয়ালাদের ভারি বয়েই গেছে যে তাঁরা সে ধরনের কোনো আবদার মেটাবেন।

যেহেতু বিশ্বায়নের পরাক্রমে আপাতত আমরা পর্যুদস্ত, বিপ্লবের স্বপ্ন ও সাধনা মুলতুবি রেখে কিছু সময়ের জন্য উন্নয়নমুখি হওয়া যাক, এই তত্ত্বের ফেরে পড়ে অন্ধগলিতে আমরা নিপতিত হতে বাধ্য। এই মুহূর্তে কৃষিক্ষেত্রে যে-জাতীয় সংকট দেখা দিয়েছে, তাতে তা স্পষ্ট প্রতিভাত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হুকুম আমাদের তামিল করতে হচ্ছে। বিদেশ থেকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপ থেকে, অবাধে কৃষিপণ্য দেশে ঢুকছে। আমদানি-করা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের কৃষকরা পেরে উঠছেন না। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে হাহাকার, কাতারে-কাতারে কৃষককুল আত্মহত্যা বরণ করছেন। বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমনই আজব যে ভরতুকি দিয়ে আমাদের কৃষকদের বাঁচিয়ে রাখার অধিকার পর্যন্ত দেশের সরকারের নেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তা হলে গোঁসা করবে। অথচ খোদ মার্কিন দেশে কৃষিজীবীদের রাষ্ট্র থেকে অঢেল ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে, কৃষি পণ্য রপ্তানিতেও অনুদানের ছড়াছড়ি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তা নিয়ে রা নেই। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের ধনী কৃষকরা চাচা-আপন-প্রাণ-বাঁচা নীতি ঝটপট অবলম্বন করেছেন। পঞ্চাশ একর, একশো

একর কিংবা তার-ও বেশি জমির যাঁরা স্বত্বাধিকারী, যেহেতু উন্নততর কর্ষণ প্রণালী তাঁদের সামর্থ্যের আয়ত্তের মধ্যে, অন্তত আরো কিছুদিন অতএব বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে তাঁরা সক্ষম হবেন। তা হলেও তাঁরা ইতিমধ্যেই, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে, বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কৃষিকর্ম পরিচালনায় চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। এসব চুক্তির মধ্যবর্তিতায় আধুনিকতম বৈদেশিক প্রযুক্তি তাঁদের-দখলে-থাকা বর্গক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োগ করতে পারবেন, লভ্যাংশ বিদেশিদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন।

যাঁদের আমরা মাঝারি কৃষক বলে অভিহিত করি, পাঁচ একর-দশ একরের মালিকানা যাঁদের, তাঁরা ঈষৎ অন্য পথ ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে, দেশের কোনো-কোনো অঞ্চলে, বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, হয়তো এখনো কোনো বড়ো বামপন্থী দলের বড়ো বা মেজো গোছের নেতা। সমবায়িক ভিত্তিতে কর্ষণ করে কৃষিভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, এমনধারা বিলাসী বিপ্লবধর্মী কল্পনাকে এখন কবর চাপা দেওয়াই তাঁদের বিবেচনায় শ্রেয়। তাঁদের জন্য বিকল্প স্বপ্ন জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিপ্লবের পরিবর্তে উন্নয়ন। উন্নয়ন ঘটাতে হবে, সর্ব স্তরে উন্নয়ন সব শ্রেণির উন্নয়ন, সুতরাং সেই সঙ্গে নিজেদের শ্রেণির উন্নয়ন। মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত কৃষকরা হিশেব কষেছেন, কৃষিপণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে বিদেশি প্রতিযোগিতা আরো বাড়বে, দেশে কৃষির হাল আরো খারাপ হবে, তাই কী দরকার ঝামেলায় গিয়ে। তার চেয়ে বরং যেহেতু নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে, দলের নীতিও আপাতত তাই, একটু অন্য পথে হাঁটা যাক। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমির সন্ধানে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন। তা ছাড়া অন্যান্য কারণেও জমির চাহিদা ক্রমশ

বর্ধমান। সরকারি আশ্রয়ে বা প্রশ্রয়ে, পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্যোগে বড়ো বড়ো জাতীয় সড়ক নির্মাণ হচ্ছে, হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে, মস্ত-মস্ত সাঁকো বানানো হচ্ছে, স্বাস্থ্য উদ্যান, প্রমোদ উদ্যান আরো কত কী। জমির বাজারদর স্বভাবতই চড়ছে। এই তো সুযোগ। মাঝারি কৃষকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাঁরা হয় সরকারের হাতে জমি তুলে দিচ্ছেন, সেই জমি সরকার কোনো পুঁজিপতিকে উপহার দিচ্ছেন, জমির জন্য মাঝারি কৃষকরা সুখদায়ক দাম পাচ্ছেন, যে-টাকা পাচ্ছেন তা তাঁরা, মনে-মনে ভেবে রেখেছেন, হয় ব্যাঙ্কে রেখে সুদ গুণবেন, সেই সুদের টাকায় পায়ের উপর পা তুলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন, নয়তো প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ ছোটোখাটো ব্যবসায় খাটাবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তেমন সাহসী হন, ফাটকা বাজারে গিয়ে জমি-বেচা অর্থের কিছুটা খাটাবেন। বলা তো যায় না, যতটা খাটাবেন তা ছ'মাস-আট মাসের মধ্যেই তিন গুণ, চার গুণ, দশ গুণ হয়ে যাবে, তখন দুনিয়া হবে কত মজাদার।

কিন্তু অগাধ সলিলে ডুবে মরবেন দু-তিন বিঘে, আট-দশ কাঠা কিংবা তার চেয়েও কম জমির মালিকরা, এবং সেই সঙ্গে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর সম্প্রদায়। কারণ স্পষ্ট। তাঁদের শ্রেণিগত অবস্থান মাঝারি কৃষকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাঝারি কৃষকরা, পশ্চিম বাংলায়, গত তিরিশ বছর জুড়ে বামফ্রন্টের প্রাধান্য হেতু, নিজেদের অবস্থার অনেকটাই মোড় ঘুরিয়েছেন। তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি সচ্ছলতাও অনেকটাই বেড়েছে। এবং এই সচ্ছলতার কারণে জমি বিক্রি করতে গিয়ে দর-কষাকষিতে তাঁদের তেমন গলদঘর্ম হতে হয় না। তাঁরা চড়া দাম হাঁকেন, সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই চলে, লড়াই শেষে তাঁরা জমির জন্য মোটামুটি ভালো দামই পেয়ে যান। ক্ষুদ্র কৃষকদের হাল সম্পূর্ণ অন্যরকম। যে-জমি মাঝারি

কৃষক কাঠা প্রতি কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার কমে বিক্রি করতে অস্বীকার করবেন, ছোটো চাষি তা হয়তো তিন-চার হাজার টাকায় বেচে দিতে বাধ্য হবেন। টাকা ঢেলে বড়ো বা মাঝারি কৃষক জমিকে দুই ফসলি-তিন ফসলি করতে পেরেছেন, তাই জমির জন্য ভালো দাম পাবেন। ছোটো চাষিদের জমি কিন্তু অধিকাংশই এক ফসলি। জমি ধরে রাখার ক্ষমতাও তাঁদের শূন্য, তাঁদের জমির দাম তাই তুলনাগতভাবে অনেক কম। বিদেশি কৃষিপণ্যে দেশ ছেয়ে গেছে, জমি চাষ করে আর লাভ নেই, জমি ধরে রাখবার মতো সম্বলও নেই ছোটো চাষির। সুতরাং অল্প দামে জমি তাঁকে বিকিয়ে দিতে হবে। যে-সামান্য টাকা তিনি হাতে পাবেন, তাই দিয়ে বড়োজোর দু বছর-তিন বছর পরিবার নিয়ে টিকে থাকতে পারবেন। তারপর গহন তমিস্রা।

ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আরো সঙিন হতে বাধ্য। যে-কৃষিভূমিতে তাঁরা মজুর খাটছেন, সেখানে এখন বড়ো বড়ো কারখানা হচ্ছে, কিংবা বিশাল প্রমোদ উদ্যান তৈরি হচ্ছে, অথবা মস্ত সাঁকো। তৈরির মুহূর্তে হয়তো একদা-ক্ষেতমজুরদের কারো-কারো সাময়িক কাজ জুটবে। কিন্তু কারখানা-সাঁকো-রাস্তা-হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে থাকবে। হয়তো তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ কারখানায় শ্রমিক হিশেবে, অথবা হাসপাতালে আর্দালি রূপে, নিযুক্ত হবেন। কিন্তু সে আর ক'জন? বৃহৎ ক্ষেতমজুর সম্প্রদায়ের নয়-দশমাংশের বেশি হয়তো কর্মহীনতার শ্বাসরোধকারী গুহায় মৃত্যুর দিন গুণবেন।

হ্যাঁ, মেনে নিই আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে, উন্নয়নমুখি হতে হবে। কিন্তু বাস্তবের রূপ তথা উন্নয়নের প্রকৃতি ঠিক এরকম। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বিদেশিদের অঙ্গুলিহেলনে বিদেশি পণ্য হু হু করে আমাদের

দেশে ঢুকবে, সেই সঙ্গে আমাদের দিশি পুঁজিপতিরাও ফুলে-ফেঁপে উঠবেন। হয়তো কিছু নতুন কলকারখানারও পত্তন ঘটবে। তাতে কিছু মানুষের কাজও জুটবে, কিন্তু গোটা শ্রমিকশ্রেণির কর্মসংস্থানহীনতা-জনিত হাহাকার তাতে এতটুকু নির্বাপিত হবে না, ভারতবর্ষীয়দের প্রধান বৃত্তি, কৃষিকর্ম, অতল অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে।

জাতীয় আয়ের হিশেব ধরলে অবশ্যই দেশের উন্নয়ন ঘটবেও কিন্তু তা শ্রেণিভিত্তিক উন্নয়ন। সেই উন্নয়নের কথাই কি নেতারা আমাদের বলতে চাইছেন, বোঝাতে চাইছেন? এই অতি বিশিষ্ট উন্নয়ন যতই সাফল্যের মুখ দেখবে, দেশের বেশির ভাগ মানুষ ততই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হবেন। উন্নয়নের কথামৃত বিতরণ তাঁদের চিরতরে দুর্বল করে রাখার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই; 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মতো একজনও আর বেঁচে-বর্তে থাকবেন না।

আদর্শ বনাম আদর্শবিস্মৃতি

হয়তো চিন্তাভাবনা করেই বিতর্ক বিষয়কে একটি বিশেষ আদল দেওয়া : কৃষি বনাম শিল্প। কিন্তু সমস্যাটি তো এমন অতি-তরল অতি-সরল দ্বন্দ্বমূলক নয়। অর্থশাস্ত্রের পুঁথিপত্তর যাঁর আদৌ পড়া নেই, তিনিও জানেন কৃষির উপর ভিত্তি করেই শিল্পের সঞ্চার ও প্রসার, কৃষিজাত কাঁচামাল শিল্পের উপাদান জোগায়, সেই সঙ্গে কৃষিজাত খাদ্যশস্য থেকে শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা। অন্য পক্ষে যে-কোনো গরিব, সদা-এগোতে-শুরু-করা দেশে শিল্পজাত পণ্যাদির একটি ব্যাপক অংশ কৃষিজীবীদের চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়। এমনকী যে-দেশ প্রধানত রপ্তানিনির্ভর, সেই দেশেরও শিল্পজাত পণ্যের একটি বড়ো অংশ দেশের মানুষজনের ব্যবহারে লাগে। আর যদি চিন বা ভারতবর্ষের মতো মস্ত দেশ হয়, তা হলে তো কথাই নেই, শিল্পকে টিকে থাকবার জন্যই কৃষিক্ষেত্র থেকে সঞ্জাত চাহিদার উপর নির্ভর করতে হয়।

সুতরাং কৃষি-শিল্পের সম্পর্ক আদৌ দ্বন্দ্ব-অধ্যুষিত নয়, তা বরং দ্বন্দ্ব-মিলনে সমাসবদ্ধ। যেটা আরো যোগ করা প্রয়োজন, কৃষি ও শিল্পের পাশাপাশি অন্য একটি উৎপাদন ক্ষেত্রও আর্থিক বিকাশের

ধারাক্রমে সমান প্রাসঙ্গিক; তা পরিষেবা। পরিষেবার মধ্যে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য যাতায়াত-পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি পড়ে, সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবস্থাও পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত, যেমন অন্তর্ভুক্ত ভ্রমণ বিনোদন ইত্যাদি।

কৃষিজাত দ্রব্য গ্রাম থেকে তুলে এনে শহরের কারখানায় পৌঁছুতে গেলে পরিবহন পরিষেবা প্রয়োজন, ঠিক যেমন শিল্পজাত পণ্যাদিও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছুনোর জন্য পরিষেবার ডাক পড়ে। তা ছাড়া দেশের সার্বিক আর্থিক উন্নতি ঘটলে, কিংবা কোনো বিশেষ শ্রেণির সামর্থ্য বাড়লে, তাঁরা টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কে রাখেন, জীবনবীমার সুযোগ গ্রহণ করেন, ট্রেনে-বিমানে চেপে ভ্রমণ-বিহারে বের হন, অবসর মুহূর্তে সিনেমা-টেলিভিশন দেখেন, কিংবা বার-রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভোজনে ও আনুষঙ্গিক বিনোদনে নিমগ্ন হন। যেটা লক্ষ করবার বিষয়, কৃষি ও শিল্পের প্রসারের জন্য যেমন পরিষেবা জরুরি, পরিষেবাও কৃষি ও শিল্পের নির্ভরতা ছাড়া টিকে থাকতে পাবে না। পণ্য তৈরি হলেই তা পরিবাহিত হয়, কিংবা পরিবেশিত হয়; অন্য পক্ষে যাঁরা পরিষেবা ক্ষেত্রের চাহিদা মেটান, তাঁদের উপার্জনের বেশির ভাগই আসে, অন্তত অধিকাংশ অর্থব্যবস্থায় আসে, কৃষি ও শিল্প থেকে।

এই প্রাথমিক কথাগুলির আলোচনা সেরে নিলে মূল বিতর্কটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়।

আমাদের রাজ্যের প্রেক্ষিতে যে-সংঘাত দেখা দিয়েছে, তার সূত্রপাত বেসরকারি শিল্পের স্বার্থে সরকার কর্তৃক কৃষিভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে। কৃষিভূমির সঙ্গে তিন শ্রেণির মানুষ জড়িত। জমিদার বা জোতদার, ভাগচাষি এবং ক্ষেতমজুর। জমিদারদের প্রসঙ্গ আপাতত উহ্য রেখে ভাগচাষি ও ভূমিহীন কৃষকদের সম্পর্কে একটি মন্তব্য

শুরুতেই সংযোজন সম্ভব। কর্ষণের উপর তাঁদের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। তাঁরা সাধারণত কৃষিভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে থাকেন, ইতিহাসের দিকে তাকিয়েই বলছি, প্রধানত, দুটি কারণে: এক, গ্রামাঞ্চলে আকীর্ণ খাদ্যাভাব এমনকী দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এঁরা জমির মায়া ত্যাগ করে শহরের পানে ধাবমান হন, যেমন হয়েছিলেন ১৯৪৩ সালের সেই করাল দুর্ভিক্ষের কালে, এবং দুই, যদি গোটা দেশে রমরমিয়ে কল-কারখানায় কাজ করার জন্য প্রচুর শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়; এমনটা হলে তুলনাগতভাবে বর্ধিত উপার্জনের আশায় কাতারে-কাতারে দরিদ্র গ্রামবাসী শহরের দিকে ছুটে গিয়ে থাকেন।

হালে পশ্চিমবঙ্গে এই দুই বিকল্পের কোনোটিই কিন্তু বাস্তবে ঘটেনি। বামফ্রন্ট কর্তৃক আয়োজিত ভূমি সংস্কারের ফলে বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের একটি বড়ো অংশ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মোটামুটি খেয়ে-পরে আছেন। যদিও এখানে-ওখানে দরিদ্র, ক্লিষ্ট মানুষদের অনাহারের কথা মাঝে-মাঝে শোনা যায়, রাজ্যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার প্রশ্ন নেই। অন্য পক্ষে, কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কি দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে, শিল্পে নিয়োগের জন্য শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তেমন হৈ রৈ কাণ্ড ঘটছে না। এখনো পর্যন্ত অন্তত এই রাজ্যে চিত্রটি আসলে বিপরীতই। গত কয়েক দশক ধরে এখানে কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, বেশ কয়েক লক্ষ একদা-শিল্পে-নিযুক্ত শ্রমিক কাজ খুইয়েছেন। বিশ্বায়নের ফেরে পড়ে, আধুনিকতর ও আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার ফলে, শিল্পক্ষেত্রে কর্মহীনতা ব্যাপকতর হয়েছে। সুতরাং শিল্পাঞ্চলে বাড়তি শ্রমচাহিদা দেখা দেওয়ার পরিণামে গ্রামের গরিব মানুষজন স্বেচ্ছায় কৃষিকর্ম বিসর্জন দিয়ে শহরের দিকে ধাবমান হবেন, সেরকম অবস্থা তৈরি হতে ঢের ঢের বাকি।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে অন্য একটি মন্তব্য সংযোজনও জরুরি। গত বিশ-পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে প্রচুর উন্নতি ঘটেছে, উৎপাদনশীলতাও প্রচুর বেড়েছে। কিন্তু দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেক পিছিয়ে। সেচের ব্যবহার সীমিত, এক ফসলি জমির আনুপাতিক বাহুল্যে বিচলিত হতে হয়। রাজ্যের বামপন্থী সরকারের পক্ষে এই অবস্থায় কোনো পরিতৃপ্তি বোধের শিকার হওয়া বেমানান। প্রশ্ন উঠতেই পারে, বামপন্থী আদর্শের সংস্থানে দাঁড়িয়ে সরকার ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সমবায়িক ভিত্তিতে কর্ষণের কোনো উদ্যোগই নেওয়া হলো না কেন? শিল্পের প্রসার অবশ্যই ঘটাতে হবে। কিন্তু কৃষিতে কি আমাদের আর কিছু করণীয় নেই? গরিব চাষিদের হাল, তাঁরা যদি কৃষিকর্মে আঠার মতো লেগে থাকেন, তা হলেও আদৌ ফেরবার নয়, এমন ধরনের উক্তি গলাধঃকরণ যথেষ্ট মুশকিল।

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ রাজ্য সরকার ক কিংবা খ অথবা গ নামধারী কোনো শিল্পপতির সঙ্গে সঙ্গোপনে কথাবার্তা বললেন, কী কথাবার্তা হলো তা রাজ্যের মানুষ আদৌ জানতে পেলেন না। হঠাৎ এঁদের একজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলেন, তাঁর সংস্থা এই রাজ্যে গাড়ি তৈরি করবার কারখানা বানাবেন, তার জন্য অত পরিমাণ জমি প্রয়োজন। ঠিক কোন জেলার কোন বিশেষ জায়গায় তাঁর পছন্দের জমি, তা-ও শিল্পপতিটি বলে দিলেন। সরকার বশংবদ হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ঊনবিংশ শতকীয় একটি আইন প্রয়োগ করে সেই পরিমাণ জমি অধিগ্রহণান্তে উক্ত শিল্পপতির হাতে তুলে দিলেন : এই সমস্ত ঘটনাবলিই একটি অস্থির পরিবেশ তৈরি করেছে। সরকার যদিও বলছেন তাঁরা বাজারদরের চাইতে আরো অনেক বেশি টাকা অর্পণ করে প্রতিটি বর্গক্ষেত্র—তা অনুর্বর অথবা এক বা দু' ফসলিই হোক—

অধিগ্রহণ করেছেন, তাতেও সংশয় ঘোচে না। সরকার যদিও বলছেন, তাঁরা আইনের বাইরে যাননি, আইনমাফিক বিধিবদ্ধভাবে জমি অধিগ্রহণ করেছেন, তাতেও প্রশ্নাদির নিরসন হয় না, বরং আরো বাড়ে। আমরা তো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আছি। এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, কখনো-কখনো এই ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা-অসামঞ্জস্যগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, একদা বামপন্থীরাই গ্রামে-শহরে সাধারণ মানুষের চেতনার মান তীক্ষ্ণতর, তীব্রতর করতে প্রয়াসবান হয়েছিলেন, সেই প্রয়াসের ফলও সুন্দর মিলেছে। যা আইনসিদ্ধ তা সর্বক্ষেত্রে ন্যায়যুক্ত না-ও হতে পারে। তা ছাড়া যে-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করছি তা তো প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র। আমি যদি বেচাল কিছু করি, আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তার সুযোগ গ্রহণ করে আমাকে অবশ্যই ব্যতিব্যস্ত করবেন, এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কোনো অকর্ম-কুকর্ম করেন, আমি তার সুযোগ গ্রহণ করবো। এটাই গণতন্ত্রের মর্মকথা। তা নিয়ে নাকি কান্না জুড়লে সহানুভূতি উদ্রেকের আশা শূন্য।

প্রথম কথা, ইংরেজদের বুটের তলায় আমাদের গোলামির জমানায় ১৮৯৪ সালে যে-আইন ঘোষিত হয়েছিল তা প্রয়োগ করে জমি অধিগ্রহণ করলে গোলমাল দেখা দিতে বাধ্য। সমগ্র প্রক্রিয়াটিই তো বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ, শতকরা আশি কি নব্বুই কি পঁচানব্বুই ভাগ গ্রামবাসী স্বেচ্ছায় জমির স্বত্ব ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছেন কিনা সেই তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জমি দখল করেছেন, জমির জন্য হয়তো ন্যায্য দাম দিয়েছেন, আইনমাফিক ব্যবস্থা নিয়েছেন, তাতেও কিন্তু কতগুলি জরুরি সমস্যার নিরসন হয় না।

যে-কৃষকের মাত্র এক ছটাক জমি ছিল, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি যদি সেই জমি থেকে উৎখাত হতে রাজি

না থাকেন, তা হলে বিধিবদ্ধভাবেও যদি তাঁর জমি নিয়ে নেওয়া হয়, তাঁর প্রতিবাদ জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকার কেউই কেড়ে নিতে পারবেন না, এবং তাঁর ও অন্যান্য অসুখী কৃষকদের প্রতিবাদে সংহত হওয়ার ও আন্দোলন সংঘটিত করবার অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে-কোনো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক সংস্থার, এমনকী একজন আপাত নিঃসঙ্গ নায়ক বা নায়িকারও, থাকবে। যে-প্রশ্নগুলি তাঁরা উচ্চারণ করবেন, সরকারকে ঠাণ্ডা মাথায় সে-সবের জবাব দিতে হবে। যদি সরকার জবাব দিতে অসম্মত হন, অশান্তি ছড়াবে। দেশের ও পৃথিবীর যে-হালচাল, সেই অশান্তি, আশঙ্কা হয়, অচিরে সহিংস রূপ নেবে। এমনও বলা চলবে না, যাঁরা প্রশ্ন করছেন, প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠনে মেতেছেন, তাঁরা অঞ্চলের বাইরের লোক, তাঁদের প্রশ্নাবলির জবাব দিতে সরকাব বাধ্য নয়। বামপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, তথাকথিত বহিরাগতরাই গ্রামে গিয়ে কৃষক সভার ভিত স্থাপন করেছেন, শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

আমার বিবেচনায় সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কী-কী শর্তে রাজ্য সরকার টাটার সঙ্গে যুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা নিয়ে। সম্প্রতি পঞ্চাশ হাজার কোটিরও বেশি টাকার পরিমাণ বিনিয়োগ করে টাটা গোষ্ঠী একটি আন্তর্জাতিক ইস্পাত সংস্থা বাজার থেকে ক্রয় করেছেন। অথচ যে গুজব রটেছে, এবং যা নিরসনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আদৌ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, টাটারা নাকি সিঙ্গুর অঞ্চলে তাঁদের কাছে অর্পিত প্রায়-এক হাজার একর জমির জন্য একটি কানাকড়িও আপাতত দেবেন না। নব্বুই বছরের জন্য টাটা গোষ্ঠী এই বিস্তৃত বর্গক্ষেত্র ইজারা পাচ্ছেন। অথচ ইজারার জন্য বিগলিতকরুণা সরকার কোনো

নজরানাই দাবি করেননি; প্রায় বিনি পয়সায় ভোজের ব্যবস্থা। তবে শুধু তাই নয়, টাটারা যাতে কারখানাটি নিয়ে অন্য রাজ্যে চলে না যান, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার দুশো কোটি টাকা অনির্দিষ্টকালের জন্য উপঢৌকন দিচ্ছেন, বলতে গেলে শূন্য সুদে। দশ-কুড়ি বছর গড়িয়ে গেলে নাকি টাটারা সৌজন্যের খাতিরে দফায় দফায় নব্বুই বছর জুড়ে সরকারকে জমির দাম হিশেবে অনুগ্রহ করে 'ফেরত' দেবেন। অভূতপূর্ব দাতব্য ব্যবস্থা। সঙ্গে-সঙ্গে কাতারে-কাতারে প্রশ্ন জড়ো হয়। প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় যে-বামপন্থী চেতনা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মনে সঞ্চারিত, টাটাদের সঙ্গে এই ধরনের বোঝাপড়ায় তা বিবমিষা উদ্রেক না করে পারে না। যে-জমি অধিগ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে কম পক্ষে দেড়শো কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে, তা টাটা গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উপভোগ করবেন, অভাবনীয় প্রস্তাব এটা। এই রাজ্যে শিল্পে তেমন বিনিয়োগ হচ্ছে না, অতীতে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে অনেক ভুল বার্তা শিল্পপতিদের কাছে পৌঁছেছিল, এখন তা নিরসন প্রয়োজন, জানেনই তো রাজ্য সরকারের নিজের পক্ষে শিল্প গড়ার মতো অর্থসামর্থ্য নেই, টাটা গোষ্ঠীর মতো পুঁজিওয়ালাদের তাই বাড়তি খাতির করে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই, ইত্যাদি যুক্তি উপস্থাপন করেও কিন্তু জনগণের মনের সংশয় দূর করা আদৌ সাধ্য হবে না। সরকার যে-যুক্তিগুলি দেখাচ্ছেন, তাদের যাথার্থ্য নিয়েও তর্ক উত্থাপন সম্ভব। একটু বাদে সেই তর্কে ফিরবো।

অন্য প্রশ্ন, জোতদার-জমিদাররা না হয় জমি বাবদ সরকারের কাছ থেকে দাম পেলেন, তাতে তাঁরা না হয় সন্তুষ্ট, তাঁদের প্রাপ্য টাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ বর্গাদারদের দিতে বাধ্য হলেন, তা হলেও কিন্তু সমস্যার আকীর্ণতা হ্রাস পায় না। সরকারও বলছেন না, টাটা গোষ্ঠীর

পক্ষ থেকেও স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না, যে-বৃহৎসংখ্যক বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর জমি থেকে নির্বাসিত হলেন, তাঁদের মধ্যে ক'জন শেষ পর্যন্ত গাড়ি তৈরির কারখানায় ও সেই সঙ্গে গড়ে ওঠা সহযোগী শিল্পাদিতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এখনো পর্যন্ত যে-উত্তরগুলি মিলেছে, সব ক'টিই ভাসা-ভাসা। সরকারের পক্ষ থেকে বার-বার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, গাড়ির কারখানা স্থাপন সম্পূর্ণ হলে সিঙ্গুর অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা আগাপাশতলা পাল্‌টে যাবে, অনেক সহায়ক শিল্পের উদ্ভব ঘটবে, জনগণের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হবে। শুধু কথায় তো চিড়ে ভেজে না। কয়েক মাস আগে টাটা গোষ্ঠী-চালিত জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার একশো বছর পূর্ণ হলো। এই একশো বছরে সন্নিহিত অঞ্চলে আদিবাসী জনগণের কতটুকু আর্থিক উন্নতি ঘটেছে? যাঁরা সমস্যাটি নিয়ে চিন্তিত, তাঁরা সেই সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। তাঁরা তো জানেন উত্তরপাড়ায় গাড়ি তৈরির কারখানা তৈরি করার জন্য সেই আদ্যিকালে বিড়লা গোষ্ঠীকে আটশো একরের মতো জমি সরকার থেকে বিতরণ করা হয়েছিল। সেই জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, আনুমানিক তিনশো একর পরিমাণ, বিড়লারা আদৌ ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এখন তাঁরা সরকারের অনুমতি নিয়ে সরকারকে মাত্র দশ-বারো কোটি টাকার সম্মান দক্ষিণা দিয়ে, তা বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন। জনশ্রুতি, বাটানগরেও নাকি শিল্পপতিদের প্রতি সেই ধরনের ঔদার্য সরকার কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে: তাঁদের কাছে ইজারা দেওয়া উদ্বৃত্ত জমি এখন বাটা সংস্থা ঠারে-ঠোরে চেষ্টা চালাচ্ছেন বাজারে বিকিয়ে শাঁসালো বাড়তি উপার্জনের।

তবে এসব বড়ো, ছোটো, মাঝারি কূটকাচালি ছাপিয়ে সব চেয়ে বড়ো প্রশ্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত শিল্পায়নের প্রকৃতি নিয়ে।

সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর গাড়ি তৈরির কারখানা নিয়েই নয়, সামগ্রিকভাবে রাজ্য সরকার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সেই গোছের অন্যান্য যে-সব প্রকল্প নিয়ে উৎসারিত হয়েছেন, তাদের জড়িয়ে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, গোটা পৃথিবীকে তাঁদের অঙ্গীকার জানানো হয়েছিল : ভারতবর্ষের আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সাধ্য একটি রাজ্য সরকারের নেই, ভারতবর্ষ জুড়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব না ঘটলে তা সম্ভব নয়; তা ছাড়া বামফ্রন্ট সরকারকে ভারতীয় সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে, সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিয়মকানুন মেনে, কাজ করতে হবে; তথাপি বামফ্রন্ট সরকারের শপথ, বর্তমান ব্যবস্থার হাজারো প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা একটি বিকল্প আর্থিক নীতি প্রয়োগ করবেন, বামাদর্শভিত্তিক নীতি, সমাজতান্ত্রিক নীতি, এবং সেই নীতি প্রয়োগ করে যে-সাফল্য আসবে, তা দেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ চমৎকৃত হবেন, মুগ্ধতাবোধহেতু তাঁরা পিলপিল করে সারা দেশ জুড়ে বামপন্থার দিকে ঝুঁকবেন; পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাবে, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আদর্শ, সেই আদর্শের প্রয়োগ, সমগ্র ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

বর্তমানে যাঁরা রাজ্য বামফ্রন্টের হাল ধরে আছেন, সেই পুরনো অঙ্গীকারের ধার কাছ দিয়েও তাঁরা হাঁটছেন না, হাঁটবার সাহস তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা যে-যুক্তি উপস্থাপন করছেন, তার সারাৎসার : বিশ্বায়নের পরাক্রমে এখন অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে, বিশ্বায়নের প্রকোপে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবস্থা সর্বত্র হয় অপসৃত নয় সংকুচিত। এখন রাজ্যে-রাজ্যে প্রতিযোগিতা চলছে শিল্পের প্রয়োজনে কে কত বেসরকারি বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে পারবে।

আমরা যদি সেই প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের নাম না লেখাই, আদর্শের বদ্ধ ডোবায় নিজেদের আটকে রাখি, তা হলে অন্য রাজ্যগুলি এগিয়ে যাবে, আমরা মুখ থুবড়ে পড়বো। আপনারা তো জানেন, সংবিধানের অনুশাসন-হেতু আমাদের আর্থিক সামর্থ্য কত সীমিত; আপনাদের তো এটাও জানা, আমাদের রাজ্য সরকারকে দেড় লক্ষ কোটি টাকার ঋণ বইতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পায়নের জন্য স্বদেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই; তাঁরা শিল্পপতিরা, যদি দয়া করেন, আমরা বাঁচবো, তাঁরা যদি আমাদের দিকে না তাকান, আমাদের অগাধ সলিলে ডুবতে হবে।

এঁরা সোজা আঙুলে ঘি তুলছেন না, আঙুল বাঁকা করে নিজেদের আদর্শস্খলনের কথা ব্যক্ত করছেন মাত্র। বামপন্থীরা তো — অন্তত সংবাদপত্র পড়ে যে-ধারণা জন্মায় — বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, কেন্দ্রের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যাতে বেসরকারি মালিকদের কাছে সস্তায় ঝেড়ে দেওয়া না হয়, তার জন্য সংসদ ও সংসদের বাইরে চিল চিৎকার করছেন, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্রধান স্থান দিতে তাঁরা এত গররাজি কেন?

অতীতে বলা হতো কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ঝোঁকে বিরক্ত ও সেই কারণে রাজ্য সরকারের প্রতি বিমুখ, শিল্পের জন্য লাইসেন্স এই রাজ্যকে দিচ্ছেন না, কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ বাড়াচ্ছেন না, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ আর্থিক সংস্থাদি ও ব্যাংক সমূহ থেকে রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়ানোয় কেন্দ্রের গভীর অনীহা। এখন তো লাইসেন্স প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে, যে-কোনো মুহূর্তে সংসদে বামপন্থীরা উল্টোদিকে ভোট দিয়ে কেন্দ্রের সরকারকে উৎখাত করতে পারেন। এখানে তাই একটি বিনীত জিজ্ঞাসা; কোথায় তা হলে

আটকাচ্ছে? ভারতীয় জীবনবীমা, ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, আই সি আই সি আই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশন অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি কেন্দ্রীয় আর্থিক সংস্থাদি, এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্র-পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংক, লক্ষ, কোটি টাকার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এত টাকা নিয়ে কী করবেন তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না, এই টাকার একটা বড়ো অংশ ফাটকা বাজারে খাটাবার জন্য তাঁরা সতত উদগ্রীব। কেন্দ্রের দখলদারিতে থাকা এই বিরাট অঙ্কের টাকা থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ — বছরে বড়োজোর, দশ, পনেরো কি কুড়ি হাজার কোটি টাকা — কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অর্পণ করা হবে না? সেরকম পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা পড়লে সরকারের তরফ থেকে শিল্প প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া সহজ হতো। এই রাজ্যে তো দক্ষ কারিগরের অভাব নেই, বুদ্ধিমান প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিকের ঘাটতি নেই, সুচতুর অর্থনীতিবিদদেরও তো এখানে ঠাসাঠাসি ভিড়। তাঁদের সহায়তায় কেন তা হলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হবে না : এই প্রশ্নের উত্তর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত অনুচ্চারিত। যেটা বাড়তি পরিতাপের, রাজ্য সরকারের শিল্প-কৃষি নীতি নিয়ে যাঁরা প্রতিদিন সমালোচনা-মুখর, তাঁরাও এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি উত্থাপন থেকে বিরত থাকছেন। সরকারের তাই নীরব থাকতে অসুবিধা হচ্ছে না।

গোড়ার কথায় ফিরি। সমস্যাটি কৃষি বনাম শিল্পের পারস্পরিক বৈপরীত্য নিয়ে নয়। মৌল জিজ্ঞাসা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প না কি পুঁজিবাদী শিল্প এই বিতর্ক ঘিরে। যাঁরা আপাতত রাজ্যের হাল ধরে আছেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হাল ছেড়ে দিয়ে, সমাজতান্ত্রিক নীতি-আদর্শ-স্বপ্ন দেখার সাহস পরিত্যাগ করে, ধনতন্ত্রের পক্ষে সওয়াল করছেন। তাঁদের হীনম্মন্যতার মাশুল গুনতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের।

কারণ, ভেবে দেখুন, যদি সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম বা অন্যত্র রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হতো, তা হলে জমিচ্যুত কৃষিজীবীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্যরকম না হয়ে যেত না। আমাদের নিজেদের সরকার, আমাদের রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজের উদ্যোগে, নিজের আয়ত্তাধীনে, কারখানার পর কারখানা খুলছেন, সে-সব কারখানায় আমাদের, ও আমাদের সন্তান সন্ততিদের, কাজের সুযোগ ঘটবে, গোটা রাজ্য জুড়েই কর্মসংস্থান ঘটবে, ক্রমশ রাজ্যে প্রাচুর্য উপচে পড়বে, আমরা দুধে-ভাতে নিশ্চিন্তে থাকবো। যদি ছুটকো-ছাটকা বা বড়ো গোছের সমস্যায় শিল্পায়ন জর্জরিত হয়, সেই সমস্যা নিরসনের দায়বদ্ধতা আমাদের সরকারেরই থাকবে, আমাদের বিপন্নতা নিয়ে বেসরকারি মালিকদের শরণাপন্ন হতে হবে না। কারখানাগুলি থেকে যে-মুনাফার সৃষ্টি হবে, তা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ফের নিযুক্ত হবে, লাভের গুড় বেসরকারি পিঁপড়েরা খাবে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্প গঠনের পথে না হেঁটে রাজ্য সরকার যখন রক্তশোষণকারী পুঁজিওয়ালাদের হাতে জমি তুলে দিতে চান, কোটি-কোটি মানুষের হৃদয়ে-অন্তরে ম্লানতার ছায়া নামে। আমরা তো তিরিশ বছর আগে অন্যরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম, অন্যদের কাছে গর্বভরে সেই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতাম। সেই স্বপ্ন কেন উধাও হলো? কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের আন্দোলনে কেন ভাঁটা পড়লো? আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে আমাদের সরকার হঠাৎ কেন মেষশাবকে পরিণত হলেন?

বিষয়টি কৃষি বনাম শিল্প নিয়ে নয়, আদর্শ ও আদর্শবিস্মৃতি ঘটিত।

দোহাই, উদ্ধৃতি দেবেন না

বাঙালি কবি বিলাপ করেছেন, যৌবন যায়, অথচ যৌবনবেদনা যায় না। অনেকটা যেন সেরকমই ঘটনাবলি · বিশ্বায়নের প্রকোপেই হোক, কিংবা অন্য-কোনো কারণবশত, আদর্শ-বিশ্বাস থেকে অনেককে সরে যেতে হয়েছে, আদর্শ-নির্দিষ্ট পন্থার বিপরীত দিকে তাঁদের হাঁটা শুরু। অথচ অভ্যাস যায় না ম'লে। এখনো মুখে আদর্শের বুলি কপচানি, এবং আদর্শের বিরোধিতার কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সাফাই হিশেবে আদর্শমন্দ্রিত উদ্ধৃতি দিয়ে সাফাই গাওয়া হচ্ছে।

পশ্চিম বাংলার প্রশাসনে আপাতত বামপন্থী কর্মসূচি বিসর্জন দিয়ে ধনতন্ত্রের কীর্তনপালা জমছে, প্রতিদিন আরো বেশি জমছে। এটা আদর্শবানদের পছন্দ না-ও হতে পারে। আবার অন্য কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, বাস্তবতাকে আদর্শ থেকে ভিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়, যে-করালমুহূর্তে আমরা বিরাজ করছি, আপাতত আদর্শ ভুলে স্রেফ বেঁচে থাকার দিকে নজর দেওয়াই শ্রেয়।

যাঁরা দ্বিতীয় ধরনের উক্তি করছেন, ধরে নিচ্ছি তাঁরা তা আন্তরিকতার সঙ্গেই করছেন। তাঁরা ঠিক না ভুল, কিংবা তাঁদের যাঁরা বিরুদ্ধবাদী, তাঁরা কতটা সঠিক বা বেঠিক, তা ইতিহাসই বিচার করবে।

মুশকিল দেখা দিয়েছে অন্যত্র। যাঁরা আদর্শ আঁকড়ে থাকার সড়ক থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভাঙলেও মচকাবেন না। তাঁরা দাবি করছেন, তাঁদের উলটোরথে যাত্রাও আদর্শ মেনেই, এবং নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা শাস্ত্রীয় পুঁথি ঝেড়ে উদ্ধৃতির ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন।

যেমন একজন-দুজন দাবি করছেন, পশ্চিম বাংলায় আপাতত যে-পথ দিয়ে হাঁটা হচ্ছে, তা পুরোপুরি কমরেড লেনিন-অনুসৃত নব অর্থনৈতিক নীতি, যা সোভিয়েত বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যায়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তার হুবহু প্রতিভাস। পৃথিবীর বুকে তখন একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাষ্ট্র। তাকে ঘিরে বাঘা-বাঘা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যারা সোভিয়েত দেশকে আঁতুর ঘরেই নুন খাইয়ে মারতে চায়, সোভিয়েত দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য তারা বন্ধ করে দিয়েছে, সোভিয়েত দেশের বিপ্লবী জনগণকে তারা না খাইয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে উৎসুক। এই অবস্থায় কমরেড লেনিন বাধ্য হয়ে সোভিয়েত দেশের ধনী কৃষকদের সঙ্গে সাময়িক সমঝোতা করলেন, এবং অবশিষ্ট যে-সব মাঝারি পুঁজির মালিক ইতস্তত এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিটোনো, তাদের সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ায় এলেন। ঘরে-বাইরে একসঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয় এই প্রতীতি থেকে লেনিন সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন : আপাতত আভ্যন্তরীণ সংস্কারে ঢিলে দেওয়া যাক, লক্ষ্মীছাড়া কুলাকদের একটা-দুটো মিষ্টি কথা বলা যাক, দেশের যে-পুঁজিবাদীকুল তখনো অবশিষ্ট, তাদের বলা যাক, জনগণের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কারো, তাদের কাছে জিনিসপত্রের জন্য চড়া দাম হেঁকো না, এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতে টালবাহানা কোরো না; এরকম আচরণে যদি সম্মত হও উপস্থিত মুহূর্তে তোমাদের একটু ক্ষমা-ঘেন্না করা হবে।

কিন্তু এই সাময়িক আভ্যন্তরীণ রণশিথিলতা হেতু মোটেই সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির অভিযানে যতি পতন ঘটেনি। সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে শিল্পপতি তথা কুলাক শ্রেণিকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছিল, এবং পুঁজিপতিদের সঙ্গে সাময়িক বোঝাবুঝির পাশাপাশি, একদিকে যেমন কৃষিতে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ তড়িঘড়িতে হচ্ছিল, সেই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ পন্থায় ক্রমশ শক্তপোক্ত করার আয়োজন চলছিল।

বর্তমান মুহূর্তে পশ্চিম বাংলায় যাঁরা দাবি করছেন, এই যে উঠতে-বসতে-স্বপ্নে-জাগরণে ওঁরা পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের সেলাম ঠুকছেন, প্রত্যুদ্গমন করে যাদের পশ্চিম বাংলায় নেমন্তন্ন করে আনছেন, তাদের জন্য অতি সরেস উর্বর জমি গোপন রাখা শর্তে জলের দামে বিকিয়ে দিচ্ছেন; এসবই গত শতাব্দীর বিশের দশকের গোড়ায় সোভিয়েত দেশে কমরেড লেনিন ও তাঁর অনুগামীরা যা করেছিলেন তারই অনুকরণ। আমি দুঃখিত, তাঁরা নিজেদের বিভ্রান্ত করছেন, সেই সঙ্গে রাজ্যের জনগণকেও।

এই বন্ধুরা শুধু ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যাই করছেন না, কমরেড লেনিন ও তাঁর সহকর্মী অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের পুণ্য স্মৃতিকে সমূহ অপমান করছেন। পশ্চিম বাংলায় যাঁরা পুঁজিপতিদের আহ্বান করে আনছেন, তাঁরা নিজেরাই বলছেন, কী আর করা, আমরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থান করছি, অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদেরও পুঁজিপতিদের হুকুমবরদার না বনে গিয়ে উপায় নেই, আমরা যদি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুঁজিপতিদের খাতির যত্ন না করি, তাঁরা পশ্চিম বাংলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন, আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক দুর্দশা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে।

অতএব আপনারা নিজেরাই তো গোড়াতেই স্বীকার করছেন সেই সময়কার সোভিয়েত দেশের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থানের দুস্তর ফারাক। ওখানে আগেই বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল, রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে পুঁজিপতি-সামন্ততান্ত্রিক কেষ্টবিষ্টুদের গলাধাক্কা দিয়ে উৎখাত করা হয়েছিল, আমাদের এখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনুরূপ কোনো দাবি করার প্রশ্ন নেই। যাঁরা নতুন নীতির প্রবক্তা, তাঁরাও তা করবেন না, করলে তা হবে বাতুলতা। যেহেতু রাষ্ট্রশক্তি তাঁদের হাতের মুঠোয়, গত শতকের বিশের দশকে সোভিয়েত দেশের সমাজতান্ত্রিক নায়করা কলাকৌশল প্রয়োগ করে পুঁজিপতি তথা জমিদার শ্রেণির সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ায় আসতে সফল হয়েছিলেন। তাতে শ্রেণি স্বার্থের কোনো ক্ষতি ঘটেনি, বিপ্লবের শপথগুলি ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়নি। পশ্চিম বাংলায় এই দু হাজার ছয় সালে দাঁড়িয়ে আমাদের কবুল না করে উপায় নেই, এখানে তো বিপ্লব হয়নি, রাষ্ট্রশক্তি আমাদের করতলগত আমলকীর মতো নয়। এসব জেনে-শুনেই আমরা শত্রু শ্রেণির ধরাচূড়াদের সঙ্গে আঁতাত গড়ছি, তাঁদের সেলাম ঠুকছি, তাঁদের সমস্ত আবদার মেনে নিচ্ছি, তাঁরা মৃদু বকুনি দিলেও ভয়ে সিঁটিয়ে আসছি।

সুতরাং, দোহাই, উদ্ধৃতি কপচাবেন না, সোভিয়েত দেশের একটি বিশেষ অবস্থায় গৃহীত একটি সাময়িক নীতির উল্লেখ করে নিজেদের গোস্তাকি ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। সেই অধিকার কী ইতিহাস, কী আন্দোলন আপনাদের দেয়নি।

তবে সেই সঙ্গে কৌতুকমিশ্রিত একটি অন্য কথাও বলবো। যে যে পুঁজিপতিদের আপনারা ডেকে আনছেন, তাঁরাই অবশ্য অর্ধ শতাব্দী ধরে গুজরাট-মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক-তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে শিল্পে অগ্রগতি ঘটিয়েছেন, এবং বিদেশি পুঁজির উপর বিশেষ নির্ভর

না করে। কিন্তু তাঁরা যে-পুঁজি খাটিয়েছেন, তার শতকরা আশি-নব্বুই ভাগ এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানাদি থেকে। ভারতীয় বিমা কর্পোরেশন কিংবা ওই জাতীয় অন্যান্য বিবিধ সংস্থা লক্ষ কোটি টাকার পাহাড়ের উপর বসে আছে। সেই টাকাই ওই সমস্ত রাজ্যে খাটানো হয়েছে। পাশাপাশি ওসব রাজ্যে পরিকাঠামোর উন্নতিও ঘটেছে প্রধানত কেন্দ্রের অধীনস্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলির মারফত পাওয়া অর্থের মধ্যবর্তিতায়।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, আমরা বামপন্থীরা পশ্চিম বাংলায় যখন ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ করি, জনতার দরবারে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলাম, একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করবো, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে শিল্পায়ন তথা উন্নয়ন ঘটাবো, যা দেখে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের তাক লেগে যাবে, আমাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বামপন্থার দিকে তখন ঝুঁকবেন, এবং তা হলে অচিরে সারা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই শপথ কোন সুড়ঙ্গে পথ হারালো, কেন, কাদের কৃতিত্বে এটা ঘটলো, সে-সব নিয়ে প্রশ্ন করবার অধিকার কি সাধারণ মানুষের নেই? আপনারা তো দাবি করছেন, কেন্দ্রের সরকার টিকে থাকার জন্য আমাদের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল, আমরা এই সরকারকে কানে ধরে ওঠবস করাতে পারছি। তা-ই যদি হয়, তাহলে এই যে লক্ষ-কোটি টাকার পাহাড়ের উপর কেন্দ্রের অধীনস্থ ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাজ করছে, সেই টাকার একটি বড়ো অংশ ফাটকা বাজারে খেলিয়ে টাকার পাহাড় আরো উঁচু করছে, আমরা যদি এতই ক্ষমতাবান, এই বিরাট অর্থ-প্রাচুর্যের একটি অংশ সরকারি খাতে গ্রহণ করে পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে শিল্পায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? কেন্দ্রকে চোখ রাঙালেই তো

আপনারা টাকা হাতে পেয়ে যাবেন তাহলে পুঁজিপতিদের কাছে ধর্না দিচ্ছেন কেন? একটার পর একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে একটার পর আরেকটা কারখানা তৈরি করে শিল্পায়নের উন্নতি ঘটাচ্ছেন না কেন?

প্রশ্নগুলি সোজা। প্রশ্নের অভাব নেই, কিন্তু যাঁবা একবল্গা, ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় বুঁদ হয়ে আছেন, ধনতন্ত্রের প্রসাব না ঘটালে নাকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তাঁদের কাছ থেকে জবাব আশা করা কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে। শুধু একটিই বিনীত অনুরোধ : ভালো কথা, আপনাদের বিপ্লবের বাই ঘুচেছে, আপনারা আব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন না, আপনারা পুঁজিবাদের সৌধ রচনা করবেন। আপনাদের জন্য আমাদের শুভ কামনা রইলো, কিন্তু, দোহাই, দয়া করে বিপ্লবী বুলি আওড়াবেন না, মহান বিপ্লবীদের লেখনী থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের অপকর্ম ঢাকবার চেষ্টা করবেন না।

আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে ইতিহাসে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন, তা হলে তো নটে গাছটি এমনিতেই মুড়িয়েছে সুতরাং গীতার উপদেশ মেনে সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্র ব্যবস্থার নৃপতিকুল পর্যায়ক্রমে যা বলবেন : সমস্ত আদেশ পালন করুন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে সস্তায় তাঁদের জমি বিলোন, তাঁদের জন্য মসৃণ রাজবীথি-বাজার-দোকান তৈরি করুন, সব রাজ্যের তুলনায় নির্দয়তম শ্রমনীতি প্রবর্তন করুন, নইলে প্রতিযোগিতায় যে সফলতা পাওয়া যাবে না, পুঁজি অন্য রাজ্যে চলে যাবে। সব মানতে রাজি আছি, কেবল একটি শর্ত : মার্কস-এঙ্গেলস থেকে মুখস্থ বলবেন না।

দক্ষিণায়ন

নিছক ঋতু পরিবর্তন নয়, যা ঘটেছে, ঘটছে তা প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ব্যাপার।

ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতি বছর শ্রদ্ধাভরে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের জন্মদিন পালন করা হয়ে থাকে; সভা-সমিতির আয়োজন করা হয়, দলের নেতারা ইতিহাসের মহানায়কদের আদর্শ ও কীর্তির কথা সমবেত জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন, নতুন করে বিপ্লবী প্রভায়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান, দলের পত্র-পত্রিকায় মহানায়কদের নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপা হয়, কখনো-কখনো তাঁদের রচনাবলি থেকে উদ্ধৃতি-সহ।

মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষঙ্গে কিন্তু দলের প্রয়াত জাতীয় নেতাদের জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবস পালনের রেওয়াজ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে নেই। সুন্দরাইয়া-রণদিভে-নাম্বুদ্রিপদদের মতো প্রয়াত নেতাদের জন্মদিন বা প্রয়াণ তারিখে কোনো অনুষ্ঠান হয় না, অন্তত আজ পর্যন্ত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে দলের প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গে যে-সব প্রয়াত নেতার ভূমিকা ভুলে থাকা অমার্জনীয় অপরাধ — যথা প্রমোদ দাশগুপ্ত, আব্দুল হালিম, হরেকৃষ্ণ কোঙার,

গণেশ ঘোষ, বিনয় চৌধুরী—তাঁদের কারো জন্মদিনেও দলের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম মুজফ্‌ফর আহমদ: রীতি ভেঙে তাঁর জীবদ্দশাতেই একবার কাকাবাবুকে তাঁর জন্মদিনে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পরেও সেই ঐতিহ্য রক্ষা করা হচ্ছে।

কিন্তু পার্টির অন্য-কোনো প্রয়াত জাতীয় বা রাজ্য নেতার ক্ষেত্রে সেই প্রথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এবং সেজন্যই খবরটা জেনে চোখ কচলাতে হয়। না, সি পি আই (এম) দলের প্রয়াত রাজ্য নেতাদের স্মরণ করার জন্য নতুন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, প্রমোদ দাশগুপ্ত বা হরেকৃষ্ণ কোঙারের জন্মদিন পালনের জন্য দলীয় কর্মীদের কোনো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না, তবে দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এ বছর পয়লা জুলাই প্রয়াত বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মতিথিতে দল ও দলীয় কর্মীরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে, বিশেষ করে শিল্পোন্নয়নে, বিধানচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে সম্যক অবহিত করতে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আদাজল খেয়ে নামবে।

সেই কবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভ্রান্তিবশত লিখে গিয়েছিলেন, দেশের কুকুর পূজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। সেই গোছের ভুল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে আর করা হবে না : দলের বর্তমান রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত-গণেশ ঘোষ-বিনয় চৌধুরী-হরেকৃষ্ণ কোঙারদের জন্মদিন উদ্‌যাপন ততটা জরুরি নয়, অনেক বেশি জরুরি বিধানচন্দ্র রায়ের আরাধনা।

দলের নেতৃত্ব যে-তাগিদ অনুভব করেছেন, তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব, যদিও কুরুচিকর মন্তব্য যাঁদের পছন্দ, তাঁরা ফুট কাটবেন, ঠ্যালার নাম বাবাজি। পৃথিবী, দেশ তথা রাজ্যের প্রেক্ষাপট আমূল পাল্টেছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের চূড়াদেশে অধিষ্ঠিত মার্ক্সবাদী

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দও চলতি হাওয়ার পন্থী হতে একান্ত ব্যগ্র। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর এখন এক পরমাশ্চর্য মিলনক্ষেত্র, নেহরু-গান্ধি পরিবারের গৃহভৃত্য থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের হোমরা-চোমরা, প্রত্যেকের মুখে এক বুলি : উন্নয়ন। ভোজনে-উপবেশনে, শয়নে-স্বপনে উন্নয়নের একাগ্র চিন্তা, এই চিন্তার জালে পড়লে আদর্শের বালাই নিয়ে আর ভাবতে হয় না, শ্রেণিস্বার্থে অথবা শ্রেণিসংগ্রামের প্রসঙ্গ তুচ্ছাতিতুচ্ছে পর্যবসিত হয়, বিপ্লব নামক একদা রোমান্টিক দুঃস্বপ্ন পঞ্চভূতে বিলীন হয়। যেহেতু এটা প্রতিষ্ঠিত কিংবদন্তী, প্রয়াত বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের আদি ও অকৃত্রিম রূপকার, তাঁর আদর্শই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের আদর্শ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত, তাঁর প্রদর্শিত পথই এই মুহূর্তে একান্ত অনুসরণযোগ্য : মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব অবশ্যই এবম্বিধ বিবেচনায় পৌঁছেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিককে যেহেতু উন্নয়নপন্থী হতে হবে, বিধানবাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। পয়লা জুলাই বিধানচন্দ্রের জন্মতিথিতে পার্টি-কর্তৃক আয়োজিত সভা-সমিতিতে তাঁর স্বপ্নকে সফল করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হবে, উৎসাহের জোয়ারে ভেসে গিয়ে পার্টির কর্মীরা-সমর্থকরা মিছিল করে সভায় যোগদান করবেন, মঞ্চে উপস্থিত বক্তাদের মুখ থেকে বিধানচন্দ্রের জীবন ও বাণী-সম্পর্কিত বাক্যস্রোত তন্মাতচিত্তে শ্রবণ করবেন, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের কর্মযজ্ঞ বা বিধানচন্দ্রের স্বপ্ন-কল্পনা-ভাবনার প্রতিস্ব, সভাশেষে আন্তর্জাতিক সংগীত গাইতে-গাইতে সেই স্বপ্নকে সফল করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘরে ফিরবেন।

এখানেই একটু অতীতচারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাঙালি মানসে একটি বিশেষ উপকথা আঠার মতো লেগে আছে, উপকথাখানার ঘোরে এমনকী অনেক শাদামাটা বামপন্থী মানুষজনের

চেতনাও সমাচ্ছন্ন। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ব্রিটিশ পুঁজি আস্তে-আস্তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অপসৃত হলেও সেই শূন্যতা পূরণে নাকি তেমন অসুবিধা হয়নি। বিধানচন্দ্র রায়ের বিচক্ষণতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতাহেতু দিশি পুঁজিপতি সম্প্রদায় কাতারে-কাতারে এই রাজ্যে এসেছেন, বিনিয়োগের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, যার ফলে, পাটশিল্পে সাময়িক সংকট সত্ত্বেও, সাধারণভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি জমানায় শিল্পের হাল বেশ রমরমাই থেকেছে। মুশকিল দেখা দিল গত শতকের ষাটের দশকের উপান্তে যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়কত্বে ঘেরাওয়ের মামদোবাজি, তার পর নকশাল নৈরাজ্য, তা অবসান হতে না হতে রাজ্য প্রশাসনে বামফ্রন্টের বিজয় পতাকা উত্তোলন, এই ত্র্যহস্পর্শের ফেরে শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে দ্রুততার সঙ্গে পুঁজি গুটিয়ে নিলেন, কারখানার পর কারখানা বন্ধ হতে থাকলো, সেই সঙ্গে বেকারির ক্রমবর্ধমান হাহাকার।

চিত্রনাট্যটি গঠনে আটোসাঁটো, কিন্তু আদৌ তথ্যভিত্তিক নয়। রাজ্যে শিল্পসংকটের শুরু পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে, এবং সেই সূচনার সঙ্গে উগ্র বামপন্থার কোনো সম্পর্কই নেই। ঊনবিংশ দশকের প্রান্তকালে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের উদ্যম ও প্রসার ঘটেছিল কয়লা ও আকরিক লোহাকে ভিত্তি করে। বাংলা-বিহার-ওড়িশার মাটিতে উপ্ত কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, গালা, জিপসামের মতো খনিজ পদার্থের সম্ভার। সবচেয়ে আকর্ষণীয় কয়লা ও আকরিক লোহার পাশাপাশি অবস্থান : কয়লার উত্তাপ দিয়ে লোহা গলিয়ে-পিটিয়ে ইস্পাত, ইস্পাত থেকে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের প্রকৌশল, অর্থাৎ ব্যাপক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, যে-শিল্পের উপরে ভর করে অন্যান্য শিল্প, রাসায়নিক শিল্পসুদ্ধ। চটকলগুলির যন্ত্রপাতির উৎপত্তিও তো ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প থেকেই।

কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য ও সান্নিধ্যে যন্ত্রপাতি উৎপাদনে পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক সুবিধা প্রায় পঁচাত্তর বছর আমরা ভোগ করে এসেছি, গড় উৎপাদন ব্যয় সংকোচের প্রতিযোগিতায় আমরা অন্যান্য অঞ্চলকে পিছনে ফেলে দিয়েছি। এই রাজ্যে সংস্থিত বিভিন্ন শিল্প তাই রেলের বরাত পেয়েছে, যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় পূর্ত, সেচ ও প্রতিরক্ষা দফতরের বরাত পেয়েছে, দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে এই-রাজ্যে-উৎপাদিত শিল্প পণ্যাদির অফুরান চাহিদা। সব কিছুর নিহিত কারণ সুলভ কয়লা তথা সুলভ ইস্পাত।

স্বাধীনতা-উত্তর কালেও এমন করেই দিনযাপন ঘটছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে পাল্টা হাওয়া। ১৯৫৫ সালে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী চিন্তামন দেশমুখ পদত্যাগ করলেন, তাঁর জায়গায় এলেন তামিলনাড়ুর শিল্পপতি টি টি কৃষ্ণমাচারি। তিনি মনস্থির করেই এসেছিলেন, সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে এতটুকু সময় নিলেন না। মন্ত্রিত্বে আসীন হওয়ার দু'মাসের মধ্যেই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে দিয়ে তাঁর স্বপ্নের সাধ পূরণ করে নিলেন। ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো, অন্য কোনো পণ্য নয়, শুধু লোহা ও আকরিক লোহার ক্ষেত্রে পরিবহনের মাসুল দেশের সর্বত্র এখন থেকে এক। ফলে, রানীগঞ্জের কয়লার দর আসানসোলে যা, বেঙ্গালুরুতে বা চণ্ডীগড়েও তাই। আকরিক লোহার হাওড়ায় যে-দাম, আমেদাবাদ বা পুণেতেও সেই একই দাম। ইস্পাত তথা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যাদি উৎপাদন ও বিক্রয়ে পূর্বাঞ্চলের, বিশেষ করে বাংলার, যে-সুবিধা ছিল, তা কেড়ে নেওয়া হলো। পূর্বাঞ্চলের বাইরে যাঁরা কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হতে চাইছিলেন, তাঁদের খুশি ধরে না, অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গের আকাশে ঘনীভূত অন্ধকার।

এক ছাপোষা বাঙালি, নাম শচীন চৌধুরী, মুম্বই থেকে কষ্টেসৃষ্ট একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'ইকনমিক উইকলি', প্রকাশ করেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবে তিনি আতঙ্কিত, এই প্রস্তাব গৃহীত হলে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে 'ইকনমিক উইকলি'র পাতায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে গেলেন। একটা সময় অস্থির হয়ে ট্রেনের টিকিট কেটে কলকাতা চলে এলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র এক ব্যারিস্টারকে ধরে বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর ব্যাকুল মিনতি : বিধানবাবু যেন দয়া করে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব রদ না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পক্ষেত্রে আর কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। বিধানবাবু ছাড়া আর কারো পক্ষে রাজ্যের এই দুর্দৈব ঠেকানো সম্ভব নয়, পণ্ডিতজি বিধানচন্দ্রকে খুব মান্য করেন, বিধানবাবুর কথা তিনি ফেলতে পারবে না।

কা কস্য পরিবেদনা। বিধানচন্দ্র রায় শচীন চৌধুরীকে কোনো আমলই দিলেন না। উনি স্পষ্টবক্তা, এবং কম কথার মানুষ। মাসুল সমীকরণ-ফমীকরণ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন, টি টি কৃষ্ণমাচারি পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুর্গাপুরে একটি ইস্পাত কারখানা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিধানবাবুকে তাই সৌজন্য দেখিয়ে কয়লা-লোহার ব্যাপারটা মেনে নিতে হয়। শচীন চৌধুরীকে বিদায় জানিয়ে বিধানচন্দ্র রায়ের অন্তিম উক্তি 'ওরা যা খুশি করুক, আমি আমার এখানে ইন্ডাস্ট্রি করবো আমার মতো করে'।

মাসুল সমীকরণ পঞ্চান্ন সালেই চালু হয়ে গেল, ভৌগোলিক সুবিধার উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা চিরতরে নির্বাপিত হলো। গোদের উপর বিষফোঁড়া, নতুন দিল্লি থেকে জাতীয় জীবনবিমা নিগমের মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের,

সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলির, কাছে নির্দেশ গেল, গড়পড়তা আয়ের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আর বিনিয়োগ না করে তাঁরা যেন অন্যান্য রাজ্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ফেরান। ষাটের দশকের শেষে কুনাট্যটি আরো জমলো। কোনো পুঁজিপতি শিল্পস্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রার্থনা করে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রকের দ্বারস্থ হলেই সংশ্লিষ্ট আমলারা তাঁকে জানিয়ে দিতেন, উপর থেকে নির্দেশ আছে, লক্ষ্মীছাড়া কমিউনিস্টে-ছাওয়া পশ্চিমবঙ্গে কারখানা খুলতে চাইলে লাইসেন্স মিলবে না। (রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা গড়ার অনুমতি দানের কাহিনী তো ইতিহাসে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।)

সুতরাং যে-উপকথা রটিত, বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে কিছুই তা গ্রহণযোগ্য নয়। মাসুল সমীকরণ নীতিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিধানচন্দ্র রায়ই তো এই রাজ্যের শিল্পসম্ভাবনা কেঁচে গণ্ডূষ করেছিলেন, এই নীতি প্রয়োগের পরিণামে এমনকী দুর্গাপুরে কলকারখানার প্রসারও অবরুদ্ধগতি হয়েছে। শিল্পে বিনির্মাণ তথা বিনিয়োগ-দুর্ভিক্ষ বিধানবাবুর প্রশাসনিক একাধিপত্যের ঋতুতেই শুরু। কোন অর্থে তা হলে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের রূপকার? কল্যাণীতে জন্মমুহূর্তেই জরাজীর্ণ একটি উপনগরী গড়েছিলেন বলে? না কি লবণ হ্রদ ঠিকানায় শৌখিন ভদ্রলোকশ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে?

বর্তমান আলোচকের আক্ষেপ অবশ্য ইত্যকার প্রসঙ্গ নিয়ে নয়, তাঁর মনস্তাপের হেতু আলাদা। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব কর্তৃক বিধানপূজা সিদ্ধান্ত, যাঁরা বিশ্বনিন্দুক, সি পি আই (এম)-কে চার বেলা গাল না পাড়লে যাঁদের ভাত হজম হয় না, তাঁদের হাতে একটি ব্রহ্মাস্ত্র তুলে দিল : বুঝলেন না, এটা তো জলের

মতো সোজা; বিধান রায়ের পুলিশ ১৯৪৯ সালে লতিকা সেন-প্রতিভা গাঙ্গুলি-অমিয়া দত্তদের মতো কমিউনিস্ট কর্মী-নেত্রীদের গুলি করে হত্যা করেছিলেন। সেই একই পুলিশ ষাট জন নিরীহ-নিঃসম্বল কৃষককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বন্দুকের নল দিয়ে থেঁতলে মেরে ফেলেছিল। সেই একই কায়দায় সি পি আই (এম)-এর পুলিশ এবার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষক-রমণী ও শিশুদের জবাই করেছে। ওই দল তো এখন থেকে বিধান রায়কে দেবতাজ্ঞানে বন্দনা করবেই।

'পাগলে-কী-না-বলে, ছাগলে-কী-না-খায়' প্রবচন আউড়েও যে এই বীভৎস কুৎসার পরাক্রম থেকে আত্মরক্ষা সহজসাধ্য হবে, তেমন ভরসা হয় না। যেমন ভরসা হয় না, কোনো লাভ আছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে এটা মনে করিয়ে দিয়ে যে, পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির কাছে কেঁদে-ককিয়ে অনুযোগ করেছিলেন, তাঁরা, আমেরিকানরা, গা করছেন না, অথচ এ দিকে কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গ প্রায় দখল করে নিচ্ছে, আর একটু হলে একটা হিন্দুস্থানী ট্রাম কন্ডাক্টর তাঁকে—বিধানচন্দ্র রায়কে—নির্বাচনে প্রায় হারিয়ে দিচ্ছিল।*

* হয়তো কাকতালীয়, এই লেখাটি যেদিন প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো, সেদিনই সায়ংকালে পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন।

বাড়ি, পাড়া, পরিবৃত্ত

পূর্ববঙ্গের মফঃস্বল শহর, ছোটো-ছোটো পাড়ায় বিভক্ত, কিন্তু এ পাড়ার-ও পাড়ার সবাই সবাইকে প্রায় চেনেন। গৃহকর্তারা হয় শিক্ষকতা করেন, নয় ওকালতি, নয় কোনো ছোটো ব্যবসাপাতিতে নিযুক্ত। মধ্যবিত্ত গতানুগতিক জীবনছন্দ। এরই মধ্যে একটি কি দুটো বাড়ির দিকে তাকিয়ে পরস্পরকে ফিসফাস : এটা কমিউনিস্ট বাড়ি। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোর। জনযুদ্ধ নীতি ঘোষণার পর থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কিছু সংশয়, কিছু অভিমান। প্রতি সন্ধ্যায় দরজা-জানালা বন্ধ করে সাইগন রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর বেতার ভাষণ শোনবার জন্য গৃহস্থ মহলে উন্মুখতা। ওই কমিউনিস্ট বাড়িগুলি সম্বন্ধেও প্রচণ্ড আগ্রহ। ওই ওই বাড়ির সবাই আদর্শবাদী, ছেলেমেয়েরা চমৎকার সহবতসম্পন্ন। তাদের পিতামাতা নানা বিষয় নিয়ে গভীর পড়াশোনা করেন, অন্তত সেরকম জনশ্রুতি। সবরকম সমাজসেবাতেও তাঁরা সর্বাগ্রে। বাড়ির কাজের লোকেরা পর্যন্ত তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তা হলেও দোটানা : এঁরা কমিউনিস্ট, একটু উটকো ভাবেন। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে এঁরা কী কারণে যেন দূরে সরে আছেন, লক্ষ্মীছাড়া

ইংরেজদের কার্যত মিত্র হিশেবে কাজ করছেন। সুতরাং এঁদের থেকে ঈষৎ দূরত্ব রাখাই কাম্য।

সমস্ত দ্বিধার বাঁধা ভেঙে গেল দুর্ভিক্ষের অধ্যায়ে। এইসব কমিউনিস্ট বাড়ির গুটিকয়েক ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো, দুর্ভিক্ষজনিত বুভুক্ষু মানুষদের পরিচর্যায়। লঙ্গরখানা খোলা, মুমূর্ষুদের হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া মজুতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন, র‍্যাশন ব্যবস্থা চালু করার দাবিতে মিছিলের উদ্যোগ, শ্রমিক-চাকুরিজীবী প্রমুখ নানা শ্রেণির মানুষের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির লড়াই। দিবারাত্রি পালা করে এই পরিবারগুলির অন্তর্ভুক্ত মানুষজন নিজেদের ব্যস্ত রাখলেন। জনগণ তথা মধ্যবিত্ত মানুষজনের আর বুঝতে বাকি রইলো না যাঁরা কমিউনিস্ট তাঁরা আদর্শে স্থির থাকেন বলেই অনেক সময় আপাত-অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আবার সমাজের দুঃসহতম সংকট মুহূর্তে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ান। কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি হওয়া মানেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করা। এবং এই কমিউনিস্টরা যে-সমাজবিপ্লবের কথা বলেন, তা তো আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধেরই সবচেয়ে বড়ো লক্ষ্য, অন্তত তাই-ই হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব হু হু করে বাড়লো। ওই একটি-দুটি কমিউনিস্ট বাড়ি আর আলাদা হয়ে রইলো না, প্রতিটি মফঃস্বল শহরে, এ পাড়ায় — ও পাড়ায়, প্রতি ঘরে-ঘরে, কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের ভিড়। তারা আদর্শে দীপ্যমান, প্রতিজ্ঞায় প্রোজ্জ্বল। বাঙালি মধ্যবিত্তের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ঝাঁকে-ঝাঁকে ঝুঁকে পড়ার সেই শুরু। পূর্ববঙ্গে-উত্তরবঙ্গে যেমন, রাঢ়বঙ্গেও অনুরূপ বিবর্তন। দীর্ঘ কারাবাসের পর কেউ সিউড়ি বা বাঁকুড়া শহরে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন, কেউ হয়তো আন্দামানে নির্বাসনের দীর্ঘ

বারো-চোদ্দো বছর অতিক্রান্ত করে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁদের ঘিরে ছোটো ছোটো কমিউনিস্ট বৃত্ত। সেই বৃত্তগুলি সংখ্যায় ক্রমশ বাড়ে, এমনকী গোঁড়া কংগ্রেস পরিবারের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ নতুন আদর্শের প্রত্যয়ে পৌঁছে প্রগতির শিবিরে যোগ দেয়। সারা বাংলা জুড়েই এমন করে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মোহন বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে।

তারপর তো ভয়ঙ্কর ক্রান্তিকাল। দেশ ভাগ, লক্ষ-লক্ষ শরণার্থীর সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছুনো। কলকাতার আশেপাশে, এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ ও রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তাঁদের কোনোক্রমে টিকে থাকার সংগ্রাম শুরু। এই সংগ্রামে তাঁরা কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রথম থেকেই সদা সর্বদা পাশে পেয়েছে।

কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছ থেকে তাঁরা এই প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হতে শেখেন, দাবি বা অধিকার যতই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ হোক, একা লড়াই করে সেই অধিকার বা দাবি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, যা প্রয়োজন তা জনতার মুখরিত ঐক্য, যে-ঐক্য ও সংহতির মন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি উচ্চারণ করে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর। জমিদারশ্রেণি ও পুঁজিওয়ালারা শাসকদলে ভিড় করে; তাঁরাই রাজ্যপাট চালাচ্ছেন। তাঁদের শোষণ-পীড়ন, অপসৃত বিদেশি শাসকদের তুলনায় তেমন কিছু কম নয়। প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করতে হবে, গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে কলকাতা মহানগরীতে, মফঃস্বল শহরের পল্লিতে পল্লিতে। কমিউনিস্ট পার্টিতে দীক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানসন্ততি এগিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ গ্রামে গিয়ে কৃষক সভার সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে দিনের পর দিন পড়ে রইলেন। অন্য কেউ-কেউ শিল্পাঞ্চলে গিয়ে কলেকারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের সূচনা করলেন। বর্ধমান সামাজিক সংকট, শাসকশ্রেণির সঙ্গে পুলিশের একাত্মতা, লাঠি-গুলি-নৃশংস হত্যার অব্যাহত অধ্যায়।

যত বেশি অত্যাচার, তত বেশি প্রতিবাদের জোরালো হয়ে ওঠা, প্রতিরোধের শপথ। কৃষক সভা সারা রাজ্যে ক্রমশ মহীরুহের রূপ নিল। শ্রমিক আন্দোলনও, যতই বছরের পর বছর, গড়িয়ে গেল, ততই আরো অনেক বেশি সংহত, আরো অনেক বেশি ব্যাপ্ত।

অতি দ্রুত সমাজের বিভিন্ন স্তরে আরো নানা সংগঠনের সূচনা ও প্রসার। সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন, ছাত্রদের সংগঠন, মহিলাদের সংস্থা; সভা-মিছিল-ধর্মঘট . লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, সহস্র লক্ষ কণ্ঠে এই অঙ্গীকার উচ্চারণ। এক যুগ-দেড় যুগ না পেরোতেই কমিউনিস্ট পার্টি এই রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি।

যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্তদের কথা বলা হলো তাঁরা প্রধানত পদাতিক। তাঁদের মধ্যে হয়তো সামান্য এক শতাংশ কিংবা তারও কম পার্টির প্রত্যক্ষ সদস্য। তবে কমিউনিস্ট পরিবৃত্ত বলে যাঁদের অভিহিত করা হয়, তাঁদের মধ্যে নাম-লেখানো সদস্যের সংখ্যা অতি সামান্য। তবু তাঁরাই কিন্তু সর্ব অর্থে যথার্থ কমিউনিস্ট পরিবার, তাঁরা ছড়িয়ে আছেন সমাজের সর্বস্তরে। পার্টির প্রতি আনুগত্যে তাঁরা অবিচল, হরিষে-বিষাদে আনন্দে-সংকটে তাঁরাই পার্টির ভরসা। এই বৃহৎ পরিমণ্ডলকে পাশে সরিয়ে রেখে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে কল্পনা করা অসম্ভব। যখন পার্টির তরফ থেকে সভা ডাকা হয়, এই এঁরাই ভিড় করে আসেন, মিছিলকে এঁরাই প্রাণবন্ত দীর্ঘায়িত করেন। এঁদের জীবনপণ পরিশ্রমে নির্বাচনের পর নির্বাচনে এই রাজ্যে বামপন্থীরা বিপুল ভোটে পরম নিশ্চিন্তে জয়ী হয়ে আসেন। পার্টির দুঃসময়ে বোঝা যায় কারা কমিউনিস্ট পরিবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত, আর কারা নিছক আড়কাঠির সুবিধা ভোগ করতে ভিড়েছেন।

এখানেই একটি উপলব্ধিগত সমস্যা। যাঁরা পার্টির দুই লক্ষ তিন

লক্ষ নাম লেখানো সদস্য, কমিউনিস্ট আন্দোলনে অবশ্যই তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেবেন, দিতে থাকবেন। কিন্তু পার্টির ভাবনা-চিন্তা নির্ধারণে তথা কর্মপদ্ধতি বিস্তারে, তাঁরা যদি কমিউনিস্ট পরিবৃত্তের কথা ভুলে থাকেন, তা হলে ধন্দের মধ্যে পড়বে গোটা আন্দোলন। যাঁরা নাম লেখানো কমিউনিস্ট নন, অথচ যাঁরা তিলে তিলে দশকের পর দশক ধরে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে লালন করেছেন, পালন করেছেন, পুষ্টি জুগিয়েছেন, আদর্শের অধ্যবসায়ে পরিশুদ্ধ করেছেন, সেই আদর্শকে রূপায়ণে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন, তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা বিস্মৃত হলে গোটা আন্দোলন বেপথুমান অবস্থায় পৌঁছুবে। তা হতে দেওয়া কখনোই কাম্য নয়, তা হতে দেওয়া যায় না।

ছেলেবেলায় আমাদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হতো : সব সময় উপরের দিকে তাকাতে নেই, মাঝে-মাঝে নীচের দিকেও তাকিও। নীচের দিকে যে-ঘটনাবলি ঘটছে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা নীতিশিক্ষামালার অন্যতম আদি সূত্র। সেই একই আশা কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ব্যক্ত করা চলে, অন্তত সেই আশা পোষণ করা উচিত। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সকলের পার্টি, জনগণের পার্টি। নামহীন এই জনতা কিন্তু পরিচয়হীন নয়। এই জনতা কমিউনিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টির আদল দিয়েছে। এই জনতা কী বলছে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করা পার্টির প্রধান কর্তব্য, অন্তত সেরকমই মনে হয়।

এই বৃহৎ কমিউনিস্ট পরিবৃত্ত পার্টিকে ঘিরে আছেন, থাকবেন। তাঁরা কখনো পার্টির প্রতি নেমকহারামি করবেন না, তা অচিন্তনীয়। তাঁদের শুধু সবিনয় মিনতি, যাঁরা আন্দোলনের পরিচালনায় আছেন, তাঁরা মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু নীচের মহলের চিন্তা-উদ্বেগ-আকুতি কান পেতে শুনবেন।

কিছু আর্ত জিজ্ঞাসা

অনামী সাধারণ মানুষ, হাজার-হাজার মানুষ, হাজার ছাপিয়ে লক্ষ, লক্ষ-লক্ষ। এই সাধারণ মানুষজনই পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের প্রাণভোমরা। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই জনসাধারণ, যাঁরা একটু-একটু করে-বিগত অর্ধশতাব্দীর বিস্তার জুড়ে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বরণ করে নিয়েছেন, সাদর সম্ভাষণ করেছেন, এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে। কমিউনিস্ট পার্টি মাতৃসমা, এই পার্টি তাঁদের অভয় দিয়েছে, সাহস জুগিয়েছে, ঘোরতম দুর্যোগের তমিস্রার মধ্যেও আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে; জোট বাঁধুন, ঐক্যবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় শামিল হয়ে অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হোন, সমাজের চেহারাটা পাল্টে যাবে, আপনারাই তা পাল্টে দেবেন; আপনাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই দলের শক্তি, আন্দোলনকে যা দুর্বার করে তোলে।

গত শতকের চল্লিশের দশকের উপান্ত থেকে সেই বিশেষ ইতিহাসের যাত্রা শুরু। মহা-মন্বন্তরের দগদগে ঘা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দেশভাগ, অগণিত শরণার্থী সর্বস্ব খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী। লাগামছাড়া মূল্যমান বৃদ্ধি, গ্রামাঞ্চলে তেভাগার দুঃসাহসিক নানা ইতিবৃত্ত,

অহল্যামায়ের মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত গ্রামের-পর-গ্রামে খেটেও-না-খেতে-পাওয়া রিক্ত-নিঃস্ব ভাগচাষি-খেতমজুর, তাঁদের ঘরের মা-বোন-বউয়েরা। কলকাতা ও শহরতলিতে জীবনযন্ত্রণায় পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণিভুক্তদেরও ক্ষিপ্রগতিতে ব্যূহ গঠন, কারখানার পর কারখানায় শ্রমিককুলের কাজ বাঁচানোর লড়াই, মজুরি ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির লড়াই। ছাত্ররা শিক্ষার সুযোগ প্রসারের জন্য রাস্তায় মিছিলে। শিক্ষকবৃন্দ মর্যাদার সঙ্গে জীবনধারণ করতে চান, তাঁরাও মিছিলে। সরকারি-বেসরকারি কর্মীরাও পিছিয়ে নেই, তাঁদেরও প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশ মুখরতর। আর এঁদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে সদা-পৌঁছুনো উদ্‌ভ্রান্ত বাস্তুহারা সম্প্রদায়।

গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষ সকলের মধ্যেই তখন থেকে এক মস্ত চলেব শুরু। রাজ্যবাসীদের একটি বড়ো অংশ কমিউনিস্ট পার্টিকে আঁকড়ে ধরলেন। তাঁদের প্রতীতিতে কোনো সংশয় ছিল না; কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের শিখিয়েছে, ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সামাজিক অন্যায় প্রতিহত করা সম্ভব : জোট বাঁধো, তৈরি হও, পরিবর্তন আসবেই, রাজনৈতিক পরিবর্তন, তার অনুষঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু এই দিনবদল এমনি-এমনি ঘটবে না, জোট বেঁধে সফল হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধৈর্যের সঙ্গে আর্থিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাগুলি বুঝতে হবে, যে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে নেই, শান্ত-পবিত্র মন নিয়ে, বিনয়ে নুয়ে পড়ে, তাঁকেও বোঝাতে হবে; তা হলেই আমরা করবো জয় নিশ্চয়।

পশ্চিমবঙ্গের ঘরে-ঘরে দশকের পর দশক ধরে একটু-একটু করে ডাক পৌঁছে গেল, জোয়ার এলো কমিউনিস্ট পার্টির জনসমর্থনে। এই অগণ্য জনতার যাঁরা শরিক, কমিউনিস্ট পার্টির আত্মজ-আত্মজা বলে দাবি করতে যাঁরা গর্ববোধ করেন, তাঁরা দলের সদস্য নন, এমনকী

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় কোনো গণসংগঠনের সঙ্গেও তাঁদের আদৌ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তা হলেও তাঁরাই কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির আসল খুঁটি, তাঁদের নিবিড় আনুগত্য হেতুই কমিউনিস্ট পার্টি (তার পোশাকি নাম যখন যা-ই হোক না কেন) পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ক্ষমতায় সমারূঢ়। এই বিপুল বিশাল কমিউনিস্ট পরিবৃত্তকে উহ্য রেখে, নিছক সংগঠন-প্রতিভার ওপর নির্ভর করে এই রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে একা এগোনো সম্ভব নয়। স্বয়ং মার্ক্স গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে যে-কোনো সমাজে এ ধরনের কমিউনিস্ট পরিবৃত্তের ঐতিহাসিক গুরুত্বের উল্লেখ করেছেন। এই বিশেষ পরিবৃত্তকে উপেক্ষা করার অর্থ নিজেদের দিগ্‌নির্দেশিকা থেকে ছিটকে গিয়ে অন্ধগলিতে ঘুরপাক খাওয়া। ১৮৫৭ সালে মহাকরণে প্রবেশের মুহূর্তে বামফ্রন্টের প্রধান কাণ্ডারী যে-ঘোষণা করেছিলেন, ওই লাল দালানে বসে নয়, জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে, জনগণের নির্দেশ মেনে ফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি প্রশাসনিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি নিরূপিত হবে, তাঁর ইঙ্গিত স্পষ্টতই ছিল এই কমিউনিস্ট পরিবৃত্তের দিকে : নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের সদুপদেশ-সুপরামর্শ ছাড়া বামফ্রন্ট সরকার এক পা-ও এগোবে না।

গত কয়েক মাসের ঘটনাবলি ঐতিহ্য-গর্বে গরীয়ান এই কমিউনিস্ট পরিবৃত্তকেই সবচেয়ে বেশি বিপদাপন্ন করেছে। পরিবৃত্তের মানুষজন তাঁদের স্বপ্নের সঙ্গে ক্রূর বাস্তবকে মেলাতে পারছেন না। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়-জ্যোতি বসু-হরেকৃষ্ণ কোঙারদের উদাত্ত ভাষণ যাঁরা ময়দানের ঘাসে খবরকাগজ বিছিয়ে তন্ময়বিহ্বলতার সঙ্গে শুনতেন, তাঁরা আপাতত বিচলিত, ব্যাকুল, হতভম্ব। সংবিধানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও সমাজের দরিদ্রতরদের জন্য যে-সুখ-সুবিধা-স্বস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া

হয়েছিল, প্রশাসনিক, আর্থিক তথা আইনগত নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও একদা যে-সুদৃঢ় অঙ্গীকার — গোটা ভারতকে একটি বিকল্প ছকের বিন্যাস পরিবেশন করে দেখানো হবে, যা দেখে মুগ্ধ হয়ে অন্যান্য রাজ্যের জনগণ পিল-পিল করে রক্ত-পতাকার ছত্রছায়ায় উদ্দাম উৎসাহে জড়ো হবে — তা কেন প্রত্যাহৃত হলো, কবে থেকে প্রত্যাহৃত হলো, তা নেতৃবৃন্দ তাঁদের দলের আত্মজ-আত্মজাদের আদৌ জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। কেন করলেন না, সেই প্রশ্ন কমিউনিস্ট পরিবৃত্তকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। তাঁরা নিজেরা বুঝতে পারছেন না বলে অপরকে বোঝাতে পারছেন না। হাজারো জিজ্ঞাসায় তাঁদের অন্তঃস্থল ক্ষত-বিক্ষত, অথচ এই জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর জোগাবার দায়িত্ব যেন এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাবটা এমন, এ-সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রশ্নাদির ভিড়ে সময় নষ্ট করা দলীয় নেতৃত্বের অকর্তব্য।

অথচ, গেঁয়ো, মূর্খ চাষি সত্যিই বুঝতে পারছেন না, যে-জমি পার্টির দৃপ্ত নেতৃত্বে তাঁরা দখল করেছিলেন, ভূমিসংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার মধ্যবর্তিতায় ভাগচাষিরা যে-জমিতে ন্যায্য অধিকার পেয়েছিলেন, যে-জমিতে ফলানো ফসলে তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটছে, তা কেন সরকার ব্রিটিশ আমলের এক স্বেচ্ছাচারী আইন প্রয়োগ করে দখল নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবেন। কৃষিতে উৎপাদন-উপার্জন বাড়াবার সমস্ত সম্ভাবনা কি সত্যি-সত্যি লুপ্ত? সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন আরো বাড়ানোর কেন কোনো রকম চেষ্টাই করা হলো না? কর্ষণের ক্ষেত্রে, উপকরণ ক্রয় ও কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পর্যন্ত সমবায়ী প্রয়াসকে ন্যূনতম উৎসাহদান থেকে কেন বিরত থাকা হলো? অন্তত কেরল রাজ্যের ধাঁচে আমাদের এখানেও কি যৌথ-কর্ষণ নিয়ে একটু-আধটু পরীক্ষা চালানো সম্ভব ছিল না? পঁচিশ বছর আগে পূর্ব ভারতে সেচব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর

লক্ষ্যে বিবিধ প্রস্তাব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিযুক্ত এক কমিটি পেশ করেছিল; কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদনের হার আরো বহু গুণ বৃদ্ধি পেত। সেগুলি মেনে নেওয়ার জন্য কোনো উৎসাহই বামফ্রন্ট সরকার কেন দেখালেন না, সেই রহস্য অনাবৃত করার দায়িত্ব কার?

সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, পুঁজিপতিদেব শরণাপন্ন হওয়াই কি শিল্পায়নের একমাত্র পথ? যদি তর্কের খাতিরে ক্ষণিক মুহূর্তের জন্য মেনেও নেওয়া যায় (কৃষককুলের একটি বড়ো অংশ যদিও তা মানতে স্পষ্টতই রাজি নন), তা হলেও জিজ্ঞাসা অব্যাহত থাকবে : রাজ্য সরকার স্বয়ং কেন শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন না? যে-দল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পাদি বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রে লড়াই অব্যাহত রেখেছে, সেই দলের প্রতি সর্ব-অর্থে-অনুগত রাজ্য সরকার কেন নিজের উদ্যোগে শিল্পস্থাপনে এগিয়ে আসবেন না? এই রাজ্যে প্রতিভার অভাব নেই, আধুনিকতম যথোপযুক্ত প্রযুক্তি বাজারে কেনা যায়, বিনিয়োগের জন্য অর্থসংগ্রহও তেমন-কোনো দুরূহ প্রস্তাব নয়। কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার উপর কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দখলদারি, যে-টাকা ফাটকাবাজারে খাটানো হচ্ছে, যে-টাকা ব্যবহার করেই বেসরকারি মালিকরা তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছেন। কেন্দ্রে যে-সরকারের অস্তিত্ব বামপন্থী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল, চাপ সৃষ্টি করে তার কাছ থেকে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গের জন্য পনেরো-কুড়ি হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। বাংলাদেশে গরু পাচারকারী ছাপোষাদের নিবৃত্ত করতে যদি কেন্দ্রের কাছে অকুণ্ঠচিত্তে বাড়তি ফৌজের জন্য কাকুতি-মিনতি করা যায়, শিল্প গড়বার জন্য নতুন দিল্লির কাছে অর্থের দাবি জানাতে তবে এত কুণ্ঠা কেন? দলীয় নেতাদের কাছে কমিউনিস্ট পরিবৃত্ত এমনধারা প্রশ্ন করে

যাবেনই। 'বিধানসভায় দুশো পঁয়ত্রিশটি আসনে জিতেছি, অতএব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই', এমন যুক্তি সর্বনেশে।

অতএব, সব কিছু ছাড়িয়ে, সংস্কৃতির প্রশ্ন, মানবিকতার প্রশ্ন। মুজাফ্ফর আহমদ-গণেশ ঘোষ-বিনয় চৌধুরী-মুহম্মদ আবদুল্লহ্ রসুলদের মতো নেতারা বহু বিভঙ্গে বারবার যে-কথা বলে গিয়েছেন, নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে যা সতত প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসবান ছিলেন, সেই কথাটির সারাৎসার এ রকম : কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের পরিশীলিত হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে, অতি প্রতিকূল অবস্থাতেও সহনশীল থাকতে হবে। এখানেই সমস্যা। গত তিরিশ বছর ধরে বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতাসীন, ফলে স্বভাবতই অনেক সুবিধাবাদী তথা বিদূষক প্রধান শাসক দলের সমীপবর্তী হয়েছেন। অবস্থার মোড় ঘুরলে, কিংবা মোড় ঘোরার লক্ষণ দেখা দিলে, তাঁদের ফের হৃদয় পরিবর্তন ঘটবে, তাঁরা অদৃশ্য হবেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পরিবৃত্তে যাঁরা অবস্থান করছেন, তাঁরা হরিষে-বিষাদে দলের সঙ্গে আছেন, দলের চরমতম সঙ্কটের মুহূর্তেও তাঁরা দলের সঙ্গে থাকবেন। তাঁদের প্রতি দল বিমুখ হলেও দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্যে এতটুকু চিড় ধরবে না। দল কোনো ভুল করলে তার জন্য কৈফিয়ত-খেসারত তাঁদেরই দিতে হয়, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে তাঁদেরই জবাবদিহি করতে হয়। দল ও দলের সরকার পরিচালনায় যে অবিনয়-অসহিষ্ণুতা প্রবেশ করেছে, এমনকী তা স্বীকারের মধ্যেও কেন এত উদ্ধতি? ভুলের সমস্ত দায় নেতৃপক্ষের নিজের মাথায়-পেতে নেওয়ার কবুলতি যে-দাম্ভিক অনুশোচনাহীন ভঙ্গিতে উচ্চারিত হচ্ছে, তা বাঙালি কবির সেই পঙ্‌ক্তিটিকেই শুধু মনে করিয়ে দেয় : শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়, তাকে ডরাই।

প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্রের পরিকাঠামো মেনে না নিয়ে

আপাতত উপায় নেই। যুক্তি দেখানো হচ্ছে, উপায় নেই বলেই নাকি হাজার কোটি টাকার উপঢৌকন প্রদান করে জনৈক শিল্পগোষ্ঠীকে এই রাজ্যে গাড়ি তৈরির কারখানা তৈরি করার জন্য রাজি করানো হয়েছে, নইলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও দরিদ্রতর রাজ্য উত্তরখণ্ডে চলে যেতেন। মুশকিল হচ্ছে, প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র এমন শাঁখ, যা আসতেও কাটে, যেতেও কাটে। শাসক দলের বিচ্যুতির পুরো সুযোগ প্রতিপক্ষরা নেবেন, যেমন তাঁরা আপাতত নিচ্ছেন সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে। রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে যাঁরা এই মুহূর্তে মস্ত সরব, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধোয়া তুলসীপাতা নন, কিন্তু এই বাজারে ক'জন আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন? চাপটা তাই গিয়ে পড়ে শাসক দলের পরিবৃত্তে থেকে যাঁরা দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাঁদের উপর। নেতাদের অনমনীয়তা, ভাষাব্যবহারে অপরিচ্ছন্নতা, সেই সঙ্গে 'কাউকে পরোয়া করি না' মানসিকতার দায়ভার তাঁদেরই বহন করতে হয়।

দল থেকে নিজেদের কখনো বিশ্লিষ্ট করবেন না তাঁরা, শত্রু শিবিরের হাতছানি তাঁরা অবিচলিতচিত্তে উপেক্ষা করে যাবেন, তাঁরা শুধু এটুকু আশা পোষণ করবেন, দল ও দলের সরকার কতকগুলি অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাবেন না। আমরা তো গত পনেরো বছরের ইতিহাস জানি, জাতীয় উৎপাদন হু-হু বৃদ্ধি পেয়েছে, পুঁজিপতিরা মুনাফার মহাপর্বত রচনা করেছেন, কিন্তু কর্মসংস্থান আদৌ বাড়েনি। যতটুকু বেড়েছে তা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বস্তুত হ্রাস পেয়েছে। কীসের ভিত্তিতে দলীয় নেতৃবৃন্দ তা হলে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিলে বেকার সমস্যার নিরসন ঘটবে? আজ থেকে প্রায় আট দশক আগে সোভিয়েত রাষ্ট্রে শিল্পায়নের স্বার্থে বিস্তীর্ণ বর্গক্ষেত্র থেকে

কৃষকদের অবশ্যই উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা উৎখাত হয়েছিলেন তাঁরা বৃহৎ ভূস্বামী ও ধনী কুলাক-কুল; তাঁদের জমি কেড়ে নিয়ে বৃহৎ-বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত-খামারে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক শ্রেণির জন্য খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এখন পশ্চিমবঙ্গে যে-ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তার লক্ষ্য ছোটো চাষি, ভাগচাষি ও খেতমজুরদের অপসারিত করে তাঁদের জমি বাঘা-বাঘা শিল্পপতিদের অর্পণ করা।

এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি কেউ অসম্মত হন, প্রশ্নগুলি কিন্তু তা হলেও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে না, ভয় হয়, একদিন হঠাৎ তারা আগুন হয়ে জ্বলবে।

নিয়তি কেন বাধ্যতে

আশি বছরের জীবনে অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি; অনেক বিচিত্র মানুষের সঙ্গে বিনিময়-প্রতিবিনিময়। জনৈকা মহিলার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে তাঁকে দিল্লিতে সামান্য চিনতাম। সুন্দরী, তখনো যৌবনে ঢল নামেনি, উপর মহলের ঝলমলে সান্ধ্য-পার্টিতে ফুরফুরে পাখির মতো ঘুরে বেড়াতেন। আমার সঙ্গে অতি মামুলি পরিচয়; ওঁর যে-সামাজিক স্তরে বিচরণ, তা আমার পৃথিবীর বহু দূরবর্তী।

বেশ কয়েক বছর বাদে, বিদেশের এক শহরে অধিষ্ঠান করছি, একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই মহিলা আমাদের দুয়ারে উপস্থিত। তিনি হোটেলে জায়গা খুঁজে পাননি, এক রাত্রির জন্য আমাদের ফ্ল্যাটে থাকার অনুমতি ভিক্ষা করছেন। প্রবাসে বিপন্না মহিলা, আপত্তি করবার কিছু ছিল না। কিন্তু, সহজেই বোঝা গেল, মহিলা ইতিমধ্যেই প্রচুর মদ্য সেবন করে এসেছেন, হয়তো সেই সঙ্গে কোনো অভিনব নেশার ওষুধও। অথচ কথাবার্তায় নম্রতার অভাব নেই, স্বচ্ছতারও অভাব নেই। নৈশাহারের পর একটি আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে কী

প্রসঙ্গক্রমে যেন হঠাৎ নিজের জীবনের উপাখ্যান বলতে শুরু করলেন।

মহিলার আদি নিবাস তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুচিরপল্লী জেলার একটি গ্রামে। তাঁর পিতা গোঁড়া আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ, সুবিখ্যাত পণ্ডিত। সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ধ্রুপদী সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান সর্ববিদিত। বেদ-উপনিষদ তিনি ছেঁকে পড়েছেন। অথচ সেই সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি। নিকষ রক্ষণশীল, বর্ণভেদ সম্পর্কে অত্যগ্র সচেতনতা, সংস্কার তাঁর চেতনায়-ধমনীতে। মহিলা তাঁর একমাত্র সন্তান। কন্যা সদ্য পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করেছেন, রূপ উপচে পড়ছে। এমন মুহূর্তে তাঁর পিতা তাঁকে এক দ্বিপ্রহরে ডেকে পাঠালেন। শাস্ত্রজ্ঞ-মহাপণ্ডিত, মেয়েকে পাত্রস্থ করতে মনস্থ করেছেন। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরিরত একটি সমবর্ণের আয়েঙ্গার পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। বিয়ের তিথি-তারিখ ইতিমধ্যেই পাকা হয়ে গেছে, পিতা মেয়েকে শুধু জানাচ্ছেন মাত্র। কিন্তু কিছু চমকের বাকি ছিল। পিতা কন্যার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট ভাষায় ভয়ঙ্কর সংবাদ পরিবেশন করলেন। তিনি উভয় পক্ষের বিশদ ঠিকুজি-কুলজি-শাস্ত্র-পঞ্জিকা-পুঁথি ঘেঁটে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন, তা ছাড়া আলাদাভাবে খোঁজ করেও জানতে পেরেছেন, যে-পাত্রের কাছে তিনি কন্যাকে সম্প্রদান করতে মনস্থ করেছেন, সে অসাধু, দুশ্চরিত্র, লম্পট। তার ভবিষ্যত-ও ঘোর অন্ধকার, সে ক্রমশ রসাতলের আরো গভীরে নামবে। শুধু তা-ই নয়, সে তার স্ত্রীকেও, অর্থাৎ এই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যাকে, নরকবর্তিনী করবে। সব কিছু জেনে-বুঝেও এই মহান শাস্ত্রজ্ঞ-পুরুষ কন্যাকে বললেন, কোনো উপায় নেই; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার পত্নী; তোমার মাতৃদেবী, তাঁরও বুক ফেটে

যাচ্ছে, তোমাকে আমরা দু-টুকরো করে ভারত মহাসাগরে নিক্ষেপ করলেও হয়তো এর চেয়ে উত্তম হত, কিন্তু নিয়তির বিধান খণ্ডানো সম্ভব নয়; আমি শাস্ত্র বিচার করে এবং জ্যোতিষে নিমগ্ন হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, ঈশ্বরের বিধান এটা, এই পাপাচারী ছেলেটিকেই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, এটা তোমার ললাট লিখন, আমাদেরও ললাট লিখন, সুতরাং তুমি তোমার মনকে তৈরি করো।

বিয়ে সমাপ্ত হলো। ছেলেটি মহিলাকে দিল্লি নিয়ে এলো। এক-দু'দিনের মধ্যে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলো। কুটিল, উচ্ছৃঙ্খলতার চূড়ান্ত, মদ-জুয়া তার দৈনন্দিনতা। বিভিন্ন নেশার চাহিদা মেটাতে দু-হাতে টাকা ওড়ায়, স্ত্রীর গয়না-গাটি কয়েক মাসেই শেষ হয়ে এলো। অতঃপর নিজের স্ত্রীকে সে দেহ-ব্যবসায় নামতে বাধ্য করলো, অন্যথা টাকার সংস্থান করা সম্ভব নয়, অচিরেই তহবিল তছরূপ করে স্বামীপ্রবর চাকরি খোয়ালো এবং সেই সঙ্গে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দশ বছরের জন্য তার কারাবাস।

এই সব দুঃসহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া মহিলাটি ততদিনে ভিতরে-ভিতরে একটা অদ্ভুত শক্তি অর্জন করেছেন। আদালতে গিয়ে তিনি বিবাহবিচ্ছিন্না হলেন, তবে সেখানেই ক্ষান্ত দিলেন না। তাঁর অন্তঃস্থলে সঞ্চারিত হলো এক আশ্চর্য-বিচিত্র প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা। তিনি ইচ্ছে করলেই তিরুচিরপল্লীতে পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু না, তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন · পিতার উপর প্রতিশোধ নেবেন, নিজেকে উচ্ছন্ন থেকে অধিকতর ক্লেদাক্ত উচ্ছন্নতায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন। তিনি মাদকাসক্ত হলেন, বহুগামিনী হয়ে উপার্জনের রাস্তা খুঁজে বের করলেন। তারপর তাঁর জীবন ক্রমে-ক্রমে আরো নরকমুখি হয়েছে। যে-পিতা তাঁকে সর্বনাশের সর্পসংকুল কুণ্ডে নিক্ষেপ করাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ

করেননি, তাঁকে জব্দ করতেই যেন মহিলার এই কদর্য জীবনযাপনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

আমি এবং আমার স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে এই কাহিনী শুনছিলাম। একটা সময়ে, তখন মধ্যরাত্রি অতীত, মহিলা অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কান্নার মধ্যেই খানিক বাদে তাঁর নিদ্রায় ঢলে পড়া। পরদিন একটু বেলা হতেই তিনি মৃদু হেসে বিদায় নিলেন।

যে-কথাটি সেদিন তাঁকে বলা হয়নি, পিতার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনি কিন্তু পিতার জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকেই নির্ভুল বলে প্রমাণ করলেন। এ যেন কোনো গ্রিক ট্র্যাজেডির—যে-কোনো গ্রিক ট্র্যাজেডির — পুনরুচ্চারণ। চরিত্রগুলি প্রত্যেকে জানে তারা যদি নিজেদের সংবৃত না করে, তা হলে সর্বনাশ এড়ানো অসম্ভব। কিন্তু নিয়তির হাত তারা কেউই এড়াতে পারে না, কোনো চরিত্রই প্রকৃতির বিরুদ্ধে, তথাকথিত ভাগ্যলিখনের বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়ায় না, অসহায় আত্মসমর্পণ করে, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে বসে সর্বনাশের পরম অভিব্যক্তি নিরীক্ষণান্তে প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

পশ্চিম বাংলার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমার মনে তেমনই দুরু-দুরু আশঙ্কার ঘনসমাবেশ। সবাই যেন বুঝতে পারছি, একটা খাদের ধারে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, সমুৎপন্ন সর্বনাশের প্রান্তরেখায়। এই অবস্থায় শত্রুদের দুষ্কর্ম এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত নিয়ে বিলাপ করা নিষ্ফল, তাদের হাতে সুযোগ তুলে দিলে তা তারা ব্যবহার করবেই, সেটাই তাদের বৃত্তি। বরঞ্চ আমাদের মনঃসংযোগ করা প্রয়োজন কোন নীতির নির্ভরে, কোন বিকল্প পন্থা অনুসরণে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী ঐতিহ্যকে এখনো বিপদমুক্ত করা যায়। এখানেই সংকট। মনে-মনে আমরা অনেকেই বিকল্প প্রস্থানের উপায়গুলির ছক কেটে যাচ্ছি, অথচ কেউই স্পষ্ট উচ্চারণে তা ব্যক্ত

করার সাহস কিংবা সংকল্প সংগ্রহ করতে পারছি না। আমরা এ-ও জানি, বর্তমান অবস্থা প্রলম্বিত হলে পশ্চিম বাংলার অস্থিতি বহুগুণ বাড়বে, আমাদের যুগ-যুগ ধরে সযত্নে বুনন করা সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন তা হলে ধুলোয় বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। অথচ আমরা সবাই কেমন যেন এক নির্বাক স্তম্ভিত উপত্যকায় উপনীত, এমনকী পরস্পরের কানে ফিস ফিস করে অভয়বাণী শোনাবার উদ্যমটুকু পর্যন্ত কী করে যেন বিসর্জন দিয়েছি।

আমরা তো ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত অনুবর্তনের অনুশীলনে নিজেদের একদা দীক্ষিত করেছিলাম, তবে কেন নিয়তির কাছে এমন অসহায় আত্মসমর্পণ করবো?

পঞ্চাশ বছর আগেকার এক রোমাঞ্চ কাহিনী

সময় তার নিয়মে কাজ করে চলে, বছরগুলি নিঃশব্দে, বা ঘোর নিনাদের সঙ্গে, অতিক্রান্ত। আমরা টেরও পাই না, আমাদের খেয়ালেও থাকে না। এবং সেজন্যই আরো বিশেষ করে নিজেকে নামতার মতো করে বারবার শোনাতে বিশেষ আবেগ বোধ করি, আমরা দু'হাজার সাত সালে উত্তীর্ণ। কেউ-কেউ বলবেন, এখন থেকে ঠিক দেড়শো বছর আগে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু, সেই অবিস্মরণীয় ১৮৫৭ সাল। আমি কিন্তু পাশাপাশি, অন্য একটি বছরের কথাও অবিশ্রান্ত ভাববো; আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সংঘটিত সেই সফলতার কথা, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে অন্য যে-একটি যুদ্ধের সফলতা ঘটেছিল যে-বছর, সেই ১৯৫৭ সালের কথা।

কী ঘটেছিল সেই বছরটিতে? অনেক খুঁটিনাটি এখনো স্পষ্ট মনে আনতে পারি। নতুন দিল্লিতে অর্থনীতি-সংক্রান্ত একটি গবেষণা সংস্থায় আমি কর্মরত। দপ্তরের প্রহরগুলি, এবং সেই সঙ্গে ঘুমোবার সময়টুকু, বাদ দিয়ে বাকি সমস্তক্ষণ কাটে ফিরোজ শাহ রোডে কমরেড ভূপেশ গুপ্তর বাড়ির কমিউনে। আমাদের স্বপ্ন দেখার জায়গা সেটা,

গল্পগাছার জায়গা, গান শোনবার জায়গা, রাজনীতি দেশে-বিদেশে কোথায় কীভাবে মোড় নিচ্ছে, তা জানবার জায়গা; আদর্শের জন্য কী করে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়, তা-ও শেখবার জায়গা। ভূপেশবাবুর বাড়ির সেই কমিউনে যাঁরা তখন স্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনে আনতে পারি দ্বিজেন্দ্র নন্দীকে, যিনি বহু বছর ভারত-চিন মৈত্রী সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, কয়েক বছর বাদে জাতীর মহাফেজখানা থেকে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের চিঠিপত্রের কাহিনী প্রকাশ করার সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে যায়। ওখানে আরো থাকতেন হুগলির তুষার চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন সাংসদ। আর থাকত আমার বন্ধু, কেম্ব্রিজ-ফেরত অর্থনীতিবিদ্, ওই মুহূর্তে সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী, অজিত দাশগুপ্ত। ভূপেশবাবু, দ্বিজেন নন্দী, তুষারদা, অজিত, কেউই আর বেঁচে নেই। কিন্তু আমার স্মৃতিতে ১৯৫৭ সালের সঙ্গে তাঁদের সান্নিধ্যের কাহিনী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো।

হয়তো ওই ডেরা থেকে বেরিয়ে আমরা কয়েকজন মার্চের এক অতি-দ্রুত-মিলিয়ে-যেতে-থাকা সন্ধ্যায় জনপথ যেখানে কনৌট প্লেসে গিয়ে মিশেছে, রিগাল সিনেমার গা ঘেঁষে, সেখানে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের সত্তা জুড়ে উত্তেজনার টানা-পোড়েন। জনপথের ওই প্রান্তে সিনেমা হলটির পাশে একটি ছোট্ট বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান। সন্ধ্যা ছ'টার খবর আকাশবাণীতে, উত্তেজনার-অনিশ্চয়তার অবসান। কেরল রাজ্যে কানানোর জেলার তেলিচেরি কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট পার্টি-সমর্থিত, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীকে নির্বাচনে প্রার্থী কৃষ্ণ আয়ার জয়ী হয়েছেন। যার অর্থ কেরল বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আমরা ছ-সাত জন এক সঙ্গে দাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, পরক্ষণেই সার বেঁধে জনপথের মধ্যিখানে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে ট্রাফিক রুখে দিলাম। নতুন

দিল্লিকে সচকিত করে দেওয়ার লক্ষ্যে সেটাই, সেই মুহূর্তে আমাদের কাছে সর্বোত্তম পন্থা বলে বিবেচিত হলো : নির্বিকার মানুষগুলি জানুক গোটা দেশে যুগ-বিপ্লবের সূচনা ঘটে গেছে।

দুদিন ধরেই সকাল-দুপুর-বিকেল-রাত্রি জুড়ে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ফল বেরোচ্ছিল। কেরল থেকে যে-সব খবর আসছিল সেগুলি আশাতীত চমকপ্রদ; আমাদের গর্বকে, আস্থাকে, স্বপ্ন দেখার সাহসকে প্রতি মুহূর্তে আকাশের অসীমে পৌঁছে দিচ্ছিল। দুদিন ধরে নির্বাচনের ফল বেরোচ্ছে, কিন্তু কেরলের একটি আসনের ফল ঘোষণা তখনো বাকি, সেই ফলের উপর নির্ভর করছে পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি। সর্বত্রই দেশবাসীর মনে প্রশ্ন, সত্যিই কি কমিউনিস্ট পার্টি একটি রাজ্যে নির্বাচনে জিততে পারবে, জিতে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করাতে পারবে, স্বর্গের পারিজাতভূমি এই ছন্নছাড়া দেশেও মাটিতে টেনে নামানো যায়, বড়োলোকদের দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটিয়ে, দেশের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে হলেও, গরিবদের জমানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়? কৃষ্ণ আয়ার সক্রিয় রাজনীতিতে খুব বেশি সময় থাকেননি, কিছুদিন বাদে নিজেকে আইন ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ নিযুক্ত করেন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিশেবে পরে তাঁর অবসর গ্রহণ। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে সেই সন্ধ্যায় তাঁর নাম ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর নির্বাচনের ফল ঘোষণা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিন্যাসে গুণগত একটি অন্য মাত্রা পাইয়ে দিল। আমরা কনৌট প্লেস-জনপথের সংযোগস্থলে ট্রাফিক রুখে দিয়ে আমাদের জয়-উল্লাসের মধ্য দিয়ে সেই মস্ত পরিবর্তনের নির্ঘোষ আকাশচুম্বী করেছিলাম।

দিন দশেক কেটে না যেতেই আরো চমক। পার্টি থেকে নির্দেশ, কমিউনিস্ট পার্টি কেরলে সরকার গঠন করেছে, জাতির ইতিহাসে

প্রথম কমিউনিস্ট সরকার। সেই সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করার উদ্যোগ শুরু হচ্ছে, আমাকে অবিলম্বে ত্রিবান্দ্রম গিয়ে সেই কাজে সাহায্য করতে হবে। গর্বে-গৌরবে আমার মাটিতে পা পড়ে না। অথচ কাউকে বলবার উপায় নেই, পার্টির কড়া নির্দেশ · ইতিমধ্যেই সোরগোল-কানাকানি-রটনা : কেরলে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের নতুন অধ্যায় নাকি শুরু হবে; কেরলকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্টরা নানা চক্রান্ত ফাঁদবে। বাইরে থেকে কেউ সাহায্য বা পরামর্শ দিতে গেছেন, তা জানাজানি হলে অবাঞ্ছিত চেঁচামেচির আশঙ্কা, সুতরাং আমি যে যাচ্ছি, তা গোপন রাখতে হবে, কাউকে বলা চলবে না।

যে-সংস্থায় কাজ করি, সেখানে জানালাম, কলকাতায় এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া গুরুতর অসুস্থ, দিন দশেকের জন্য আমার না গেলেই নয়। পার্টির দপ্তর থেকে বিমানের টিকিট কেটে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হলো। দিল্লি থেকে মাদ্রাজ—এখনকার চেন্নাই—হয়ে ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছুতে হবে। তখন কিছু দিন ধরে বিমান পরিবহনে একটি পরীক্ষা চলছিল; প্রতি সন্ধ্যায় দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে ডাক ও যাত্রী-বোঝাই একটি করে বিমান নাগপুর অভিমুখে রওনা দিত। মধ্যরাত্রিতে নাগপুরে চারটে বিমানের অবতরণ, চার শহরের ডাকগুলি ভাগাভাগি করে প্রতিটি বিমানে তোলা, সেই সঙ্গে যাত্রীদেরও তোলা : যাত্রী এবং ডাক নিয়ে তারপর ভোর-ভোর সময়ে বিমানগুলির দিল্লি, মুম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় ফিরে যাওয়া।

এমনই বিমানে আমার দিল্লি থেকে নাগপুর হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছুবার কথা, তারপর সকালে অন্য বিমানে মাদ্রাজ থেকে মাদুরা ও ব্যাঙ্গালোর ছুঁয়ে ত্রিবান্দ্রম। মনে-মনে উত্তেজনায় কাঁপছি, সেই সঙ্গে খানিকটা আতঙ্ক, গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারবো তো? দিল্লির বিমানবন্দর

পালামে পৌঁছেই প্রথম বিপদ সঙ্কেত। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, নাম তিরুভেঙ্কটাচারি, ডাকসাইটে আইনজীবী, সেই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর অ্যাডভোকেট জেনারেল, তাঁর পিতৃদেব যোজনা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান, ভি. টি. কৃষ্ণমাচারি, তিনি নাগপুর হয়ে মাদ্রাজ ফিরছেন। বিমানবন্দরে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায় সম্ভাষণ-প্রতিসম্ভাষণ। তাঁর কাছে বাধ্য হয়ে আমার অনৃতভাষণ : কয়েকদিনের জন্য কলকাতা যেতে হচ্ছে। দিল্লি থেকে বিমান আকাশে উড়লো, নাগপুর পর্যন্ত ভয় নেই, ওঁর সঙ্গে গল্প করতে-করতে যাওয়া; কিন্তু আলাপচারিতায় আমাকে অতি সতর্ক থাকতে হচ্ছে, কারণ তাঁর ভাই রামাস্বামী আমাদের গবেষণা সংস্থার সচিব। দিল্লিতে ছোটো ভাইকে বলে এসেছি কলকাতা যাচ্ছি, আর অগ্রজ যদি দেখেন, আমি মাদ্রাজে অবতরণ করছি এবং তা যদি কথাচ্ছলে অনুজকে পরে কোনোদিন জানিয়ে দেন, তা হলে চিত্তির। সুতরাং নাগপুরে নেমেই তিরুভেঙ্কটাচারির কাছ থেকে আমার ভৌগোলিক দূরত্ব বাড়ালাম। মাদ্রাজের বিমান ছাড়বার ঘোষণা উচ্চারিত হলো, একে-একে যাত্রীরা বিমানে উঠছেন, তিরুভেঙ্কটাচারিও উঠে গেলেন, আমি একেবারে সকলের শেষে বিমানে ঢুকেই সামনে যে-আসন পেলাম, তাতে মুখ নীচে নামিয়ে আড়ষ্ট বসে রইলাম। বিমান যাত্রার সেই প্রহরগুলি অবর্ণনীয় অস্বস্তিতে ছাওয়া; চার সারি ছাড়িয়ে সম্মুখবর্তী এক আসনে তিরুভেঙ্কটাচারি উপবিষ্ট, তিনি যখন মাথা তুলছেন, আমি মাথা নীচে নামিয়ে আনছি; যখন দেখছি তিনি মাথা নামাচ্ছেন, আমি মাথা তুলছি।

এমনি করে মাদ্রাজ পৌঁছুনো, সেখান থেকে ঘণ্টা দুই বাদে মাদুরাই-ব্যাঙ্গালোর হয়ে ত্রিবান্দ্রমগামী বিমান ধরা। কিন্তু ফাঁড়া পুরোটা তখনো কাটেনি। ব্যাঙ্গালোর বিমানবন্দরে হঠাৎ আর একজন চেনা

লোকের মুখোমুখি। তিনি আর কেউ নন, দিল্লিতে আমি যে-গবেষণাকেন্দ্রে কর্মরত, তার সর্বাধ্যক্ষের জামাতা। আমাকে দেখে তাঁর সমাদর-মাখা একগাল হাসি, প্রত্যুত্তরে আমার কাষ্ঠহাসি। তাঁকে বলতেই হলো, হ্যাঁ, ত্রিবান্দ্রম যাচ্ছি, এক আত্মীয়ার কাছে বেড়াতে। মনে-মনে প্রার্থনা করলাম, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত তিনি যেন শ্বশুর মহোদয়কে বলতে ভুলে যান। তবে এটা জানতাম, তিনি শ্বশুরমশাইকে যমের মতো ভয় করেন, চট করে তাঁর কাছে ঘেঁষেন না।

সুতরাং আমার বিপদের সমুদ্রে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ত্রিবান্দ্রম বিমানবন্দরে আমার পূর্ব-পরিচিত, কমেরেড সুব্রহ্মণ্যম, ডাকনাম সুপু, আমাকে নিতে এসেছেন। (১৯৬৭ সালে কমরেড ই এম এস যখন ফের কেরলে মুখ্যমন্ত্রী, সুপু তখন তাঁর আপ্ত সহায়ক।) সুপু আমাকে অবহিত করলেন, কেন্দ্রীয় পুলিশের চর-অনুচর বিমান বন্দরের পুরোটা ঘিরে রেখেছে। তারা শ্যেন দৃষ্টি রাখছে, কোন নচ্ছার কমিউনিস্ট এলো, কোন নচ্ছার কমিউনিস্ট গেল; একজন-দুজন গায়ে পড়ে আমার স্বাস্থ্যানুসন্ধান করলেও আমি যেন কোনো কথা বলার ঝুঁকি না নিই; আমি যে মালয়ালম ভাষায় একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারি না, তা যেন কারো কাছে ফাঁস না হয়ে যায়।

সে এক আলাদা রোমাঞ্চ। উৎসাহ, আনন্দ, গর্ববোধ, সেই সঙ্গে ভয়ের অস্থিরতা। বিমানবন্দর থেকে সুপু ইচ্ছা করেই চালককে একটু আঁকাবাঁকা পথ নিতে বললেন, এক ঘণ্টার জায়গায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় নিয়ে অবশেষে ত্রিবান্দ্রমের পার্টি দপ্তরে পৌঁছনো, পার্টির রাজ্য সম্পাদক গোবিন্দন্ নায়ার, যিনি এম এন নামে সকলের কাছে পরিচিত, আমার জন্য অপেক্ষারত। খানিক বাদে তিনি আমাকে নিয়ে

বেরোলেন, এ-রাস্তা ও-রাস্তা পেরিয়ে পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে শহরের প্রান্তবর্তী একটি বাড়িতে এনে তুললেন। সেখানে ইতিমধ্যেই অধিষ্ঠিত আমার সহযোগী, ইকবাল সিং গুলাটি, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে অধ্যাপনা করে, সে-ও এসেছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বাজেট রচনার কাজে সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে।

শহরের বাইরে একটি নির্জন বাড়ি, কাকপক্ষীও যেন আমাদের উপস্থিতি টের না পায়; বহিরাগত কারো উপদেশ-পরামর্শ নিয়ে বাজেট তৈরি করা হচ্ছে, এটা রটে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে সংবাদ পরিবেশিত হবে, আর দেরি নেই, ইতিমধ্যেই কেরলে কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক গুপ্ত অনুচরেরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তারা রাজ্য সরকারের মধ্যবর্তিতায় দেশের সংহার সাধনে ঝটপট কাজে লেগে গেছে। ছেলেমানুষি বৃত্তান্ত, ছেলেমানুষি ভয়, আতঙ্ক এড়ানোর নানা ছেলেমানুষি বিভঙ্গ। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, সেই সময়চক্রের প্রেক্ষিতে, সব কিছুই অতি বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সেজন্যই আমাদের লুকিয়ে থাকা, লুকিয়ে ঘোরাফেরা করা। অর্থমন্ত্রী অচ্যুত মেনন ধীর-স্থির, বরাবর সংযতবাক্; তাঁর এবং পার্টি নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, নির্জন আশ্রয়স্থলে বসে আমরা বাজেট তৈরির কাজ করবো, নয় তো পার্টির রাজ্য দপ্তরে। কোনো সরকারি আমলার সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনা করা চলবে না; আমাদের যা জ্ঞাতব্য, বা আলোচিতব্য বিষয় তা কমরেড অচ্যুত মেনন অথবা স্বয়ং কমরেড ই এম এস-কে জানাবো, তাঁরা আমলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও আলোচনা করে, যা জানবার-বোঝবার তা জেনে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পুনর্বার যোগাযোগ করবেন।

এখনো মনে পড়ে, ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছে পরদিন সাতসকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ক্লিফ হাউসে কমরেড ই এম এস-এর

সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দিল্লিতে কত সন্ধ্যা তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় শিক্ষিত হয়েছি, জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছি, তাঁর স্নেহের প্রচ্ছায়ায় নিজেকে ধন্য করেছি। সেই ই এম এস এখন স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যে গণতান্ত্রিক প্রথানুযায়ী নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে এক আশ্চর্য আবেগে আমার ভেসে যাওয়া।

কমরেড ই এম এস-এর সঙ্গে যখন দেখা করতে যাই, স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল, মুখ্যমন্ত্রী ভবনের বাইরের ঘরে আড়াই-তিন বছরের একটি শিশু একটি ত্রিচক্রবিশিষ্ট সাইকেল চেপে ঘরময় ডিগবাজি-ঘূরপাক খাচ্ছিল। সেই শিশুপুত্রটি, যার ডাক নাম অনিয়ন, পরবর্তীকালে সুপরিচিত কৃষক নেতা শ্রীধরন; সেই অনিয়নও আর বেঁচে নেই, বছর কয়েক আগে নিষ্ঠুর কর্কট রোগে তার প্রয়াণ ঘটেছে।

পঞ্চাশ বছরে ইতিহাস অনেক এগিয়ে গেছে। স্মৃতিতে উথালপাথাল হতে হয়, সেই উথালপাতাল মুহূর্তেই অথচ বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা জাগে : ইতিহাস কি সত্যিই এগিয়ে গেছে, না কি তা আপাতত পিছনপানে ধাবমান?

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে

অতীতদিনের স্মৃতি . কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে। যাঁরা ভুলে যান, তাঁরা সম্ভবত বেঁচে যান, বিবেকদংশনের পীড়নে তাঁদের ভুগতে হয় না। আর যাঁরা ভুলতে পারেন না, যন্ত্রণার কাতরতার মধ্য দিয়ে তাঁদের দিনাতিপাত করতে হয়।

পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের একাদিক্রমে তিন দশক ক্ষমতাসীন থাকায় কী শুভফল ঘটেছে, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সবাই-ই সম্ভবত একবাক্যে রায় দেবেন, অবশ্যই আমূল ভূমিসংস্কার, যার পরিণামে লক্ষ-কোটি গাঁয়ের মানুষ শক্তির স্বাদ পেয়েছেন, আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সাংগঠনিক দৃঢ়বদ্ধতায় নিহিত যে-জাদুরহস্য, তার সন্ধান পেয়ে গেছেন তাঁরা।

বামফ্রন্ট সরকারের অন্য যে-সফলতা নিয়ে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার বাইরের মানুষজন সমান উচ্ছ্বসিত, তা ফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে গোটা দেশ জুড়ে আশির দশকে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের জন্য সংগঠিত আন্দোলন। এই আন্দোলন এখন থিতিয়ে গেছে। পশ্চিম বাংলায় সবাই সেই আন্দোলনের কথা যেন পরিপূর্ণ বিস্মৃত, অথচ আমাদের রাজ্যের বাইরে যে-কারো সঙ্গে কথা বলে দেখুন না

কেন, সুস্পষ্ট অভিমত উচ্চারিত হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতার বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার বামপন্থী সরকার যে-ব্যাপক সংগ্রামের শুভারম্ভ করেছিলেন, তার পরিণতিতেই এখন কংগ্রেস, ও সেই সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি, উভয় তথাকথিত প্রধান জাতীয় দলেরই পরাক্রম এবং গলাবাজি অনেকটাই প্রশমিত। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে, যে-বিভিন্ন ভাষাভাষী তথা সাংস্কৃতিক ও আচরিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রজাতিকুল ছড়িয়ে আছেন, উক্ত আন্দোলনের ফলে তাঁরা ক্রমশ নিবিড়তর আত্ম-উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। তাঁদের আত্মপ্রত্যয় এখন দ্রুত বর্ধমান, কথায়-কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমজারির অভ্যাস অনেকটা কমেছে। আরো যা ঘটেছে, অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে, বিশেষ করে আঞ্চলিক দলগুলিকে, উপেক্ষা করে কেন্দ্রে কোনো সবকারের টিকে থাকা বর্তমানে অসম্ভব। অবশ্য মানতে হয়, অনেক অঞ্চলেই প্রজাতিচেতনার পরিপূর্ণ প্রস্ফুটন এখনো ঘটেনি, অনেক ক্ষেত্রে তা জাতপাতের কৌদলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তা হলেও মনে হয় এটা সাময়িক বিচ্যুতি। চেতনার মান ক্রমশ যতই উর্ধ্বগামী হবে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান জনগণ বুঝতে পারবেন, আসল সমস্যা আর্থিক শ্রেণিবিভাজনজনিত, জাতপাতের আবরণ প্রকৃত সমস্যাকে কিছু সময়ের জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে মাত্র, আখেরে, সমস্যার আসল চেহারা অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যবর্তিতায় পুরোপুরি উন্মোচিত হতে বাধ্য।

আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার সেই উত্তাল সময়, বামফ্রন্ট সরকারের যাঁরা নেতৃত্বে, নিছক পশ্চিম বাংলার বিশেষ-বিশেষ সমস্যার সংকীর্ণ বৃত্তে নিজেদের আটকে রাখেননি তাঁরা। রাজ্যের সমস্যাগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অন্তর্গত

সমস্যা হিশেবে বিবেচনা করে সব রাজ্যের সরকারকে ঐকামতের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সংস্থানে দাঁড় করাতে তাঁরা আপ্রাণ প্রয়াসী হয়েছিলেন। রাজ্যে-রাজ্যে সমস্যার প্রকৃতি কিছুটা হয়তো আলাদা, কিন্তু সেই ভেদাভেদগুলি অতিক্রম করে কোনো-কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা অবশ্যই সম্ভব। বামফ্রন্ট সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল সেই সত্যটুকু প্রতিষ্ঠার : রাজ্যের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতা চাই, ব্যাপকতর আর্থিক স্বাধীনতা চাই, রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়, কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্যপালকে দিয়ে রাজ্য সরকারের উপর অহেতুক খবরদারি বন্ধ করতে হবে, সম্পূর্ণ অকারণে, অথবা অতি তুচ্ছ ছুতোর সুযোগ নিয়ে, সংবিধানের ৩৫৬ সংখ্যক ধারা প্রয়োগ করে জনগণ-নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করবার অধিকার রহিত করতে হবে, রাজ্য সরকারের অনুমতি ব্যতিরেক কেন্দ্রীয় সামরিক, পুলিশ বা গুপ্তচর বাহিনী, কোনো রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না : এই সমস্ত কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে সেদিন দেশব্যাপী আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারের মৌরসিপাট্টার ভিত্তিভূমি ভীষণরকম কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

১৯৩৮-৪৮ সালের একটি ঘটনাক্রম মনে পড়ছে। ফারুক আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে কংগ্রেসকে গো-হারান হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে, ফারুক আবদুল্লাহ্ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নায়কত্বে বিভিন্ন বিরোধী দলের দ্বারা সংগঠিত কেন্দ্র-রাজ্য পুনর্বিন্যাসের দাবি জানানোর আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তিরাশি সালের গ্রীষ্মে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের আহ্বানে শ্রীনগরে বিরোধী জোটের অভূতপূর্ব জোরদার সম্মেলন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি সোচ্চার থেকে সোচ্চারতর। কয়েক মাস

বাদে, ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে, কলকাতায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি জানিয়ে আর এক জম-জমাট সম্মেলন, আসমুদ্র হিমাচল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঘা-বাঘা বিরোধী নেতারা সেখানে উপস্থিত। সারা দেশ কাঁপিয়ে এক নতুন আওয়াজ : কেন্দ্রের তানাশাহী চলবে না, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিতে হবে, প্রয়োজন হলে সংবিধান আমূল সংশোধন করে রাজ্যগুলির অধিকার প্রসারিত করতে হবে।

কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার গভীর গাড্ডায় নিপতিত। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি রাগে ফুঁসছেন। ইতিমধ্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত চবনের নেতৃত্বে অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে। সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করবেন, সেই কমিশন আয়কর, কোম্পানি কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ইত্যাদি বিভিন্ন রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তা পরবর্তী পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা হবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন, সেই সঙ্গে, এটাও সংবিধানের নির্দেশ, রাজ্যগুলির বিশেষ-বিশেষ সমস্যা বিবেচনা করে অর্থ কমিশন জাতীয় তহবিল থেকে বিভিন্ন রাজ্যের জন্য আলাদা অনুদানেরও ব্যবস্থা করে দেবেন।

সংবিধানের নির্দিষ্ট অনুশাসন-অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠন করা হয়। সেই কমিশন দ্বারা নির্ধারিত রাজস্ব বণ্টন বিন্যাস ও অনুদানের সুপারিশ বিনা প্রশ্নে পুরোপুরি মেনে নেওয়াই সাংবিধানিক রেওয়াজ। অর্থ কমিশন যখন আলোচনার জন্য পশ্চিম বাংলায় এসেছিলেন, তখন বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে রাজ্যে আকীর্ণ সমস্যাদি নিয়ে চবন মহাশয়ের সমীপে বিশদ অনুবেদন পেশ করা হয়। তাঁর সঙ্গে রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের আলোচনা হয়, তিনি

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানবান হওয়ার চেষ্টা করেন।

১৯৫৭ সাল। মে মাসের শেষের দিকে অর্থ কমিশন তাঁদের প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন। কেন্দ্রে বাঙালি অর্থমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে যখন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর দেখা হয়, প্রতিবারই জানতে চাওয়া হয়, কবে সেই প্রতিবেদন লোকসমক্ষে প্রকাশিত হবে, এবং কমিশন-প্রদত্ত সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করার উদ্যোগ নেবেন। রাজ্য সরকারের ভাঁড়ারে মা ভবানী, অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভিন্ন সুপারিশের দিকে সেই সরকার তাকিয়ে। অথচ কমিশনের প্রতিবেদন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছেন, রাজ্য সরকারগুলির ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার মতো অবস্থা।

এরই মধ্যে অন্য এক ঘটনা। ফারুক আবদুল্লাহ্‌র ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীরে কংগ্রেসকে নির্বাচনে কচুকাটা করেছে, ফারুক আবদুল্লাহ বিরোধী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের জন্য চেঁচামেচিতে নিজেকে যুক্ত করেছেন। তাঁর প্রতি ইন্দিবা গান্ধির প্রচণ্ড বীতরাগ। ইন্দিরা ফিকির খুঁজছিলেন। ন্যাশনাল কনফাবেন্সের কিছু সদস্যকে তিনি টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা কবলেন। তারপর বিধানসভা আদৌ না ডেকে হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রিতে ফারুককে বরখাস্ত করে রাজ্যপাল ইন্দিরা গান্ধির বশংবদ একজনকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিলেন। কাশ্মীর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলো। গভীর প্রত্যয়েব সঙ্গেই বলা চলে, ইন্দিরা গান্ধির ওই আচরণে কাশ্মীরের জনগণ এতটাই ক্ষেপে গেলেন যে গোটা ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কেই তাঁদের মনে গভীর বিতৃষ্ণা জন্ম নিল। সেই বিতৃষ্ণার ঋতু এখনো কাটেনি; কে জানে, হয়তো কাটবেই না কোনোদিন।

কাশ্মীরের সঙ্গে সারা দেশের মানুষজনও প্রতিবাদে উন্মুখর। নতুন দিল্লিতে তড়িঘড়ি বিরোধী দলগুলির বৈঠক, বিরোধীদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শ্রীনগর গিয়ে পৌঁছুলেন। শ্রীনগরের মানুষ কাতারে-কাতারে রাস্তায় বেরিয়ে এসে নতুন দিল্লির সরকারকে ধিক্কাররত। বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা তাঁদের অভয় দান করলেন গোটা দেশের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, এই জঘন্য অপরাধের সমুচিত জবাব ইন্দিরা গান্ধি ও কংগ্রেস দল অতি শীঘ্র পাবেন। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেও বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা সেই কথা জানিয়ে এলেন। এ-সব যখন ঘটছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীর আরো দু-একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী প্রতিবারই প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। একবার শুধু বেফাঁস বলেছিলেন, কমিশনের সুপারিশগুলি থেকে পশ্চিম বাংলার প্রভূত লাভ হবে। বলেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীনগর থেকে কলকাতায় ফেরার পথে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ফের দেখা করলেন। তাঁদের কথাবার্তা মাতৃভাষাতেই বরাবর হয়ে থাকে। এবারেও তাই হলো. রাজ্য অর্থমন্ত্রীর প্রশ্ন মশাই, কবে অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন বেরোবে? প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী এবার হঠাৎ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ফারুক আবদুল্লাহ্‌র বিষয়ে আপনারা কি খুব বেশি চেঁচামেচি করবেন? রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলেন না। বিরোধী দলগুলি ফারুক আবদুল্লাহ্‌র বরখাস্ত নিয়ে কতটা প্রতিবাদমুখর হবেন, তার সঙ্গে অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ ও সেই প্রতিবেদনের শর্তগুলি পরিপূরণের মধ্যে কী যোগসূত্র?

যোগসূত্রটি বোঝা গেল অল্পসময়ের মধ্যেই। কয়েকদিনের ব্যবধানে নতুন দিল্লিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক। বৈঠক শুরু হতে না হতেই বিরোধীদলভুক্ত ছয়-ছয় জন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ্‌র পদচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলেন। তাঁদের হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাম রাও বিবৃতি পেশ করলেন। হট্টগোল, চেঁচামেচি, বাদানুবাদে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠক পণ্ড। ছয় বিরোধীপক্ষীয় মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দিলেন, কাশ্মীরে যে-দুরাচার হয়েছে, তার প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলি তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন।

ঠিক এর পরে-পরেই অর্থ কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। প্রতিবেদনের সবচেয়ে যা উল্লেখযোগ্য অংশ, অর্থ কমিশন পশ্চিম বাংলার সমস্যাদি নিয়ে বিশেষ ভাবিত, তাই তাদের সুপারিশের প্রথম বছরে এই রাজ্যের জন্য কমিশন জাতীয় তহবিল থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার মতো বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

আমাদের উল্লাস কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল। প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, যার সারমর্ম : দেশে অভাবনীয় আর্থিক সঙ্কট চলছে, মূল্যমান লাগামছুট ঊর্ধ্বগতি, সরকারি ব্যয়সঙ্কোচ অতি আবশ্যক। যদিও এটা অলিখিত বিধান, অর্থ কমিশনের প্রতিটি সুপারিশ গ্রহণ করতে সরকার নীতিগতভাবে বাধ্য, এই বছর তা পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য অর্থ কমিশন যা-যা বরাদ্দ করেছেন, সে-সব কিছু কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অভাবনীয় সিদ্ধান্ত, সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখানো সিদ্ধান্ত। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, অর্থ কমিশনের সভাপতি যশোবন্ত চবনের সঙ্গে দেখা করলেন, যশোবন্ত চবনও সমান ক্ষুব্ধ, এই অনাচার তাঁর মতে

কলঙ্কজনক। প্রধানমন্ত্রীর কাছে চবন তাঁর প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক অবিচল। পশ্চিম বাংলার সরকারকে একটু ঠাণ্ডাই-মাণ্ডাই দেওয়া দরকার, কারণ সেই সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস নিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছেন, ফারুক আবদুল্লাহ্‌র অপসারণ নিয়ে হইহট্টগোল শুরু করেছেন। সেই সরকারকে শিক্ষা দিতে হবে, ভাতে মারতে হবে।

এখন যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। কয়েক সপ্তাহ বাদে এক ঘরোয়া আলাপে তিনি পশ্চিম বাংলার অর্থমন্ত্রীকে জানান, অর্থ কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন, এবং তাঁকে বলেছেন যে অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনুদান আটকে রাখা সম্পূর্ণ অর্থহীন, রাজ্যগুলি কমিশন নির্ধারিত বরাদ্দ অর্থ না পেলে বাড়তি ওভারড্রাফ্‌ট নিতে বাধ্য হবে; সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুদ্রাস্ফীতি রোধের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রভাবই পড়বে না। ইন্দিরা গান্ধি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে নাকি বলেছেন, কিন্তু তাঁর অর্থমন্ত্রী তাঁকে অন্যরকম বুঝিয়েছেন, অর্থমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী যেতে পারবেন না।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কথায় প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, না কি প্রধানমন্ত্রীর, ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে অর্থমন্ত্রী নিদান দিয়েছিলেন, পাত্রাধার তৈল না কি তৈলাধার পাত্র, সেই প্রশ্ন তুলে তখনো লাভ ছিল না, এখনো লাভ নেই। মজার ব্যাপার হলো, নিজের অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী কংগ্রেস-শাসিত প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে-ডেকে আশ্বাসন দিলেন, তাঁদের চিন্তার কারণ নেই, ওই বছর অর্থ কমিশনের রায় অনুযায়ী যে-টাকা ওঁরা পেতেন, তা তিনি তাঁদের বিনা সুদে ঋণ দেবেন, এবং সেই ঋণ

তাঁদের পরিশোধ করাতে হবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলিকেই সাজা দেওয়া হলো, যে-রাজ্যগুলি নিজেদের দলের করতলগত, তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা।

স্বাধীনতার পর ষাট বছর অতিক্রান্ত। অর্থ কমিশনের নির্দেশ ওই একবারই কেন্দ্রীয় সরকার অমান্য করেছিলেন, আগেও আর কখনো না, পরেও না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লেখা হলো সেই চিঠি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বহস্তে রাষ্ট্রপতি সর্দার জৈল সিংহকে পৌঁছে ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করে হিন্দিতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনলোগোনে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার — কেন 'খামোকা' আপনাদের সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, রাষ্ট্রপতি অসহায়, তাঁর কিছু করবার ছিল না, সংবিধান তাঁকে সেরকম কোনো অধিকার দেয়নি, তবে তাঁর ওই 'খামোকা' শব্দটির উচ্চারণ রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর খেয়াল উদ্রেব করালো বাংলায় যদিও আমরা অহরহ কথাটি ব্যবহার করি, শব্দটির উৎস হিন্দুস্থানী।

অতীত দিনের স্মৃতি, কেউ-কেউ ভোলে না, আবার কেউ-কেউ ভোলেও। যুগান্ত ঘটেছে, হঠাৎ পত্রিকা পড়ে অবগত হওয়া গেল, সেই-বঙ্গসন্তান, যিনি কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী ছিলেন, এবং যে-বঙ্গ সন্তান পশ্চিম বাংলাকে বঞ্চিত করার জন্য অভাবনীয় অভূতপূর্ব সিদ্ধান্তের হোতা, কিছু বামপন্থী নেতা এবার তাঁকেই নাকি দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত সফল হননি।

কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে।

একদা নিশীথকালে

তিন দশক অনেকটা সময়, সেই দীর্ঘ কালবিস্তার বামফ্রন্ট সরকার অতিক্রম করে এলো। হয়তো ভুল বললাম। বামফ্রন্ট সরকার সম্ভাষণের মধ্যে যে-অখণ্ড অবয়বের ইঙ্গিত, তা হয়তো এখন আর নিটোল নয়। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে, প্রকৃতির নিয়ম মেনেই হয়তো বা, সরকারের প্রকৃতিও ঈষৎ পাল্‌টায়, বামফ্রন্ট সরকারেরও পালটেছে। তা নিয়ে বিলাপ করবার মতো শৌখিনতা বিশ্বায়নের ঋতুতে শোভা পায় না।

তবে স্মৃতিকে তো রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। তেমনি একটি স্মৃতি হঠাৎ মানসপটে ভেসে উঠলো।

সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে একটি বিশেষ শ্রেণিনির্দেশ আছে; থাকা উচিত ছিল না, কিন্তু তা হলেও আছে। একজাতের মানুষ যাঁরা বুদ্ধির বড়াই করেন, মাটিতে পা ঠুকে সমাজের অন্য সবাইকার দিকে চোখ রাঙিয়ে বলেন : আমরা বুদ্ধিজীবী, তোমাদের চেয়ে আমরা স্বতন্ত্র, আমাদের সঙ্গে সামলে-সুমলে কথা বলবে, আচরণ করবে, নইলে বুদ্ধির আগুনে তোমাদের ভস্ম করে দেবো। এবং এ এক আশ্চর্য হীনম্মন্যতাবোধ, সমাজস্থ অন্য সবাই এই দম্ভ-ঠাসা মানুষগুলির

আস্ফালন মেনে নেয়। সে-সব তাজ্জব ঘটনা দেখে আরো কারো-কারো শখের পাখা গজায় : কী মজা, কী মজা, আমিও না হয় বুদ্ধিজীবী বনে যাই, আমার এলেম হয়তো হাডুডু খেলায়, কিংবা এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় বে-পাড়ায় বেপরোয়া সাইকেল চালানোয়, কিন্তু অত-শত কে আর ভাববে, বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় একবার যদি কায়দা করে কোনোক্রমে নিজের নামটি সেঁধিয়ে দিতে পারি, এখন থেকে তা হলে আমাকে আর পায় কে, আমাকেও সমাজস্থ অন্য সবাই সেলাম ঠুকবে; আমি হয়তো স্রেফ মস্ত বড়ো রেসুড়ে, তাতে কী, আমিও বুদ্ধিজীবী।

স্মৃতি উথলে আসে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পয়লা বছর তখনো ফুরোয়নি। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ। জলন্ধরে পার্টি কংগ্রেস। অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক দঙ্গল মন্ত্রীও পার্টি কংগ্রেসে যোগ দিতে জলন্ধর গিয়েছেন। মহাকরণ প্রায় ফাঁকা। মাত্র একজন-দুজন মন্ত্রী কলকাতায় থেকে গিয়ে প্রশাসনের ঠাট বজায় রাখছেন।

সেই সপ্তাহের সুযোগ নিতে কতিপয় বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে কতিপয় ব্যক্তি মাঠে নেমে পড়লেন। দণ্ডকারণ্যের দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা পেতে একশো-দুশো শরণার্থী ফিরে আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে জড়ো করিয়ে এসব বুদ্ধিজীবীরা ক্ষেপানোর খেলায় মেতে উঠলেন। অতি বাঘা বুদ্ধিজীবী এঁরা, শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকামী লড়াকু মানুষদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারবার মার্কিনি স্বাধীনতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন। যখন পশ্চিম বাংলার সমগ্র জনগণ 'তোমার নাম, আমার নাম ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম' মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন এসব বুদ্ধিজীবীরা মার্কিন কনস্যুলেটে গিয়ে খানাপিনা করছেন, মার্কিন স্বৈরাচারের সপক্ষে ডাঁট হয়ে বসে প্রবন্ধ রচনা করছেন। তখনো পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল, পশ্চিম বাংলায়

বামপন্থী অভ্যুত্থান একটি সাময়িক উল্‌টো ব্যাপার; বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে নির্বাচনে জিতে বামফ্রন্ট যে-সরকার গঠন করেছে, তা বেশিদিন টিকবার নয়, কোনো উপলক্ষ ঘটিয়ে তাকে কাত করে দেওয়া যাবে, এবং সেই সরকার কাত হলে নিশ্চিন্ত মনে ফের মার্কিন কনস্যালেটের খানাপিনায় মগ্ন হওয়া যাবে। শুধু একটি উপলক্ষ চাই, যাকে অবলম্বন করে বামফ্রন্ট সরকারকে বেকাদায় ফেলে কুপোকাত করা যায়।

তাঁরা ভাবলেন, এই যে দণ্ডকারণ্য থেকে কিছু-কিছু শরণার্থী ফিরে আসছেন, তাঁদের কেন্দ্র করেই ষড়যন্ত্রের মহড়া শুরু হয়ে যাক। সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় মরিচঝাঁপি অঞ্চল, সেখানে বহু আন্দোলন-লড়াই করে জমিদার-জোতদারদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জমিতে অগণিত ছোটো চাষি কৃষিকর্মে নিরত আছেন, দিনভর, ঋতুভর, বছরভর পরিশ্রম করে জীবিকা অনুসন্ধান তাঁদের। বুদ্ধিজীবীরা দাবি তুললেন, এই হতচ্ছাড়া চাষিদের জমিতে দণ্ডকারণ্য-ফেরত শরণার্থীদের সংসার পাততে দিতে হবে, চাষিদের তাড়িয়ে দিয়ে মরিচঝাঁপিতে দণ্ডকারণ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের বসাতে হবে; সরকার যদি অবিলম্বে এই দাবি মেনে না নেন তা হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হবে।

মহাকরণ ফাঁকা। মুখ্যমন্ত্রী-সহ অধিকাংশ নেতাই জলন্ধরে। বুদ্ধিজীবী-চূড়ামণিরা এই সপ্তাহটি তাই বেছে নিলেন মরিচঝাঁপি অভিযানের জন্য। তাঁরা মনস্থ করলেন, রাতের অন্ধকারে তিনশো-চারশো মানুষ জড়ো করে তাঁরা অভিযানে এগোবেন, মরিচঝাঁপিতে ঢুকে পড়ে চাষিদের উৎখাত করে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করবেন, দেখা যাক্ বামফ্রন্ট সরকারের কত বুকের পাটা তাঁদের রুখে দেয়।

সংকট। মাত্র একজন-দুজন মন্ত্রী কলকাতায় বসে প্রশাসন সামলাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা মাথা ঠিক রাখছেন। পুলিশের তরফ থেকে

অহরহ মন্ত্রীদের নানা ভয়-ভরা কাহিনী শোনানো হচ্ছে : যে-কোনো মুহূর্তে মরিচঝাঁপিতে আক্রমণ শুরু হবে; আপনারা যথাশীঘ্র আমাদের নির্দেশ দিন যাতে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, তাঁদের প্রতিহত করতে ধড়াচুড়া পরে কামান-বন্দুক নিয়ে নামতে পারি।

একজন-দু'জন মন্ত্রী, যাঁরা কলকাতায় আছেন, তাঁরা জলন্ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, পরিস্থিতির উপর তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু তাঁরা আদৌ ঘাবড়াচ্ছেন না, পুলিশকর্তারা তাঁদের যতবার ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা অচঞ্চল থাকছেন।

একদা নিশীথকালে ঘটনা চরমে পৌঁছুলো। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশকর্তা কলকাতায়-থেকে-যাওয়া এক মন্ত্রীকে ফোন করে ঘুম থেকে তুললেন। সংবাদ নাকি গুরুতর, হাজার খানেক মারমুখি মানুষ মরিচঝাঁপি আক্রমণ করতে উদ্যত; মাঝখানে একটি খালের ব্যবধান, সেই খাল পেরিয়ে এলেই তারা মরিচঝাঁপিতে ঢুকে পড়বে, ক্ষুদ্র কৃষকদের জমি আর রক্ষা করা যাবে না। যারা এগোচ্ছে, তাদের খুব জঙ্গি চেহারা, যে-কোনো মুহূর্তে তারা খাল পেরিয়ে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পুলিশকর্তা মন্ত্রীকে টেলিফোনে অভিমত ব্যক্ত করলেন, আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে গেলে গুলি না চালিয়ে উপায় নেই, মন্ত্রীকে গুলি চালানোর অনুমতি দিতে হবে; সময় একেবারেই নেই, এই মুহূর্তেই সেই অনুমতি দিতে হবে।

মন্ত্রীমশাই উত্তাপহীন। তিনি জানালেন, অবস্থা যদি এতটাই সঙিন হয়ে থাকে, তা হলেও বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার, যাঁরা ভুল বুঝে অপরের জমি দখল করতে এগিয়ে আসছেন, তাঁরাও শাদামাটা, গেরস্ত মানুষ, আপাতত গৃহহীন, তাঁরাও সর্বহারাদলেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাঁদের রক্তাক্ত করে বামফ্রন্ট সরকার নিজেকে কলঙ্কিত করবে

না। রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তাকে মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট ভাষায় বললেন : যদি একান্তই গুলি চালানো আপনার বিবেচনাপ্রসূত হয়, তা হলে আপনাকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, গুলি হয় আকাশের দিকে নয় তো খালের জল লক্ষ্য করে চালাবেন, কাউকে জখম করবার বা প্রাণে মারবার প্রয়োজন নেই, শূন্যে কিংবা জলে গুলি চালানো হলে তা দেখামাত্র অগ্রসরমান জনতা পিছু হটবে। মন্ত্রী পুলিশকর্তাকে জানালেন, যদি তিনি অঙ্গীকার করেন ঠিক এমনধারা গুলি চালাবেন, যাতে একজনও হতাহত না হয়, তা হলেই তিনি গুলি চালানোর অনুমতি পাবেন, অন্যথা নয়। পুলিশের বড়ো কর্তা নাছোড়বান্দা, না, তাঁর পক্ষে এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়, পুলিশ গুলি চালালে একজনও হতাহত হবেন না এমন গ্যারান্টি তিনি দিতে পারবেন না। মন্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাহলে আপনাকে গুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা হতাশ হয়ে ফোন ছেড়ে দিলেন।

নিশীথ প্রভাত হলো। সাতসকালেই খবর পৌঁছলো, মরিচঝাঁপিতে ব্যাপারটি বেশি দূর গড়ায়নি। পুলিশ বাড়াবাড়ি করছে না দেখে খালের ওপারে থাকা জনতা একটু থমকে গেল, কিছু চেঁচামেচি হলো, কিছু শ্লোগান বর্ষণ, কিন্তু কেউই খাল পেরিয়ে এদিকে এগোলো না। মরিচঝাঁপি আন্দোলন আপাতত স্তিমিত হয়ে এলো। দিন দশ-বারো বাদে দূরবর্তী কোথাও কোনো রেলস্টেশনে পুলিশের সঙ্গে দলছুট কিছু শরণার্থীর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু মরিচঝাঁপি কেন্দ্র করে আন্দোলন সেই রাত্রির পরই গুটিয়ে গেল। পরের বছর আরেক দফা চেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু তা-ও তেমন জোরালো হতে পারেনি।

দাপুটে বুদ্ধিজীবীরা একটু মিইয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ সান্ত্বনা খোঁজবার জন্য মার্কিন মুলুকে প্রস্থান করলেন।

বামফ্রন্টের ঋতু তিরিশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই উপলক্ষে প্রথম বছরের এই বিশেষ স্মৃতিটুকু ঘুরে-ফিরে মনের পর্দায় ধাক্কা মারে। কিছু উৎকণ্ঠার স্মৃতি, কিছু দৃঢ়তার স্মৃতি, কিছু স্বস্তির নিঃশ্বাসের স্মৃতি।

তবে কিছু-কিছু কাহিনী ফুরিয়েও ফুরোয় না। যে তাবড়-তাবড় বুদ্ধিজীবীরা তিরিশ বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারকে নিধন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন, তাঁদের কী করে যেন হঠাৎ হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁদেরই এখন মহাকরণের আশেপাশে ঘন-ঘন হাজিরা দিতে দেখা যায়: অমুক মন্ত্রী-তমুক মন্ত্রীর জন্মদিনে পুষ্পস্তবক নিয়ে তাঁরা মহাকরণের দুয়ারে সদা সু-উপস্থিত। কী জানি তাঁরা হয়তো ভেবে বসেছেন, বামফ্রন্ট সরকারেরই হৃদয় পরিবর্তন ঘটেছে।

বঙ্গ সংস্কৃতি

এখন সমস্ত-কিছুই প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী বলে মনে হয়।

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ চতুর্থ দশকের শুরু, বিশ্ব জুড়ে আর্থিক মন্দা। পরাধীন দেশ ভারতবর্ষ, আমাদেব আর্থিক অবস্থা আরো করুণ, বিশেষ করে বাঙালিদের। ধান-পাটসহ সমস্ত কৃষিপণ্যের দাম মুখ থুবড়ে পড়া, শোষিত-নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত কৃষককুলের দুর্গতির সীমা নেই, মধ্যবিত্ত বাঙালির হালেও তেমন কিছু রকমফের নেই। এম এ-এস এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাঙালি ঘরের ছেলেরা যে-কোনো একটি কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন, কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনেতে হলেও কোথাও সুযোগ পেলে তাঁরা কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছেন। সেরকম সুযোগও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুটছে না। এঁদেরই মধ্যে কেউ-কেউ হয় গান্ধিজির অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, নয়তো সহিংস বিপ্লববাদের শপথ নিয়ে, সভা-সমিতি গুপ্তবৈঠক ইত্যাদি করছেন, পুলিশের হাতে ধরা পড়ছেন, বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজবন্দী। অন্য কেউ, করণীয় অন্য-কিছুর অভাবে, গল্প-উপন্যাসে হাত পাকাবার চেষ্টা করছেন, নয়তো ছন্দ-মিল সহ, বা ছন্দ-মিল বাদ দিয়েই, কবিতা লিখছেন, কিছু কিছু

ছাপা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে না। আরো কেউ-কেউ গান লিখছেন, সেই গান, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, গ্রামোফোন কোম্পানিকে বিক্রি করে দু'টাকা-এক টাকা পাচ্ছেন, বড়ো জোর পাঁচ টাকা, প্রতি গান বাবদ।

অথচ এই গান লেখা আর গান গাওয়া জুড়েই একটি বিপ্লব ঘটে গেল সে-সময়কার বাংলাদেশে। এমন ধারার কিছু বাঙালি যুবক, তাঁদের অনেকে পূর্ববঙ্গ থেকে—কুমিল্লা, কি ঢাকা, কি শ্রীহট্ট-কোচবিহার থেকে—এসে কলকাতার কোনো কলেজ থেকে পাশ করেছেন, কিংবা মফঃস্বল থেকেই পাশ করে এসেছেন, নাম না-লেখানো বেকার, তখন তো বেকারদের নাম নথিভুক্ত করবার রেওয়াজ বা নিয়ম ছিল না। তাঁরা একদল বন্ধু গান নিয়ে মেতে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-অতুলপ্রসাদ সেন-কাজি নজরুল ইসলাম অতিক্রম করে বাংলা গানে নতুন বিভঙ্গ অনুপ্রবেশের জন্য তাঁরা প্রয়াসবান। তাঁদের অধ্যবসায় থেকে আধুনিক বাংলা গানের অধ্যায় শুরু, সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়। বন্ধুদের কেউ গান লিখছেন, অন্য কেউ সুর দিচ্ছেন, তৃতীয় এক বন্ধু, চমৎকার তাঁর কণ্ঠঐশ্বর্য—শাস্ত্রীয় সংগীতে অনুধ্যানের পাশাপাশি গ্রাম্য দেশি সুরের সঙ্গেও তাঁর কণ্ঠের সমান সখ্য—সেই গান শুনিয়ে পাড়া মাতিয়ে দিচ্ছেন। ভাগ্যের শিকে ছিঁড়লে, গ্রামোফোন প্রস্তুত কারক কোম্পানিগুলি ডেকে নিয়ে সেই গানের রেকর্ডও তৈরি করছেন। এই সব নামগুলি পরে সমাজের কাছে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে : সুরকার হিমাংশুকুমার দত্ত, কমল দাশগুপ্ত অথবা গীতিকার অজয়কুমার ভট্টাচার্য কিংবা সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব রায়, আর তাঁদের সৃষ্ট গানগুলি গাইছেন এক দঙ্গল নতুন গায়ক-গায়িকা : উমা বসু, শচীন দেব বর্মন, সাবিত্রী ঘোষ। হঠাৎ আকাশে যেন বিদ্যুতের

ঝিলিকরেখা খেলে গেল, বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে আধুনিক গানের অনুপ্রবেশ ঘটলো।

সেই মুহূর্তে সুরকারদের মধ্যে যেমন হিমাংশুকুমার দত্ত ও কমল দাশগুপ্তের নাম অহরহ শোনা যেত, অজয়কুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে অন্য একটি গীতিকারের নাম নিয়েও জল্পনা হতো, নামটি বিনয় মুখোপাধ্যায়। পূর্বপুরুষদের আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়, সেখান থেকে তাঁরা একটু পূর্বদিকে উঠে এসেছিলেন, মেঘনা নদীর বন্দর চাঁদপুরে। কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী এই চাঁদপুর। হয়তো কৈশোরেই কুমিল্লাতে অজয়কুমার ভট্টাচার্য ও শচীন দেব বর্মনের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর, পরে কলকাতার রাস্তাঘাটে ফ্যা ফ্যা বেকার হিশেবে ঘুরে বেড়ানো। একটা সময়ে সম্ভবত হিমাংশু দত্তের তাগিদে বিনয় মুখোপাধ্যায় গান রচনায় নিবিষ্ট হলেন। কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি। আজ থেকে সত্তর বছর আগে উমা বসু একটি গান গেয়ে কলকাতা তথা গোটা বাংলাদেশ মফঃস্বলগুলিকে মাতিয়ে দিলেন : "ঝরানো পাতার পথে / কুসুম দলিয়া পায় / তরুণ তাপস কে গো / বিজন মনের ছায়ে।" প্রায় কাছাকাছি, সময়ে শচীন দেব বর্মনের গাওয়া রেকর্ড বেরোলো : "নতুন ফাগুনে যবে / আজি ধরা চঞ্চল / আমার বাদল গাথা / কাহারে কহিব বল..."

কয়েকমাস আগে বা পরে তেমনি আর ক'টি গান গাইলেন সাবিত্রী ঘোষ : "বেদনাতে বিজড়িত গান / বিদায় বেলায় দিনু দান / বিরহবিধুর দিনে বারেক তোমার বীণে / তুলিও করুণ তারই তান..." তিনটি গানেরই সুর-সংযোজক হিমাংশুকুমার দত্ত; তিনটি গানেরই রচয়িতা বিনয় মুখোপাধ্যায়।

সব মিলিয়ে বিনয় মুখোপাধ্যায় আটটি-দশটির বেশি গান সেই যুগে রচনা করেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধলো। ১৯৪৪ সালে হঠাৎ

হিমাংশুকুমার দত্ত প্রয়াত হলেন। সুহৃদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বিনয় মুখোপাধ্যায়ের গান লেখার পর্ব চুকে গেল। ইতিমধ্যে তিনি সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নিয়েছেন। প্রথম দিকে যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, দুর্ভিক্ষের বছর ভারত সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগে কাজ পেয়ে দিল্লি চলে যান। চুপচাপ স্থিতধী মানুষ, কোনোদিন নিজেকে জাহির করেননি। সরকারি কাজে ধাপে-ধাপে পদোন্নতি ঘটেছে, সত্তরের দশকে অবসর নিয়েছেন ভারত সরকারের তথ্যাধ্যক্ষ হিশেবে। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন, নিঃসন্তান দম্পতি, অবসর গ্রহণের পর দিল্লির পাট চুকিয়ে কলকাতায় ফিরে বিনয়বাবু যোধপুর পার্ক অঞ্চলে একটি ছোটো বাড়ি বানিয়েছিলেন, সেখানেই আমৃত্যু ছিলেন। স্ত্রী গত হবার পর বিনয় মুখোপাধ্যায় আরো নিঃসঙ্গ হয়ে যান, বছর তিনেক হলো তিনি প্রয়াত।

এই বৃত্তান্তে একটি উপকাহিনী আমি অবশ্য এতক্ষণ উহ্য রেখে গেছি। দিল্লিতে বিনয় মুখোপাধ্যায় সরকারি দপ্তরের কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে চোখ-কান খোলা রেখেছেন, এবং সঙ্গোপনে বাংলা সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন থেকেছেন। একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও তাঁর নাম জড়ানো। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ঊষামুহূর্তে তিনি সোদপুরে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে যান, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরূপে . যদি গান্ধিজি এই মহৎ দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে কোনো বাণী প্রেরণ করতে সম্মত থাকেন, বিনয়বাবু লিখে নেবেন। গান্ধিজি বিনয় মুখোপাধ্যায়কে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে, দেশকে-জাতিকে আমার কিছু বলার নেই, আমি বিষাদে আচ্ছন্ন।

সমান চমকপ্রদ যে তথ্য, ঠিক এই সময়েই 'যাযাবর' ছদ্মনামের আড়ালে বিনয় মুখোপাধ্যায় 'দৃষ্টিপাত' নামে একটি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির চরিত্র বিচিত্র। না প্রবন্ধ, না ইতিহাসচর্চা, না উপন্যাস

এমন-কিছু রচনা অধ্যায় আকারে ক্রমানুক্রমিক সাজানো। সুন্দর ঝরঝরে গদ্যে রচিত যাবাবরের 'দৃষ্টিপাত' নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রসালো লেখা, অথচ যে-লেখা জ্ঞান বিতরণ করে, ভাবায়, সেই সঙ্গে কাঁদায়ও। 'দৃষ্টিপাত' যেন কয়েকটি আলাদা হর্ম্যকে জুড়ে দেওয়া আশ্চর্য স্থাপত্য। আমলাদের জন্য গড়া, আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নতুন দিল্লির শ্রেণিবিভাজিত সমাজের নিখুঁত বর্ণনা, সেই সঙ্গে স্বাধীনতার ক্রান্তিলগ্নে রাজধানীতে রাজনৈতিক ছলাকলা-ষড়যন্ত্রের তির্যক সূক্ষ্ম বিবরণ, এবং তাঁরই সঙ্গে এক বিষাদ-বিধুর প্রেমোপাখ্যান, এক প্রবীণ মারাঠি ভদ্রলোকের এক বাঙালিনীকে নিয়ে ব্যর্থ অনুরাগের সংবেদন-টইটম্বুর কাহিনী।

'দৃষ্টিপাত' বইটির সংস্করণের পর সংস্করণ হয়েছে, কিন্তু যাযাবর তাঁর খোলস ছেড়ে কখনো বাইরে আসেননি। তিনি আরো একটি-দুটি উপন্যাস বা ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, সেগুলি বাজার ততটা খায়নি, বিনয় মুখোপাধ্যায় নির্বিকার থেকেছেন। খুব কম লোকই জানতে পেরেছেন যে 'যাযাবর' নামটির আড়ালে স্বয়ং তিনি। নীরবতার প্রশান্তির মধ্যে বিনয়বাবু স্বস্তি খুঁজেছেন, এবং পেয়েছেনও।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউ তাঁর তেমন খোঁজ রাখে না। হঠাৎ কী ঘটলো ভাগ্যবিধাতার মনে, বিংশ শতকের শেষ লগ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করলেন, 'যাবাবর' ওরফে বিনয় মুখোপাধ্যায়কে সে-বছরের বিদ্যাসাগর পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার কর্তৃক এই পুরস্কার দেওয়া হয় বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন, তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য। কোনো সন্দেহ নেই, বিনয় মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি সরকারের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, যে-কোনো বছরেই সহজ নয়।

প্রতি বছর আটাশে অক্টোবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিনে এই পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ওই তারিখে নিমন্ত্রিত হয়ে বিনয় মুখোপাধ্যায় নির্ধারিত সভাস্থলে উপস্থিত। তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হলো। বিদ্যাসাগরের নামে পুরস্কার, রাজ্য সরকারের ঘোষিত পুরস্কার, সরকারের তিন-তিনজন মন্ত্রী সশরীরে হাজির : দু'জন শিক্ষাবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অন্যজন সংস্কৃতি মন্ত্রী।

সভা সুচারুভাবে চলছিল। বিনয় মুখোপাধ্যায়কে মঞ্চে আহ্বান করা হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ গুঞ্জন, মঞ্চে গুঞ্জন, সভাকক্ষে গুঞ্জন, গুঞ্জন ক্রমশ উচ্চগ্রামে, একটা সময়ে হঠাৎ তা বিপর্যস্ত হট্টমেলার রূপ পরিগ্রহণ করলো। হঠাৎ কী ঘটলো? মন্ত্রীদের কাছে ওই মুহূর্তে নাকি খবর পৌঁছেছে, একটু আগে সারা বিশ্বে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পর এই প্রথম আর এক বাঙালি সে-বছর একটি জগৎবিখ্যাত মহামূল্যবান আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছেন।

বিদ্যাসাগর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ছত্রভঙ্গ। বিনয় মুখোপাধ্যায় আবিষ্কার করলেন, তিনজন মন্ত্রীই অন্তর্হিত। জনৈক বাঙালির পুনর্বার এমন বিশ্ববিজয়ের সংবাদে মন্ত্রীরা দিশেহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁরা নাচবেন, না কাঁদবেন, না হাসবেন, না বৈরাগী হবেন, ভেবে নির্ণয় করতে না পেরে সভাস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। সভামঞ্চে বিনয় মুখোপাধ্যায় একা। না, ঠিক একা নন, কোনো অধঃস্তন আমলা তাঁর হাতে বিদ্যাসাগর পুরস্কারটি গুঁজে দিলেন।

বিনয়বাবুর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, মিষ্টি-মিষ্টি হেসে তিনি কাহিনীটি আমাকে শুনিয়েছিলেন। কোথাকার কে বিদ্যাসাগর, তার নামে পুরস্কার, সেই পুরস্কার এক হেঁজিপেজিকে দেওয়ার জন্য মন্ত্রীরা আরো আধঘণ্টা

সময় নিজেদের ওখানে আটকে রাখবেন, তা হতে দেওয়া যায় না; আপনারা কি ইতিমধ্যে খবর পাননি, এক বাঙালি ফের জগৎ জয় করেছেন?

অভ্যাসমতো আমরা এখনো সমারোহ করে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি।

অগ্রগামী নিরক্ষরতা

সম্প্রতি প্রয়াত শঙ্খ চৌধুরী আজ পর্যন্ত যে-দুজন বাঙালি জাতীয় ললিত কলা আকাদেমির সভাপতির পদে বৃত হয়েছেন, তাঁদের একজন। রামকিঙ্কর বেইজ-এর এই প্রিয়তম ছাত্র ভারতবর্ষের ভাস্কর্যশিল্পে আশ্চর্য বিভিন্ন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। প্রথম জীবনে উদার খামখেয়ালের সঙ্গে জলরঙ ও তেলরঙে এন্তার ছবি এঁকেছেন, সে-সব অনামনস্ক অবহেলায় বিলিয়ে দিয়েছেন এঁকে-ওঁকে-তাঁকে। যাঁদের সে সমস্ত ছবিগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা অবাক হয়ে গেছেন কী অবলীলায় নিজের প্রতিভার-বিচ্ছুরণ-ছড়ানো এই ছবিগুলি শঙ্খ চৌধুরী ভুলে থাকলেন, ভুলে গেলেন। ভাস্কর্যের আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করে তিনি টেরাকোটা থেকে শুরু করে, কাঠ নিয়ে পরীক্ষা পেরিয়ে, ধাতুর মধ্যবর্তিতায় পৌঁছে গেলেন, ধাতুর মিশেল নিয়ে এন্তার পরীক্ষা করেছেন। পেতল থেকে পেটানো লোহা, পেটানো লোহার সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর—এমনকী অ্যালুমিনার—মিশ্রণ, সেখান থেকে ফের কাঁকর নিয়ে, পাথর নিয়ে পরীক্ষা। শিল্পীকে কর্মী হতে হয়, প্রতিভার সঙ্গে পরিশ্রমকে যুক্ত করতে হয়; তাঁর সমগ্র শিল্প জীবনে শঙ্খ চৌধুরী, সেই সার সত্যটুকু দৃষ্টান্তিত করেছেন। বহু বছর বরোদা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, সেখান থেকে দিল্লি · সর্বত্র ছাত্ররা ঝাঁক বেঁধে জড়ো হয়েছে, গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের ভিড, উৎসাহে টগবগ করছেন তিনি, কল্পনার শরীরে নতুন কল্পনাব বোঝা চাপিয়েছেন। একদিকে যেমন মানুষের অবয়ব নিয়ে অক্লান্ত উৎসাহে স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন, পাশাপাশি, কখনো শান্ত, কখনো উদ্দাম, কোনো কল্পিত রূপকে আপাত-বিমূর্ত অনুশাসনে বেঁধেছেন। তাঁর রচিত স্থাপত্য তখনো শান্ত সমাহিত শীতের নদীর মতো। কখনো আবাব তাদের সমস্ত অস্তিত্ব থেকে গতিময়তা স্পন্দিত হচ্ছে, আবার অন্য কখনো গতি ও স্থাণুত্ব একই সঙ্গে সমুপস্থিত।

আশ্চর্য সৃষ্টিশীল এই মানুষটি বন্ধু-সখা-সহচর পরিবৃত্ত থাকতে পছন্দ করতেন। বরাবরই ঈষৎ ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ; তাঁর সহধর্মিণী সর্বদা চেষ্টা করে গেছেন তাঁকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করতে, কখনো তিনি বন্দী হতে রাজি হয়েছেন, কখনো নিজের খুশিতে এক প্রজ্ঞা থেকে আরেক প্রজ্ঞায় বিচরণ করে বেড়িয়েছেন। তাঁর সংগঠন-প্রতিভার মস্ত সাক্ষ্য বহন করছে দিল্লির গাড়হি অঞ্চলে যে-সমবায়-ভিত্তিক শিল্পপ্রাঙ্গণ ভালোবাসা উজাড় করে তৈরি করেছিলেন, সেই প্রাঙ্গণ। সারাজীবন ধরে শঙ্খ চৌধুরী সৌন্দর্যের সাধনা করে গেছেন। আমাদের মরচে-পড়া, ঝিমধরা গার্হস্থ্য-যাপনের আনাচে-কানাচে কী করে শাদামাটা উপকরণ দিয়ে ঈষৎ নন্দিত করা যায়, তা নিয়ে অহরহ চিন্তা-ভাবনা করেছেন, বারবার ছুটে গেছেন আদিবাসীদের ঘরকন্নার বৃত্তে প্রেরণা সংগ্রহের লক্ষ্যে সেই প্রেরণা থেকে উৎসারিত ধারণাগুলি তথাকথিত সভ্য সংস্কৃত সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ায় প্রয়াসবান থেকেছেন। তাঁর মাপের মানুষ গণ্ডায়-গণ্ডায় কোনো দেশেই জন্মগ্রহণ করেন না। সারা ভারত তথা বিশ্ব চষে বেড়িয়েছেন, কিন্তু পাবনা-ঢাকা-শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে সরে যাননি কখনো। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা জুড়ে

যে-ভূখণ্ড, সেই গোটা বাংলাকে, বাংলা ভাষা তথা বাংলা গানকে, নিবিড় করে ভালোবাসতেন। বঙ্গভূমি থেকে একদা ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু নাড়ির টান অক্ষত ছিল, এবং, গোড়ায় যে-কথা বলেছি, আজ পর্যন্ত তিনি দুই বাঙালির অন্যতম যিনি জাতীয় ললিত কলা আকাদেমির সভাপতি হিশেবে সম্মানিত হয়েছেন।

তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে ভেবেছিলাম পশ্চিম বাংলার বিদগ্ধ মানুষজন গভীর বিয়োগব্যথা অনুভব করবেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করা হবে, এখানে-ওখানে স্মরণ সভা আয়োজিত হবে।

ও হরি, কিছুই হলো না। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, বরোদা এবং অন্যত্র তাঁর প্রয়াণসংবাদ বড়ো করে প্রকাশিত হলো খবরের কাগজে অনেকটা জায়গা জুড়ে। প্রধান-প্রধান শহরে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন। বাংলা ভাষায় যাকে আমরা বলি পাণ্ডববর্জিত, তেমনধারা জায়গা জম্মু শহরে পর্যন্ত স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো! একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিম বাংলা। ছোটো করে কলকাতার একটা-দুটো কাগজে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হলো। বেশির ভাগ কাগজে তা-ও না।

কলকাতায় এত-এত ভারি-ভারি সরকারি-বেসরকারি সাংস্কৃতিক সংস্থা, কারো কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, কেউই একটি অতি সাধারণ শোকসভার আয়োজন পর্যন্ত করলেন না। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা শুধু নিজেদের মতো করে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করলেন।

সংস্কৃতির বড়াই করি আমরা পশ্চিম বাংলায় কলকাতায়। কিন্তু শঙ্খ চৌধুরীর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর অমার্জনীয় বিচ্যুতি থেকে অন্য অভিজ্ঞানে পৌঁছুতে হয়। এমন নয় যে যা ঘটছে তা নিছক কূপমণ্ডূকতা: আমরা পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা রাজ্যের বাইরে যা-কিছু ঘটে থাকে, তাতেই উদাস থাকি, এমন তো নয়।

মুম্বই-দিল্লি-ব্যাঙ্গালোরের ফ্যাশানের হালচাল নিয়ে, ও-সব অঞ্চলের ফিল্মি নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে, একেবারে হালের চটুলতম হিন্দি গান নিয়ে, আমাদের তো উৎসাহের অভাব নেই। তা ছাড়া, যে-সপ্তাহে শঙ্খ চৌধুরী চলে গেলেন, সেই সপ্তাহেই মুম্বইতে প্রয়াত হয়েছেন বাঙালি এক চলচ্চিত্র পরিচালক। সেই প্রয়াণ উপলক্ষে বাঙালির শোকের আবেগ ঝরনার মতো দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়লো। আসল রহস্য হয়তো এখানেই। মার্গসঙ্গীত-চিত্রকলা-ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে তথাকথিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহল আর তেমন আগ্রহী নন। রুচি নিম্নগামী, ঠুনকো ব্যাপারস্যাপার নিয়েই আপাতত আমরা মাততে ভালোবাসি, আমাদের দৌড় ওই চলচ্চিত্র উৎসব-গোছের ভুজুং-ভাজুং পর্যন্ত, যেখানে হুজুগই প্রধান। এমনকি যে-পণ্ডিতকুল কলকাতার বিভিন্ন বিজ্ঞমঞ্চে বিদেশি বই ও নামের ফুলঝুরি ছড়ান, আমার সন্দেহ, তাঁদের জ্ঞানের ভাণ্ডার ওই নামবৃত্তান্তেই সীমিত।

আর যা যোগ করতে হয়, শঙ্খ চৌধুরী মানুষটি বিদেশি হলেও কথা ছিল। কে কোন বাঙালি ভাস্কর দিল্লির এক হাসপাতালে মারা গেলেন, তা নিয়ে আমরা অযথা কেন হৈ হল্লা করতে যাবো।

কী বলবো একে, অজ্ঞতাজনিত দম্ভ, না কি অগ্রগামী নিরক্ষরতা?

তাঁর সময় আর এলো না

যে-কোনো দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনেতিহাসে কিছু-কিছু ব্যক্তির বিশেষ ভূমিকা না মেনে উপায় নেই। ইতিহাস তার অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী বিবর্তিত হবে, সমাজের বিবর্তন ঘটাবে, কিন্তু কোন গতিতে একটি বিশেষ সংস্থান থেকে ইতিহাস অন্য কোনো দিকে মোড় নেবে, পরিবর্তিত সমাজের আদর্শ কী রকম হবে তন্মুহূর্তে এ-সমস্তই, সামান্য পরিমাণে হলেও, আকস্মিক কতিপয় ঘটনাবলির উপর নির্ভরশীল। ইতিহাসের প্রবহমানতা পাল্টাচ্ছে না, ব্যাহত হচ্ছে না, তবে যতিপতনে, যতিসমাপ্তিতে খানিকটা হেরফের ঘটছে। এই প্রসঙ্গে মার্ক্সের অন্তত এটা ধ্রুব বিশ্বাস ছিল ব্যক্তির ভূমিকা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। ঘটনা ঘটে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের চাপে, তবে বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় এই সংঘটনের কাণ্ডারী রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন।

আবুল হাশিম চল্লিশের দশকে বাংলাদেশে এধরনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনাবিবর্তনের মুখ্য পুরুষ ছিলেন। অবশ্য এখানেও ইতিহাসের বিচিত্র রঙ্গ। যে-উদ্দেশ্যে আবুল হাশিম রাজনীতির মঞ্চে সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁর সিদ্ধি তা থেকে অনেকটাই

দূরবর্তী। আবুল হাশিম যা চেয়েছিলেন, রাজনীতির অঙ্গনে কয়েক বছর বিহার করার পর আবিষ্কার করলেন, তা অধরাই থেকে গেছে, তাঁর হাত থেকে কে বা কারা কখন যেন ইতিহাসের দায় তুলে নিয়ে গেছে। তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তা বলে জনগণকে-জড়ানো-আন্দোলনে ব্যক্তিগত দখলদারির তো প্রশ্ন নেই। আন্দোলনের ধারা হাশিম সাহেবের ইচ্ছা-লক্ষ্যকে পাশে সরিয়ে রেখে ভিন্নতর পথে অনেক এগিয়ে গেছে। এই অনাচারী অগ্রগামিতার যাঁরা নায়ক, তাঁরাই পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব-গৌরব করায়ত্ত করলেন, আবুল হাশিম সেই মুহূর্ত থেকে ইতিহাসে উপেক্ষিত।

উপরের বক্তব্যের হয়তো ঈষৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আবুল হাশিমের পিতা আবুল কাসেম বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-তিন দশক ধরে বর্ধমান জেলার জমিদারদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎ পৌত্র যে একদা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গতি-প্রকৃতি-পরিণামের বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ করে শিরোপা কুড়োবেন, তা অবশ্য আবুল কাসেমের ভবিষ্যৎদর্শনের শরীরে কোনো ছায়া ফেলেনি, বৈজ্ঞানিক কারণেই ফেলেনি। কাসেম সাহেবের বর্ধমান-বীরভূম জুড়ে জমিদারি ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে প্রজাপীড়ন বলে যে একটা ব্যাপার থাকতে পারে, তাঁর মতো জমিদারশ্রেণিভুক্তেরা যে প্রজাপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন, সে-সব প্রশ্ন নিয়ে কাসেম সাহেবের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তবে যে-যে ক্ষেত্রে সাধারণ কৃষককুলের আন্দোলনের সঙ্গে জমিদারদের শ্রেণিস্বার্থের উপস্থিত মুহূর্তে কোনো বৈরিতা দেখা দিত না, উদাহরণত দামোদর নদীর জলবণ্টনের ব্যাপারে, আবুল কাসেম নিজেকে গুটিয়ে রাখেননি; হিন্দু জমিদার ও প্রজাকুলের দাবিদাওয়া সোচ্চারে সমর্থন করেছেন। তা ছাড়া প্রতিপত্তিশালী মুসলমান জমিদার, জেলা জুড়ে মুসলমান

প্রজাকুলের তিনি তখন ভরসাস্থল, দরকার মনে করলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি পেশ করতে পারতেন, যে-অভিযোগের তির্যক শিকার ছিলেন তাঁর পড়শি হিন্দু জমিদাররা। জমিদার হিশেবেও তাই আবুল কাসেম না ঘরকা না ঘাটকা।

পুত্র আবুল হাশিম পিতার অবস্থান থেকে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন। ছাত্রজীবনে তিনি কিছু সময় মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে ভেসে গিয়েছিলেন, তারপর নিজের মতো করে পড়াশুনা করেছেন, বর্ধমান শহরে বিবিধ সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রমুখ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের প্রভাবে বেশ কিছু বামপন্থী চিন্তাসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। দাশরথি তা-ফকিরচন্দ্র রায়-বিনয় চৌধুরীদের সঙ্গে প্রায়ই ভাগচাষি-ক্ষুদ্র চাষিদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাদের স্বার্থ-সম্প্রসারণে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন পর্যন্ত।

কিন্তু একটি দ্বান্দ্বিক সমস্যায় দীর্ণ হতে থাকলেন আবুল হাশিম। ইতিহাসের ঝোঁকটা কোন্ দিকে তা অনুমান করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় আজ বাদে কাল নিশ্চিহ্ন হবে সে সম্পর্কে তিনি স্থির নিশ্চিত, কিন্তু বিবেকবান মানুষ, নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হলে তো তাঁর চলে না, নিরন্ন-নিরক্ষর-অপুষ্টি-সমাচ্ছন্ন প্রজাকুলের কথাও তাঁকে ভাবতে হবে, বিশেষত মুসলমান প্রজাকুলের কথা। বাংলাদেশে কংগ্রেস দল প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু উচ্চ-মধ্যবিত্তদের করায়ত্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রজাকুলের হয়ে লড়াইয়ের লক্ষ্যে যবনিকার আড়ালে কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারীরা নিজেদের প্রস্তুত করছেন। কিন্তু মুসলমান ভূমিহীন কৃষক-ভাগচাষি-ছোটোচাষিদের আর্থিক-সামাজিক বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বা হতে পারে?

কমিউনিস্ট পার্টিতে, চল্লিশের দশক পর্যন্ত, হিন্দু জমিদার-জোতদারদের বংশসঞ্জাত কর্মীদের প্রাধান্য. তাঁরা যতই আন্তরিক হোন না কেন, শোষক-বংশোদ্ভূতরা হঠাৎ উদ্ধার কর্মীর ভূমিকায় উদয় হলে সমস্যা থেকেই যাবে, প্রতিরোধ-সংগঠনের কাজ তেমন এগোবে না।

বাধ্য হয়ে আবুল হাশিমকে তাই বিকল্প পথের অনুসন্ধান করতে হলো। বর্ধমান জেলার বাইরে এতদিন তিনি তেমন পা বাড়াননি। অথচ এটা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি যে সারা বাংলাদেশ জুড়ে যে-অস্থিরতা রচিত হয়েছে, বর্ধমান তা থেকে যেমন বিশ্লিষ্ট থাকতে পারে না, তেমনি তাঁকেও নিজের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। প্রদেশের সর্বত্র যা ঘটছে-না ঘটছে তা থেকে পূর্বাহ্ণে শিক্ষাগ্রহণ জরুরি। ফজলুল হক সাহেব প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হিশেবে ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী চার বছর যুগান্তকারী কতগুলি সংস্কার সাধনে সফল হয়েছিলেন দাদন আইন-খাতক আইন পাল্টে কৃষিজীবীদের সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার করা হলো, যার ফলে সবচেয়ে উপকৃত হলেন গরিব মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়। চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। সংস্কারের ঐতিহাসিক উপযোগিতার বিশ্লেষণে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চরম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিল। পিছিয়ে-থাকা সমাজভুক্তদের উন্নতির জন্য ফজলুল হক-প্রবর্তিত সংস্কারগুলির গুণগত বৈশিষ্ট্য অপরিমেয়, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্তাব্যক্তিরা—তাঁদের মধ্যে হিন্দু মহাসভা শুধু নয়, কংগ্রেস দলের চাঁইরাও ছিলেন—বাঙালি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই ব্যবস্থাগুলির কত প্রয়োজন, তা অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হলেন। (এখন ভেবে আশ্চর্য লাগে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীও ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, তা

ছাড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ও সাহায্য যিনি জীবনভর পেয়ে এসেছেন, তিনিও এই বছরগুলি বৌদ্ধিক যুক্তির ধারে-কাছেও না গিয়ে কী ভয়ংকর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাব স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন। যদি কেউ ওই বছরগুলির 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'-র বাঁধানো সংখ্যাগুলি পেড়ে পড়েন, সঙ্গে-সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে তাঁর উপায় থাকবে না : বাংলাদেশে দ্রুত সাম্প্রদায়িকতা বোধ ছড়ানোর জন্য মুসলিম লীগকে আলাদা করে দোষী সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত, পাশাপাশি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বোধকেও সমান দায়ী করতে হয়।)

আবুল হাশিম গোটা বাংলাদেশের দিকে যখন তাকালেন, বুঝতে পারলেন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে কংগ্রেস দলের কেষ্টবিষ্টুদের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ফজলুল হক মুসলিম লীগে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তবে সেখানেও দ্বান্দ্বিকতার কাহিনী : মুসলিম লীগের সংগঠন ইতিমধ্যেই উগ্রপন্থীদের হাতে চলে গিয়েছে, এই উগ্রপন্থীরা আর্থিক ক্ষেত্রে ফজলুল হক কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারমালাকে সমর্থনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে, বড়োলোক-ঘেঁষা একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে লালন ও বর্ধন করতে উদগ্রীব। ফজলুল হক কর্তৃক অনুসৃত নীতি-নির্দেশের ফলে সারা প্রদেশ জুড়ে এক নতুন সম্পন্ন বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সম্ভব হলো। এঁদের সংস্থান ঠিক ভূম্যধিকারভিত্তিক নয়, সরকারি-বেসরকারি নানা বৃত্তিতে তাঁরা ছড়িয়ে পড়া পেশাধারী। তাঁরা ইতিমধ্যে নব-নব সুবিধালাভের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন : মুসলিম লীগের সংগঠন যদি আরো শক্তিশালী হয়, তা হলে সেই বর্ধিত শক্তির ভিত্তিতে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের উপার্জন ও সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরো ঢের গুণ বৃদ্ধি পাবে! এরকম ভাবনার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়লো; একটা সময়ে ফজলুল হক অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেলেন। মুসলিম লীগের

মধ্যে গ্রামীণ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মানুষ কমে এলো, শহর-গ্রামের গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিরাম-উর্ধ্বমুখী আবেগ ও উন্মাদনা বাদ দিয়ে মুসলিম লীগের আন্দোলন অবশ্যই কখনো সফল হতে পারতো না; তবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় যা হয়, এই বিপুল জনসমর্থনের সংস্থানে দাঁড়িয়ে মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় তাঁদের নিজেদের আলাদা স্বপ্ন রচনা করলেন। জমিদার-বিরোধী মানসিকতা আর বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা হয়ে রইলো না।

এরই মধ্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর, হৃদয়হীনতার চরম উদাহরণের অধ্যায়ের পর অধ্যায়, বুভুক্ষা-হাহাকার-মৃত্যু। লক্ষ-লক্ষ গরিব মুসলমান দুর্ভিক্ষের শিকার। ১৯৪৪ সালের মধ্যমুহূর্তের এই পটভূমিকায় আবুল হাশিম পাশাপাশি দুটো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এক, বর্ধমান জেলার গণ্ডি পেরিয়ে প্রদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন; দুই, মুসলিম লীগের নেতৃত্বে অনুপ্রবেশ করে লীগের উগ্র সাম্প্রদায়িক ঝোঁকগুলিকে ঈষৎ নিস্তেজ করে অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেবেন; জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে, ফাটকাবাজ-অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লীগাকে সজীব, সোচ্চার করে তুলবেন। আমার সন্দেহ, তাঁর সংগোপনে আরেকটি লক্ষ্য ছিল, হিন্দু জনগণের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের সেতুর পুনর্যোজনা।

মুসলিম লীগের সভ্য সংখ্যা সে-সময় হু-হু করে বাড়ছে। অনেক মতামতের বিনিময়-প্রতিবিনিময়, আবেগ পুঁজি করে কেউ উদ্বেল হচ্ছেন, অন্য কেউ হয়তো যুক্তির রাশ টেনে ধরছেন। তাঁর মতো সৎ-সুশিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে জায়গা করে নেওয়া কঠিন হলো না। (শহীদ সুরাবর্দীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিল, এবং সুরাবর্দী সাহেব সম্ভবত হিশেব কষেছিলেন যে তাঁর এই

আপনজন লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন থাকলে তাঁর নিজের একটু বাড়তি সুবিধাই হবে।)

আবুল হাশিম ঈষৎ বিলম্বে সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেচল্লিশ সালের ষোলোই অগাস্টের ঘটনাবলি সুরাবর্দীর হিশেবই শুধু নয়, আবুল হাশিমের হিশেবও তছনছ করে দিল। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের 'বাঙালি' কর্মসূচি মূলতুবি রইলো, পাকিস্তান ছিনিয়ে নেওয়ার উন্মাদনা বাঙালি মুসলমান মানসে বড়ো জায়গা জুড়ে বসলো। প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকেও সুরাবর্দী তাঁর প্রতিপক্ষদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না, যেমন পারলেন না আবুল হাশিমও। জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় স্তরেই রক্ষণশীল গোষ্ঠী দলীয় ক্ষমতা দখল করলো। সুরাবর্দী ও আবুল হাশিমের জীবদর্শন তথা দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক তফাত ছিল, কিন্তু দুর্বিপাকের মুহূর্তে, সাময়িকভাবে হলেও, তাঁরা কাছাকাছি চলে আসেন। তবে তাঁদের অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে মুসলমান উগ্রপন্থীদের ভাবনার দিক থেকে গলায়-গলায় মাখামাখি। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে সুরাবর্দী ও আবুল হাশিম একটি শেষ চেষ্টা করলেন স্বাধীন সংযুক্ত বাংলাদেশ গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু এই পড়তি জননায়কদের কথা শোনার জন্য কেউ-ই উৎসাহ দেখালেন না।

অনেক চেষ্টার পর সুরাবর্দী অবশ্য পাকিস্তানে সাফল্যের মুখ দেখেন, অল্প সময়ের জন্য হলেও তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। আবুল হাশিমকে কিন্তু আর তেমন করে রাজনীতির খাসমহলে বিচরণ করতে দেখা যায়নি। তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাই তার প্রধান কারণ নয়। ধরেই নেওয়া যায়, পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরের ক্লেদাক্ত, সর্বক্ষণ ষড়যন্ত্র ও হত্যার আতঙ্ক-মণ্ডিত, পরিবেশ আবুল হাশিমের কাছে অসহনীয় ঠেকতো।

স্বাধীনতাত্তোর পর্বে পাকিস্তানে একদা-বর্ধমানের চিন্তাবিদ্ নেতা আবুল হাশিমের অভিজ্ঞতা প্রায় ঘোর নিঃসঙ্গতার। স্বাধীন অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিশেবে শহীদ সুরাবর্দীরই বেশির ভাগ কলঙ্ক কুড়োবার কথা ছিল। তিনি ঝানু রাজনীতিবিদ, আত্মরক্ষার ফন্দিফিকির তাঁর দুরস্ত, ১৯৪৭ সালের সেই প্রাক-স্বাধীনতা অধ্যায়ের অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখতে পারলো না। অন্য পক্ষে আবুল হাশিমকে কেন্দ্র করে অনেক কুৎসা, অনেক অপবাদ বর্ষণ। তাঁর চিন্তাভাবনার বামপন্থী প্রবণতা নিয়ে কারো যে খুব মাথাব্যথা ছিল তা নয়। কিন্তু তিনি যে হিন্দু-ঘেঁষা, মাঝে-মধ্যে ধুতি পরতে খেয়াল-খুশি হয় তাঁর, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান যাতে গঠিত না হতে পাবে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি অবশ্যই হিন্দু নেতাদের সঙ্গে একত্র হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, ঢিঢিক্কারের বন্যায় ভেসে গেলেন আবুল হাশিম। আসলে এই ধর্মপরায়ণ মানুষটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব-সাধনাকে মেলাতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর এই লক্ষ্যে একবার-দু'বার ঈষৎ সাংগঠনিক চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউই ছিলেন না।

তবে আমার এই বিশ্লেষণ নেহাতই একজন দূরবর্তী পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এমন হতে পারে আমার সম্পাদ্য-প্রতিপাদ্য অনেকাংশেই ভুল। তা হলেও এই অনুভব এখনো, অর্ধশতাব্দীর দুস্তর সময়ব্যবধান সত্ত্বেও, আমাকে তাড়া করে ফেরে : আবুল হাশিম বাংলাদেশকে, পূর্ব পাকিস্তানকে, আরো অনেক-কিছু দিয়ে যেতে পারতেন, ইতিহাসের পরিহাসে সে-সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত রইলেন।

বাংলা গদ্যের যুগ্ম পিতৃত্ব

ইতিহাস বড়ো একপেশে হয়। কারণটি স্পষ্ট। যাঁরা সমাজচূড়ামণি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পছন্দমতোই ইতিহাসচর্চা, সাধারণত সেই চর্চার ফলাফলই লোকগোচর করা হয়ে থাকে। অন্য দিকে যাঁরা একটু অন্তরালে থেকে নিজেদের মতো করে ইতিহাস অধ্যয়ন বা বিদ্যাচর্চা করেন, তাঁদের কৃতিত্ব সমাজের কাছে ঠিক ধরা পড়ে না।

বাংলা সাহিত্য ও ভাষাচর্চা নিয়েও প্রায় একই রকম উক্তি করা সম্ভব। উনবিংশ শতকের শুরু থেকে স্বাধীনতা তথা দেশভাগের মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাভাষী মানুষজনের রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি জড়িত সমস্ত প্রয়াসই কলকাতা-কেন্দ্রিক ছিল, অন্তত সাধারণ মানুষজনের কাছে তেমনটাই মনে হয়েছে, অন্য কোনো ধারণা হওয়ার উপায় ছিল না : কলকাতা জুড়ে, কলকাতা ঘিরে রাজনৈতিক সামাজিক আলোড়ন সত্য, তার উপর কিছু নেই। এমনটা হতো যেহেতু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তাদি পর্যন্ত কলকাতার মুখ চেয়ে, কলকাতার স্বার্থে হওয়াটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যে-ব্যক্তিবর্গ কলকাতায় তলোয়ার ঘোরাতেন, এমনকী মসিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও যাঁরা ঘোরাতেন, তাঁরা আলোকবর্তিকার সম্মুখবর্তী থাকতেন।

অথচ উল্লিখিত পুরো সময়টা জুড়েই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে ঢাকার ভূমিকা তেমন-কিছু ফেলনা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একটা সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে ঢাকা থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' পত্রিকা প্রায় সমানে টেক্কা দিত। বেশ কয়েক যুগ পেরিয়ে প্রায় অনুরূপ বিভঙ্গে, বুদ্ধদেব বসু-অজিত দত্তদের 'প্রগতি' দীনেশরঞ্জন দাশ-গোকুল নাগদের 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সম্মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তা ছাড়া ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করে যে-সাহিত্য ও গবেষণাচর্চার বিস্তার ঘটে, সেদিকে তেমন খেয়াল কলকাতাস্থ কেউই রাখেননি, তাঁদের উন্নাসিকতা তথা স্বভাবউদ্ধত মানসিকতা হেতু। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে গোড়াতেই ছিলেন খোদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আর ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে ('বাংলার প্রবাদ' রচয়িতা প্রবাদপ্রতিম সুশীলকুমার দে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, বাংলা এবং সব শেষে বাংলা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান মনোনীত হয়েছিলেন), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, জসীমউদ্দিন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, গণেশচরণ বসু। এঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে কোনো-না-কোনো সময়ে সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছেন ইতিহাস বিভাগের রমেশচন্দ্র মজুমদার ও কালিকারঞ্জন কানুনগোর কাছ থেকে, ঢাকা জাদুঘরের অধ্যক্ষ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর কাছ থেকেও। সেই সঙ্গে একটি বিশেষ পর্বে তাঁদের উৎসাহ জুগিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

এই সব দিকপাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে মৌলিক গবেষণার

যে-বিরাট পলিভূমি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তার ঐতিহ্য কিন্তু আজও অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। দেশভাগের মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যিনি তরুণতম শিক্ষক ছিলেন, আবদুল হাই, মুখচোরা স্বল্পবাক মানুষ, তিনি এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ, পূর্ব পাকিস্তান যুগের নানা প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে, বাংলা ভাষার ক্রমানুক্রমিক ইতিহাসের গহনে ঢুকে গিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অতীত অধ্যায়ের বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে সতত প্রয়াসবান থেকেছেন। আর ঢাকা থেকে বিদায় গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে লোকসাহিত্য-সহ বাংলা ভাষার বিবিধ সম্পদ নিয়ে তন্নিষ্ঠ গবেষণাকর্মে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য ও গণেশচরণ বসু মহাশয়দ্বয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা তুখোড় ছাত্র ভবতোষ দত্ত পরবর্তী সময়ে তাঁদের সান্নিধ্য জুগিয়েছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি তানাশাহির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে যাঁরা পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে টিকিয়ে রেখেছিলেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর উন্মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনতাপূর্ব পর্বের ঐতিহ্যকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্র সব মিলিয়ে অনেকটাই ফিকে ও নির্জীব মনে হয়। সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয়, অতি প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কাঁড়ি-কাঁড়ি, ছোটো-বড়ো-মাঝারি মাসিক-ত্রৈমাসিক-ষাণ্মাসিক-বার্ষিক পত্রিকা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি বাংলা আকাদেমি, আর বছর জুড়ে, বছর ঘিরে, দাপিয়ে বইমেলার পর বইমেলা। কিন্তু গোটা সমাজব্যবস্থায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে শ্রদ্ধা, সেই সঙ্গে ভাষাপ্রেম, প্রায় অবলুপ্ত। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বিশ্বায়নজড়িত সমৃদ্ধির আলেয়ার পিছনে আপাতত ধাবমান, মাতৃভাষা নিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করে কী লাভ, তার চেয়ে মার্কিনি ধাঁচে ইংরেজি বলা-কওয়া রপ্ত করতে পারলে

স্বর্গোদ্যানে উপনীত হওয়া অনেক বেশি সম্ভবপর, মোটামুটি এরকমই এখানকার এখনকার ধ্যানধারণা। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা একটি আস্ত বাংলা বাক্য পর্যন্ত বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে না।

এমন নয় যে, কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ভিত্তিক প্রথামাফিক গবেষণা-বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা ইত্যাদি আদৌ হচ্ছে না। কিন্তু অনেকটাই মনে হয় দায়সারা, হয় চর্বিতচর্বণ, নয় তো পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পাওয়ার ব্যবহারিক প্রয়োজনে, যেমন-তেমন করে যান্ত্রিক নিয়মে কণ্ডুয়ন।

আমরা মানতে চাই কি না চাই ইতিহাসের বিচারে কিছু যায় আসে না, বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় কিন্তু ইতিমধ্যে তুলনায় আরো অনেক গভীরতা এসেছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাংলা একাডেমী ওখানে আমাদের অনেক আগে স্থাপিত, সেই গবেষণাকেন্দ্র ঘিরে অজস্র কর্মকাণ্ডের বিস্ফোরণ অব্যাহত থেকেছে, আছে। তবে কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাতেই নয়, ব্যক্তিগত কিংবা বেসরকারি উদ্যোগেও মাতৃভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রচুর গবেষণাকর্ম বাংলাদেশে চলছে। তার অন্যতম সাক্ষাৎ প্রমাণ পেলাম ঢাকাস্থ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র নামক সংস্থা থেকে প্রকাশিত মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ : অক্ষয়কুমার দত্ত' গ্রন্থটি হাতে পেয়ে। কলকাতায় অনেক ঢুঁড়লে হয়তো কোনো প্রকাশকের দুয়ার থেকে পুরোপুরি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হবে না, অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থাবলির জীর্ণ-হয়ে-যাওয়া পোকায়-কাটা একটি-দুটি খণ্ডের হদিশ পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে এখানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা আদৌ কেউ করেছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই। অক্ষয়কুমার সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের লেখককুল কর্তৃক রচিত হয়েছে, কিন্তু কী আশ্চর্য, তা-ও এক সঙ্গে জড়ো করে সম্পাদনা করেছেন ফের সেই মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম ('অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ', রেনেসাঁস)।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষাচর্চায় কোনো শুচিবাই নেই, কোনো ধর্মীয় বা অন্য গোষ্ঠের সংস্কার নেই, এক ধরনের নির্মোহ অপক্ষপাতী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মাতৃভাষার সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রবহমানতা নিয়ে গবেষণা অক্লান্ত চলছে। যে-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এই চিকীর্ষার একটি বড়ো কারণ সম্ভবত তার অন্তঃস্থলে প্রোথিত। পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম মাতৃভাষার সম্মান ও অধিকার রক্ষার্থে একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধের সফলতার পরিপূরক হিশেবেই যে-মস্ত সাহিত্য তথা ভাষাকেন্দ্রিক গবেষণার আসর বসেছে, তাকে বিচার করলে বাংলাদেশে মাতৃভাষা রক্তে বোনা ধানের মতোই মহার্ঘ।

'শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ . অক্ষয়কুমার দত্ত' গ্রন্থে বিভিন্ন হারিয়ে যেতে বসা পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের চোদ্দোটি ছোটো-বড়ো প্রবন্ধ জড়ো করা হয়েছে। জড়ো করেছেন মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি সেই সঙ্গে অতি উৎকৃষ্ট, সুচিন্তিত একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন।

এমনই ভয়ঙ্কর সময়বৃত্তে আমরা উপনীত, পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও নাম পর্যন্ত জানেন না। সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অবশ্যই শূন্য। অথচ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি পড়ে চমকে উঠতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একান্ত সমসাময়িক অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁদের জন্ম একই সালে, মৃত্যুও খুব কাছাকাছি সময়ে। বাংলা গদ্যের জনক হিশেবে আমরা বিদ্যাসাগরকে সঙ্গত কারণেই বরাবর সম্মান জানিয়ে এসেছি। তবে ওই একই সময়ে, প্রধানত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার

মধ্যবর্তিতায়, অক্ষয়কুমার দত্ত যে-গদ্য রচনা করে গিয়েছেন, তাতে এই দাবি পেশ করা অন্যায় হবে না যে, তিনিও আধুনিক বাংলা গদ্যের যুগ্ম পিতৃত্বের অধিকারী। সম্ভবত বিদ্যাসাগর যতটা কর্মযোগী ছিলেন, অক্ষয়কুমার দত্ত ততটা নন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক রূপে তাঁর প্রয়াসাদি ওই পত্রিকাতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থেকেছে। অথচ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখুন, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর গদ্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের চেয়েও সচ্ছলতর, স্বচ্ছতর। হয়তো সংস্কৃতের অলংকার-ভার একটু কম বলেই। কিন্তু ভাষাসৌকর্যের প্রসঙ্গ যদি পাশে সরিয়ে রাখাও যায়, আমাদের চমকিত হওয়ার উপকরণ তেমন-কিছু হ্রাস পায় না। অক্ষয়কুমার দত্তের বিষয় নির্বাচনে মুগ্ধ বোধ না করে উপায় নেই। তিনি শুধু বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরের পাশে থেকে জোরালো বক্তব্য পেশ করেননি, বাল্যবিবাহ নিয়েও সমান প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ওই প্রথার প্রতি ধিক্কারে তাঁর কলম বিস্ফোরকের মাত্রা পেয়েছে। তাঁর সমাজভাবনার ব্যাপ্তি বিদ্যাসাগরের চিন্তার গণ্ডি পেরিয়ে আরো অনেক প্রাগ্রসর। বিদেশি প্রভুদের চাপিয়ে-দেওয়া বিচারব্যবস্থার অবিচার নিয়ে তিনি তীব্র ভাষায় নির্ভীক বক্তব্য রেখেছেন, বঙ্গদেশ তথা কলকাতার সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা নিয়ে ব্যাকুলতায় দীর্ণ হয়েছেন, মাতৃভাষায় বিদ্যাচর্চার পক্ষে এমন সব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, যা প্রতিহত করতে গিয়ে হালের বিশ্বায়নওলারা হালে পানি পাবেন না। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের কীর্তি নিয়েও বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা করেছেন অক্ষয়কুমার, কিন্তু আমাকে যা সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে তা তাঁর একটি বিশেষ প্রবন্ধ, 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গোটা বাংলায় যে-শোষণ ও অত্যাচারের যুগ সূচনা করেছিল, যা নিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ-অতুলচন্দ্র গুপ্ত-আবদুল

হালিম-গোপাল হালদার থেকে শুরু করে রণজিৎ গুহ-বদরুদ্দিন উমর-রা গণ্ডা-গণ্ডা সমালোচনায় মুখর হয়েছেন, সেই সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ নিশ্চয়ই এই প্রবন্ধে বিধৃত। সমান বিস্ময়দ্যোতক সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার অন্য একটি বিবরণ তথা বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ : 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার'। মুহম্মদ সাইফুল ইসলামকে যথার্থই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। তিনি অতি তরুণ বয়স থেকে অক্ষয়কুমার দত্তে ব্যাপৃত হয়ে আছেন, এখনো তারুণ্যের উপত্যকা তিনি পেরিয়ে আসেননি। তা হলেও মাত্র কয়েকটি বছরের নিবিষ্টতায় গবেষণার যে-অবৈকল্য তিনি দৃষ্টান্তিত করেছেন, তা থেকে, হায়, যদি পশ্চিমবঙ্গে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতেন!

এক শতাব্দী পিছিয়ে

গত শতকের তিরিশের দশকের গোড়ার দিক। আমাদের এঁচোড়ে-পাকা শৈশব, গুরুজনদেব দৃষ্টি এড়িয়ে পাঁচকড়ি দে মহাশয়েব 'নীলবসনা সুন্দরী' এবং, সেই সঙ্গে, দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'রূপসী মরুবাসিনী' গোগ্রাসে গিলছি। সহসা আবছা হওয়াব নয় সে-সব দিনের স্মৃতি। বছর গড়িয়ে গেছে, আমবা ক্রমশ প্রাজ্ঞ হয়েছি, ঈষৎ আশ্চর্য লেগেছে জেনে যে 'রহস্য লহরী' সিরিজে লিখে দীনেন্দ্রকুমার জীবিকার সংস্থান করতেন মাত্র। তাঁর তন্নিষ্ঠ সাহিত্যচর্চা সম্পূর্ণ আলাদা আবাদি ভূমিতে। মাসিক বসুমতী ও অন্যান্য পত্রিকায় গত শতকের প্রথম কয়েক দশক জুড়ে বাংলাদেশের বহু গ্রাম-বৃত্তান্ত প্রবন্ধের আকারে তিনি লিপিবদ্ধ করতে তৃপ্তি পেতেন, এই প্রবন্ধগুলি রচনা কবার মুহূর্তে তিনি তথ্য ও আবেগের যে-মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তাকে এই প্রায় একশো বছর পেরিয়ে আসার পরও, অনাবিল শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থ 'প্রবন্ধসংগ্রহ'-এ দীনেন্দ্রকুমারের আলাদা-আলাদা প্রকাশিত তিনটি পল্লী-বিষয়ক গ্রন্থ একত্র সন্নিবেশিত হয়েছে : 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীবৈচিত্র্য', 'পল্লীকথা'। সেই সঙ্গে সংযোজিত তাঁর অতি সাবলীল জীবন-উপাখ্যান, 'সেকালের স্মৃতি'।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রায় পঁচিশ বছর আগে 'পল্লীচিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্য' বই দুটি যখন প্রকাশ করে, উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই সুকুমার সেন ভূয়সী প্রশংসাসূচক ভূমিকা রচনা করে দিয়েছিলেন। উভয় গ্রন্থেই দীনেন্দ্রকুমারের বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও বিবরণ বিন্যাসের ভূরি-ভূরি প্রমাণ ছড়ানো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা বই দু'টিতে ঠাসা। সুকুমার সেন সে দিন যে-কথা বলেছিলেন—'যাঁদের গবেষণার টেনডেন্সি আছে, তাঁরা হয় তো এতে একাধিক থিসিসের — সমাজনীতির, অর্থনীতির, নৃতত্ত্বের, ফোকলোরের — রসদ পাবেন', দ্বিধাহীন চিত্তে তা সমর্থনযোগ্য। তা ছাড়া যাঁরা নিছক বাঙালি হিশেবে পুরানো দিনের কথা, পুরনো আমলের পল্লী বাংলার পরিবেশের আদলের স্বাদ পেতে চান, তাঁদের কৌতূহল মেটাবার মতো প্রচুর রসদের জোগান রয়েছে গ্রন্থদ্বয়ে। 'পল্লীকথা'-ও একই প্রাঙ্গণে বিচরণকারী, এখানেও গ্রাম বাংলার সামাজিক সমস্যা নিয়ে অনেক অনুপুঙ্খ বিবরণ, তবে সেগুলি কাহিনীর মোড়কে বাঁধা, গল্প বলার ঢঙে বলা। সব মিলিয়ে শতাধিক বছর আগে পল্লী-প্রান্তরের চলচ্চিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, বাংলা ও বাঙালির বারো মাস-তেরো পার্বণের প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, এবং সামাজিক মানুষজনের হরিষ-বেদনার মরমী বৃত্তান্ত।

তবে একটু খটকা থাকে, দীনেন্দ্রকুমার স্বয়ং উল্লেখ করেছেন, যে-সময়ের কথা লিপিবদ্ধ হচ্ছে, তখন গোটা বাংলার জনসংখ্যা সাত কোটির মতো। তার মধ্যে, নিশ্চিন্তে বলা চলে, অন্তত সাড়ে ছয় কোটিই গ্রামবাসী। তাঁদের মধ্যে, কী-ই করে অস্বীকার করি, অন্তত অর্ধেক নিশ্চয়ই মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অথচ দীনেন্দ্রকুমার যে চিত্র-বিচিত্রতার পল্লীকাহিনী আমাদের জুগাচ্ছেন, তার গলিঘুঁজিতেও মুসলমান গ্রামবাসীদের আদৌ উল্লেখ নেই, একবারের জন্যও নেই,

যেন তাঁদের অস্তিত্বই নেই। পালা-পার্বণের বৃত্তান্ত সমস্তই হিন্দু ধর্মের আচারিত বিধিব্যবস্থা নিয়ে। ধর্ম যেখানে সামাজিক সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে, সেখানেও কিন্তু সমাজের অন্যতম প্রধান অংশ, মুসলমান সম্প্রদায়, অনুল্লিখিত, অনুপস্থিত। পড়তে ভালো লাগে, জানতে ভালো লাগে, কিন্তু যা পড়ছি বা যা জানছি, দীনেন্দ্রকুমারের পরম অনুরাগীও বুকে হাত দিয়ে মানতে বাধ্য হবেন, সে-সব খণ্ডিত কাহিনী। এবং এ হেন খণ্ডকাহিনীর পরিণতি যে-কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, সে-সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা কিংবা কল্পনাশক্তি তৎকালীন সমাজপতিদের ছিল না। দীনেন্দ্রকুমার রায়কে সার্বিক শ্রদ্ধা জানিয়েও তাই রায় দিতে হয়, তিনি একান্ত হিন্দু পল্লীর আকার-প্রকার নিয়ে লেখা-জোখা করেছেন মাত্র। হায়, তা যদি না করে তিনি সমগ্র পল্লীসমাজের কাহিনী বুনতে ব্যাপৃত হতেন, হয়তো বিংশ শতাব্দীর বাঙালির ইতিহাস একটু নয়, অনেকটাই অন্য রকম হতো।

সামান্য মন খারাপ নিয়ে দীনেন্দ্রকুমার কথিত পল্লীবৃত্তান্ত পেরিয়ে তাঁর 'সেকালের স্মৃতি'-তে মনোনিবেশ করে অথচ একটি বিমল আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া গেল। সুসহজ ভাষ্যে, অহমিকাহীন মন নিয়ে দরিদ্র পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর বেড়ে ওঠার, বড়ো হয়ে ওঠার জীবনে সীমিত সফলতা পাওয়ার বর্ণনা এই স্মৃতিকথায় পরিব্যাপ্ত। নিজের পরিবারের কথা, যে-যে গ্রামে ও বিদ্যালয়ে শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত করেছেন, তাদের কথা, সহপাঠী তথা শিক্ষকদের কাহিনী, বিখ্যাত মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বৃত্তান্ত, জীবনে যাঁদের কাছে সমাদর ও উৎসাহ পেয়েছেন—জলধর সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীঅরবিন্দ (যাঁকে দীনেন্দ্রকুমার বরোদা গিয়ে দু'বছর বাংলা পড়িয়েছিলেন)—কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ : সব মিলিয়ে ভারি হৃদয়স্পর্শী এই স্মৃতিকাহিনী। শুধু তখনকার গ্রামের

ছবিই নয়, কলকাতার মতো মস্ত বড়ো বা কৃষ্ণনগরের মতো মাঝারি শহরের আচারকলা, হাল-হকিকত সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা ছেঁকে নেওয়া যায় এই স্মৃতি-বৃত্তান্ত থেকে। মজা লাগলো ঘোর ছেলেবেলায় যে খেমটা গানের চরণ শুনে মোহিত হয়েছিলাম, 'সেকালের স্মৃতি'তে হঠাৎ ফের দেখা পেয়ে 'মালতী মালতী মালতী ফুল, / মজালে মজালে মজালে কুল।'

অবশ্য দীনেন্দ্রকুমারকে বিচার করতে হয় তাঁর সময়ের প্রেক্ষিতে। তিনি কৃষ্ণনগরে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই পরিবারের কেউই তেমন দীর্ঘজীবী ছিলেন না, এই পর্যন্ত বৃত্তান্ত ঠিক আছে, কিন্তু তার পরই দীনেন্দ্রকুমারের নিম্নলিখিত সমাজ সিদ্ধান্ত 'অনেক বিলাত-ফেরতের পরিবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে, যাঁহারা সাহেবীয়ানার ভক্ত, বিলাতী প্রথায় জীবনযাপন করেন, তাঁহারা সাধারণত তেমন দীর্ঘজীবী হইতে পারেন না এবং তাহাদের বংশও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণনগরে মিঃ মনোমোহন ঘোষের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আমাদের বাল্যকালেই নির্মিত হইল, এই কয়েক বৎসরেই তাহা হইতে তাঁহার বংশের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত এখন তাহা ভাড়াটে বাড়ীতে পরিণত! তিনি ও তাঁহার সহোদর মিঃ লালমোহন ঘোষ উভয়েই উল্কার ন্যায় আবির্ভূত হইয়া তীব্র জ্যোতিতে তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণের নয়ন ধাঁধিয়া দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইলেন, অনাগত ভবিষ্যৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের গৌরবস্মৃতি বহন করিবে, কিন্তু তাঁহাদের বংশতরু অদৃশ্য। মাইকেল মধুসূদন, মহাপ্রাণ তারকনাথ পালিত, ডাক্তার আর এল দত্ত প্রভৃতি অনেকের সম্বন্ধেই এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয়, তবে ব্যতিক্রম না আছে, এমন কথা বলা যায় না' (পৃ ৩৬৪)।

এই আলোচনায় দাঁড়ি টানছি একটি আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ করে। দীনেন্দ্রকুমার রায় 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। পাশাপাশি লেখকের নিবেদনে কবুল করতে দ্বিধা করেননি, অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি প্রধানত রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত। এ ও জানিয়েছিলেন, সুরেশ সমাজপতি বইটির আদ্যন্ত প্রুফ-পরিচর্যা করেছেন এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির জন্য গ্রাম্য শব্দের গ্লসারি-ও তৈরি করে দিয়েছেন। অবশ্যই প্রতিভা ছিল দীনেন্দ্রকুমারের, একই ঘাটে বাঘে-গরুতে জল খাওয়ানোয় তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন।

'বিস্মৃত বাংলা'

যে-ঈষৎ বিস্ময়উদ্রেককারী প্রসঙ্গের উল্লেখ করে এই আলোচনা শুরু করছি, তাকে শুদ্ধ ভাষায় সম্ভবত বলা হবে সমাপতন, কেউ-কেউ হয়তো ব্যাপারটিকে কোনো আমলই দেবেন না। আধুনিক বাঙালির দ্রুতবিবর্তিত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের গুরুত্ব অপরিসীম, ঘটনাবলির বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গের বিলুপ্তি ঘোষণা, হঠাৎ বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে গোটা বাঙালি সমাজের উচ্চকিত-উদ্দীপিত হওয়া, বোমা-পিস্তলের মহড়ায় বাঙালি তরুণদের হাতেখড়ি, শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার, বিচার ও দণ্ডপ্রাপ্তির পর পণ্ডিচেরিতে লোকগোচরের বাইরে চলে যাওয়া, রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ ও তাতে বাঙালি সমাজের বিলম্বিত নড়ে-চড়ে বসা, রাজনীতির ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাশের ধূমকেতুসদৃশ উত্থান, পাশাপাশি বিপ্লবের লক্ষ্যপূরণে বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানির প্রয়াস—বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন 'এমডেন জাহাজের মোহ'—প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে রাওলাট ফরমানের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালির নিবিড় সাযুজ্যস্থাপন, গান্ধিজি মহারাজের ভারত ও সেই সঙ্গে বঙ্গ

বিজয়, জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথেব প্রায় একক প্রতিবাদ, চিত্তরঞ্জনেব দুই মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহসা-অভ্যুদয় তথা পাবস্পরিক বিসংবাদ, একদা-উগ্রপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেমন মিইয়ে যাওয়া, মুসলমান সম্প্রদায়কে ফের কাছে টানার লক্ষ্যে চিত্তরঞ্জন দাশদের আপ্রাণ প্রয়াস, গান্ধিজির লবণ সত্যাগ্রহকে আপাততুচ্ছ বিবেচনা করেই যেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের বেপরোয়া জীবন-মৃত্যু-পায়ের-ভৃত্য বীর্যেব উপর্যুপরি নিদর্শন, শিক্ষাক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাজাত্যভিমান-সম্পৃক্ত সাম্রাজ্যবিস্তার, জগদীশচন্দ্র বসুর অনুবর্তী হয়ে বিজ্ঞানচর্চায় তরুণ বাঙালি গবেষকদের চমক-লাগানো সাফল্য।

বঙ্গদেশে যে প্রথিতযশা মনীষী-সাহিত্যিক-শিক্ষাব্রতী-বৈজ্ঞানিক এই উত্তাল ঘটনামুখর সময়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের শৈশব-কৈশোর-যৌবন অতিক্রম করে এসেছেন, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিস্তারের ব্রতে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন, অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক প্রকাশ বা গুপ্ত ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে একাত্ম থেকেছেন, আবেগের-মননের জটিল-সরল নানা অভিজ্ঞতার প্রান্তর পেরিয়ে এসেছেন, অতি ঐশ্বর্যবান এই ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী থেকেছেন তাঁরা। অথচ তাঁদের মধ্যে খুব কমজনই স্মৃতিকথা লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। আন্দামানে বন্দীজীবন কাটিয়ে ফেরা কিছু কিছু বিপ্লবী অবশ্য অতীতচারণে ব্রতী হয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ধ্রুপদী সাহিত্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। স্মৃতিচারণ করেছেন শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষও, আরো পরে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ ও অনন্তলাল সিংহ। কিন্তু ডাকসাইটে অধ্যাপকদের কথা

ভাবুন—জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোপীনাথ ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, তারকনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের মধ্যে কেউই আত্মজীবনীমূলক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। এমনকী যে-বিনয়কুমার সরকার বাঙালি বাচ্চাদের ১৯০৫ সালের বিপ্লবী ক্রিয়াকীর্তির মহিমা বন্দনায় আমৃত্যু উড়েপেছেন, তিনি স্বয়ং আত্মস্মৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে এগোননি। ব্যতিক্রম রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন এবং সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। বাংলার বাইরে যে-বাঙালি শিক্ষাবিদরা খ্যাতি কুড়িয়েছেন, যেমন রাধাকুমুদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় অথবা নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত কিংবা সুরেন্দ্রনাথ সেন, তাঁরাও এ ব্যাপারে এগোননি। বাকচাতুর্যে যিনি তুলনারহিত, সেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত লিখিত স্মৃতিরোমন্থনের প্রসঙ্গে কেমন গুটিয়ে ছিলেন। সমসাময়িক দুই বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহার ক্ষেত্রেও এই অলিখিত নিয়মের অন্যথা ঘটেনি। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আশ্চর্য বাংলা গদ্য লিখতেন, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বরাবর নিবিড় সংযোগ ছিল, কিন্তু হাতে বাড়তি সময় পেলে তিনি বরঞ্চ বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বেহালা বা এস্রাজ বাজিয়ে শোনাতেন, নয়তো তাদের সঙ্গে মেঝেতে বসে লুডো খেলায় মগ্ন হতেন। সংখ্যাতত্ত্ববিদ, রবীন্দ্রনাথের ভক্তশিষ্য, সুকুমার রায়-সখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও ও পথ মাড়াননি।

এই কুণ্ঠাবোধের কারণ হাতড়ে বেড়িয়ে কয়েকটি ধারণায় পৌঁছুনো সম্ভব। বঙ্গভূমিতে সেই যুগটা ছিল বীরপূজার ঘোর সমাচ্ছন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথদের নিয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত মাতামাতি হয়েছে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও উপেক্ষিত হননি। অশ্বিনীকুমার দত্ত

থেকে শুরু করে চিত্তরঞ্জন দাশ পর্যন্ত সমাজগুরু তথা রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তমহল মাতোয়ারা হয়েছে। অধ্যাপকরা অনেকে 'বাংলার ব্যাঘ্র' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের সামনে কুঁকড়ে থেকেছেন, কখনো নিজেদের দিকে ফিরে তাকাননি, নিজেদের তৃণাদপি সুনীচেন বিবেচনা করে গেছেন। পাশাপাশি তাঁরা সম্ভবত অন্য একটি ঘোরের মধ্যেও ছিলেন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি যে-বাঙালি উজ্জীবন, ইংরেজ প্রভুদের দাক্ষিণ্যে বাঙালিদের ভারতবিজয়, বিদগ্ধ বাঙালি বিদ্বজ্জনদের সমস্ত শ্রদ্ধা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সেই গৌরবপ্রবাহের উদ্দেশে নিবেদিত। প্রয়াত মনীষীদের নিয়ে চর্চা অব্যাহত থেকেছে, সমকাল নিয়ে সাতকাহন লেখালেখি রুচির বাইরে।

তৃতীয় একটি কারণও কি ছিল? রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ততদিনে সমাজের সর্বস্তরে আত্মরোমন্থনের আদর্শ হিশেবে স্বীকৃত। সেই মাধুরী-উপচে-পড়া রচনার ধারেকাছেও তাঁরা পৌঁছুতে পারবেন না, এই প্রতীতি হয়তো অনেককে আত্মকথনে প্রয়াসবান হওয়ার উৎসাহ থেকে বিরত রেখেছিল। এমনটা হয়তো হয়েছে, যে-শ্রুতকীর্তি মনীষী-অধ্যাপকদের নাম একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা একটু-আধটু ডায়েরির ধাঁচে বিক্ষিপ্তভাবে খানিক-খানিক আত্মস্মৃতি কখনো-সখনো লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু গোপন কথাটি গোপনেই থেকে গেছে, সে সমস্ত ভগ্নাংশিক রচনাকে নিজেদের জীবদ্দশায় পূর্ণতর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেছেন।

এবংবিধ দ্বিধাগ্রস্ততার শিকার হয়েছিলেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যও। 'বিস্মৃত বাংলা'-র অধ্যায়গুলি আশি বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি লিখতে শুরু করেন, শুরু হয় ঘুম পাড়ানো স্মৃতিকে সন্তর্পণে একটু-একটু জাগিয়ে তোলা। বইটি দে'জ

পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত হলো তাঁর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর বাদে। তাঁর জন্ম ১৮৯৬ সালে ফরিদপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে, সেখানে এবং ফরিদপুর শহরে শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায় ছাত্র হিশেবে তাঁর কলকাতায় আগমন। সে-সময়ে স্বদেশি আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আলোড়নের উন্মাদনা, 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের উত্থান, তরুণদের ঝাঁকে-ঝাঁকে এই দুই গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশকে স্বাধীন করবার সংকল্পে শপথবদ্ধ হওয়া। নির্মলচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র বসুর সমসাময়িক। কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন নির্মলচন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে স্কটিশ চার্চ কলেজে তাঁর প্রায় পুরোটা সময় কেটেছে, সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে একদিন-দু'দিন পড়িয়েছেন। তাঁর অধ্যাপনা-দক্ষতা সুবিদিত, সমান সুবিদিত তাঁর ছাত্রবাৎসল্য ও স্বভাবঔদার্য। তবে প্রথম জীবনে স্বাদেশিকতায় যে-দীক্ষা নিয়েছিলেন, তার প্রভাব তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে পুরোটা সময় জুড়ে আচ্ছন্ন করে থেকেছে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যেমন সোৎসাহে বিতর্কসভা তথা অন্য নানা সংস্কৃতিচর্চায় যোগ দিয়েছেন, শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। অধ্যাপনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মসূচি ও চিকীর্ষা সযত্নে পরিপালন করে রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেস দলের একনিষ্ঠ সদস্য হয়েও বামপন্থী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর এক ধরনের কোমলতা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

নির্মলবাবু বার্ধক্যের প্রান্তে পৌঁছে টুকরো-টুকরো স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেছিলেন। খুব বেশি দূর এগোননি। নিজের শৈশব থেকে শুরু করে বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রান্তে এসে তাঁর এই

রচনাপ্রয়াস থেমে গেছে। এক দুরন্ত সুগঠিত সুশৃঙ্খল আত্মকাহিনী লিখবেন, এমন প্রতিজ্ঞা সম্ভবত তাঁর মনের কন্দরে ছিল না। হয়তো অবসর সময়ের ফাঁক ভরাবার লক্ষ্যে, খানিকটা মেদুরতার মৃদু পীড়নে দ্রব হয়ে ও অতীতের প্রতি দায়বদ্ধতার বিবেকদংশনে আক্রান্ত হয়ে, অল্প-অল্প করে স্মৃতিপটে আঁচড় কেটে-কেটে, পরপর কয়েকটি অধ্যায় সাজিয়ে গেছেন। আশ্চর্য সচ্ছল তাঁর বাংলা গদ্য। এমন গদ্য লেখার ক্ষমতা আধুনিকতম তথাকথিত সুশিক্ষিত বাঙালি প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। নির্মলচন্দ্র গ্রন্থসূচনা করেছেন ছেলেবেলায় যে-গানগুলি গাঁয়ের বাড়িতে জ্যেষ্ঠ-জ্যেষ্ঠা'দের মুখে শুনেছিলেন, সেগুলির বৃত্তান্ত দিয়ে। এ সমস্ত গানের মধ্যে উপ্ত একটি-দুটি তখনকার প্রেক্ষিতে দুঃসাহসী স্বদেশি গানের কলি অথচ পাশাপাশি চরম রক্ষণশীলতার স্বাক্ষরও (যেমন এক দিকে দর্পিত উচ্চারণ, 'ব্রিটিশ আর কি দেখাও ভয়?/ও ভয়ে কম্পিত নয় , আমার হৃদয়' সেই সঙ্গে 'সতী নারীর পতি যেন পর্বতেরই চূড়া / অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের গুড়া।')। অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যায়গুলি যথাক্রমে 'আমাদের গ্রাম', 'আদিকথা', 'পাঠারম্ভ ১৯০৩', 'ফরিদপুর শহর', 'বন্দেমাতরম: স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫' এবং 'স্বদেশীয়ানায় হাতেখড়ি'। বেশ কয়েক পুরুষ আগে বর্ধমানের কাঞ্জিগ্রাম থেকে চলে-আসা কাঞ্জিলাল পরিবারের ফরিদপুর জেলার গহন গ্রামে কাঠবাঙাল ভট্টাচার্য হিশেবে পরিচিতি লাভের রোমাঞ্চকর বর্ণনা, ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সেতুবন্ধনের মুহূর্তে চরম পিছিয়ে-থাকা পূববাংলার নিস্তরঙ্গ গ্রাম-শহরের চরিত্র নিয়ে নিটোল কথকতা, যাতে দারিদ্র্য তথা হতশ্রী পরিবেশের প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত নয়, কিন্তু এক বিশেষ সারল্য ও অকৃত্রিমতার আস্বাদও যেন সেঁটে থাকে তাতে। ফরিদপুর শহরে স্বদেশি আন্দোলন চিরকালই তেজী, স্থানীয় দাপুটে নেতা

অম্বিকা মজুমদার একটা সময়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ছড়ি ঘুরিয়েছেন পর্যন্ত। আগেই যা উল্লিখিত, একাধিক গুপ্ত বিপ্লবী দলেরও সে সময় ওই ছোটো শহরে আগমন-নির্গমন। অল্প কথায় নির্মলচন্দ্র সে-সব উত্তেজক দিনের চলাচলগাথা এত নিখুঁত ফুটিয়ে তুলেছেন যে মুগ্ধতার আবেশ সহজে কাটতে চায় না।

পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু কলকাতায় তাঁর ছাত্রজীবন, অধ্যাপনার দীর্ঘ পর্ব এবং নাগরিক সামাজিকতাব অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সমসাময়িক অনেকের কথা তিনি লিখেছেন, যাঁরা পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাতি অর্জন করেছেন, সুভাষচন্দ্রের — এবং দিলীপকুমার রায়ের—প্রসঙ্গ তো ছেড়েই দিলাম। বহু যশস্বী অধ্যাপকদের কথাও 'বিস্মৃত বাংলা'য় লিপিবদ্ধ। নির্মলচন্দ্র বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন তাঁর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে, ও অধ্যাপনাজীবনের প্রথম পর্বে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একাধিপত্য এবং সেই একাধিপত্যের সূত্র ধরেই গোটা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের দম-আটকানো প্রভাব। নির্মলচন্দ্র মৃদুভাষী, পরচর্চাবিমুখ, তবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে তিনি অতি স্পষ্টবাক্‌।

যেটা বিস্মিত করে, তা 'বিস্মৃত বাংলা'-য় রবীন্দ্রনাথের প্রায় অনুল্লেখ। হয়তো সাহিত্যক্ষেত্রে তখনো বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি মোহাবিষ্টতার মধ্যপ্রহর খানিকটা, সন্দেহ হয়, 'বন্দেমাতরম্‌' সংগীত ইতিমধ্যে যেহেতু মন্ত্রোচ্চারণে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই কারণে। 'বিস্মৃত বাংলা' নামকরণ সম্ভবত নির্মলচন্দ্র নিজেই করে গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্যই ত্রিকালদর্শী মানুষ, বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, যা হারিয়ে যায় তা ফিরে পাওয়ার নয়, স্মৃতিচারণে অন্তত যদি খানিকটা ধরে রাখা যায়, তা হলেও সামান্য তৃপ্তি, সেই কারণেই পরিণত

বার্ধক্যে এই অধ্যবসায়। কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যকেও। সব্যসাচী প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে একটি-দু'টি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ সংযোজন করে পিতৃদেবের না-বলা বা অর্ধ-বলা কথাকে আরো একটু বিশদ করবার চেষ্টা করছেন।

তবু হতাশাব্যঞ্জক উক্তি দিয়েই আলোচনায় ইতি টানতে হয়; বিশ্বায়িত পশ্চিম বাংলায় ক'জন আর 'বিস্মৃত বাংলা'-র দিকে নজর দেবেন?

মহানুভব আদর্শবাদী চিন্তাবিদ

কলহদীর্ণ বঙ্গভূমিতে কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছুনো আপাত অসম্ভব ঘটনা। অথচ যদি মৃদু উচ্চারণে অভিমত ব্যক্ত করা হয়, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অন্তত তিনজন বাঙালি, যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন, অথচ সেই সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিবিদ, তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শের আড়াআড়ি সত্ত্বেও তাঁরা বরাবর সমাজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় থেকে গেছেন, কেউই বোধহয় আপত্তি তুলবেন না। এই তিন মনীষী রেজাউল করিম, গোপাল হালদার এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁদের সাহিত্যমগ্নতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গেও তাঁরা সমান সম্পৃক্ত। তবু, কী আশ্চর্য, সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শসম্পন্ন মানুষদের কাছে তাঁরা সব সময়ই সমান শ্রদ্ধার পাত্র। এই ত্রয়ের কেউই এখন জীবিত নন, তবু তাঁদের সর্বমান্যতার ইতিহাসে এতটুকু চিড় ধরেনি।

আলোচ্য গ্রন্থটি (মননেন জীবতি : গোপাল হালদার স্মৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য) গোপাল হালদারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে সমাচ্ছন্ন গোপাল হালদারের জীবনবৃত্তান্ত। তাঁর আদি নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর

পরগণার অন্তর্ভুক্ত এক নিঝ্ঝুম গ্রাম, শৈশব কেটেছে অনুরূপ গহন মফঃস্বল নোয়াখালি শহরে। তারপর ছাত্রাবস্থায় কলকাতায়, এবং এই মহানগরকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনচক্রের ঘূর্ণন, কলকাতার মানুষ হিশেবেই নিজের পরিচয় প্রদান করতে ভালোবাসতেন। তাঁর শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য জুড়ে জ্যাঠতুতো দাদা রঙিন হালদারের মনন ও ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ় প্রভাব। আমার নিজের শৈশবে যখন এই দুই ভ্রাতার নাম প্রথম উচ্চারিত হতে শুনি, একটু ধন্দের শিকার হতে হয়েছিল : কী করে এটা হয়, অগ্রজের নাম যেখানে রঙিন হালদার — প্রায় রাজশেখর বসুর কোনো রঙ্গ কাহিনী থেকে উঠে আসা নাম — সেখানে ছোটো ভাই নেহাতই শাদামাটা গোপাল হালদার। পরে রঙিন হালদার পাটনা শহরে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। একটি সুন্দর সুসংস্কৃত বাঙালি সাহিত্য পরিমণ্ডল সেখানে তিনি গড়ে তুলেছিলেন। গোপাল হালদার মাঝে-মাঝে গিয়ে সেই বিশেষ পরিবেশের স্নিগ্ধতায় স্নাত হয়ে আসতেন। কত গবেষণা-চর্চাই তো ইদানীং হচ্ছে বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে। কেউ যদি রঙিন হালদার-গোপাল হালদারের নৈকট্য ও পারস্পরিক অনুরাগের প্রসঙ্গ নিয়ে খেটেখুটে একটি গবেষণা পুস্তক রচনা করেন, সাহিত্যের ইতিহাসে তা মূল্যবান সংযোজন না হয়ে যায় না।

কবুল না করে উপায় নেই, আলোচ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রন্থটি আশা পূরণ করে না। 'পরিচয়' পত্রিকার গোপাল হালদার স্মৃতিসংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সোমনাথ লাহিড়ীর প্রবন্ধ দুটি অবশ্যই অতি হৃদয়গ্রাহী : স্বচ্ছ ঝরঝরে অথচ বলিষ্ঠ গদ্যে মুগ্ধ স্মৃতিচারণ। সমান চিত্তাকর্ষক সুশীল জানার ক্যাসেট-বন্দী মন্তব্যের অনুলিখন : "বর্তমানে অনেককে বলতে শোনা যায় মার্কস সেকেলে হয়ে গেছেন। তাঁর তত্ত্ব অর্থনীতি একটা পুরোনো বিষয়। কিন্তু সমাজে

ধনী-গরিব যতদিন থাকবে, শোষণ যতদিন থাকবে, এবং একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করে মুনাফা করবে, মার্কসবাদও ততদিন থাকবে। গোপালদাদের অবদানও ততদিন মিথ্যে হয়ে যাবে না।' কিন্তু বাদবাকি প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই হতাশ করে। এমন নয় যে স্মারকগ্রন্থটির পরিকল্পনায় তথা বিষয় বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো অভাব ঘটেছে। গোপাল হালদারের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণাচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধ। কিন্তু বড়ো বেশি পণ্ডিতিয়ানা, কখনো-কখনো লেখকের অবসাদব্যঞ্জক আত্মকণ্ডুয়ন। গোপাল হালদার আশ্চর্য নম্র মানুষ ছিলেন, বিনয়ের আচ্ছাদনে নিজের পাণ্ডিত্যকে ঢেকে রাখতেন, তাঁর বচনে সদাসর্বদা স্নেহ বিকিরিত হতো। মতাদর্শে অবিচল, কিন্তু মতাদর্শের প্রকাশে উগ্রতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়া থাকতো না। অথচ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলিতে বচনের পীড়াদায়ক আধিক্য, বিনয় প্রায় অদৃশ্য। অন্তত একটি প্রবন্ধে লেখকের অহমিকাভর্জর প্রগল্‌ভতা প্রায় ছ্যাবলামির স্তরে গিয়ে ঠেকেছে। গোপাল হালদারকে নিয়ে লিখতে গেলে যে পরিশুদ্ধ শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেকে নিযুক্ত করতে হয়, সে-সম্পর্কে ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত লেখকে মহাশয়ের নেই।

এই নিরুৎসাহী ভিড়ের মধ্যেও দুটি প্রবন্ধ কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রভাতকুমার দাস রচিত " 'পরিচয়' সম্পাদনায় গোপাল হালদার" শুধু যে গোপাল হালদারের স্থৈর্য, ধৈর্য ও চিন্তাসমৃদ্ধ সম্পাদনাকুশলতার বিবরণ তা-ই নয়, সেই সঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকার চারিত্রিক পালাবদলের অতি জরুরি ইতিবৃত্তও। অন্য উল্লেখযোগ্য রচনাটি অরুণ ঘোষের 'গোপাল হালদারের ভাষাচিন্তা' : সীমিত আয়তনের মধ্যে অতি সমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ। পূর্ববঙ্গের উপভাষা নিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় গোপাল হালদার

যে-বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ আলোচনা-গবেষণা শুরু করেছিলেন, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আর তেমন চর্চা হয় না, যদিও বাংলাদেশে তাঁর গবেষণা ঐতিহ্য সম্মানের সঙ্গে এখনো অনুসৃত হচ্ছে।

বহু বছর কারান্তরালে, কখনো-কখনো মুক্তি পেয়ে বাইরে আসা, আরো অসংখ্য কর্তব্যের দায়, সমস্ত-কিছু সত্ত্বেও পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল গোপাল হালদার তাঁর লেখনীকে অব্যাহত রেখেছিলেন! কলেজ জীবনে একই সঙ্গে সজনীকান্ত দাস ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহপাঠী, নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়েও বিপরীতমুখী চরিত্রের মানুষজনের সঙ্গে আদানপ্রদানে তাঁর সহজাত প্রতিভা। অন্যান্য প্রসঙ্গ যদি অনুল্লেখিত থাকে, তা হলেও তাঁর জেলখানায় বসে লেখা উপন্যাস 'একদা', এবং কারামুক্তির পর রচিত প্রবন্ধাবলি 'সংস্কৃতির রূপান্তর', স্বচ্ছন্দে দাবি করা চলে, সাহিত্য ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', আর যা-ই হোক, রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, তা বেদগত ভক্তিবাদের উপলক্ষ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'ও প্রায় সমধর্মী, মানুষের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আদর্শে উত্তরণ তার মুখ্য লক্ষ্য। 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়'তেও রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক চিন্তার অঞ্জন ছুঁইয়ে দিয়ে গেছেন মাত্র, উভয় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছাপিয়ে কাব্যের আকুল লীলাকেলি। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' রাজনীতির দাবি মেটাতে অবশ্য সোচ্চার, কিন্তু যতটা গর্জন ততটা বর্ষণ নেই। বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে, গোপাল হালদারের 'একদা'ই মধ্যবিত্ত বাঙালিকে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। 'একদা'র পরিপূরক রূপে পরে অন্য যে-দুটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন, 'অন্যদিন' ও 'আর একদিন', তারাও সেই অনুশীলনের প্রমাণ বহন করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'একদা' আত্মপ্রকাশ না করলে সতীনাথ

ভাদুড়ীর 'জাগরী'ও সৃষ্টি হতো না। নিজের অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমাসের পীড়নে গোপাল হালদার 'একদা' রচনা করেছিলেন। সেই দ্বন্দ্ব সমাসেরই প্রতিবিম্ব ফের ঈষৎ রঙ পরিবর্তন করে উদ্ভাসিত 'জাগরী' উপন্যাসে।

সমান উল্লেখনীয় 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধসমষ্টি। অভ্যস্ত সমাজব্যবস্থা পাল্টে যাচ্ছে। কেন পাল্টে যাচ্ছে, কোন প্রকরণের মধ্যবর্তিতায় পাল্টে যাচ্ছে, ভাঙা-গড়ার উপান্তে কোথায় গিয়ে সমাজব্যবস্থা পৌঁছুতে পারে, এ-সব কথা নিয়ে আজ থেকে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে ভাববার মতো মানুষ খুব বেশি ছিলেন না। গোপাল হালদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃসাহসী কর্তব্য সাধনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। পাশাপাশি— ক্লান্তিহীন তাঁর অধ্যবসায়—তিনি রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সৃষ্টি নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন, এবং সে-সম্পর্কে প্রচুর লিখেছেন : 'প্রবাসী'-'মডার্ন রিভিউ'র মতো পত্রিকার সঙ্গে প্রথম জীবনে তাঁর যোগসূত্র তো তুচ্ছ করবার বস্তু নয়।

গত শতকের তিরিশের দশকে কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত এক দঙ্গল বাঙালি যুবক তাঁদের বন্দী থাকাকালীন অবস্থাতেই নানা অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে গিয়ে কংগ্রেস দল ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। গোপাল হালদারের ক্ষেত্রে ইতিহাস সামান্য অনরকম। রাজবন্দী থাকা অবস্থাতে তিনিও মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তবে ১৯৩৮ সালে ছাড়া পেয়ে প্রথমটায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব বেছে নেন, কয়েকটি মাস 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা সম্পাদনা করেন পর্যন্ত। সেই অবস্থান থেকে প্রায় অবধারিত অনুবর্তনে কমিউনিস্ট পার্টিতে। কিন্তু তাঁর স্বতোৎসারিত উদারতাবোধ তাঁর আদর্শবোধকে কদাচ একপেশে হতে দেয়নি : যে-কোনো মানুষকে তিনি মানুষ হিশেবে

শ্রদ্ধা জানাতেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চার মধ্যে সেই বিশেষ বিনয়ের নিবেদন আমরা পরিস্ফুট হতে দেখি।

ফের বলি, 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' গ্রন্থটি গোপাল হালদারের স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতে সফল হয়নি। তবে বইটির একটি আলাদা আকর্ষণ, পরিশিষ্টে সন্নিবদ্ধ গোপাল হালদারের কিছু অগ্রন্থিত রচনা ও পত্রাবলি। চিঠিগুলি তাঁর বাগদত্তা, পরে তাঁর স্ত্রী, অরুণা সিংহকে লেখা : মনের নিভৃত নির্জন কথা নিজের দয়িতাকে কত মাধুর্যের সঙ্গে, কতটা সংবেদনশীলতার সঙ্গে, পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে এই পত্রগুচ্ছ। সমান মহার্ঘ্য উপহার গোপাল হালদারের বিভিন্ন-বিচিত্র বিষয় নিয়ে কিছু ছোটো-বড়ো, এখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত, রচনা : তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগ নিয়ে ভাবছেন, বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন, বিবেকানন্দের চিন্তার স্বচ্ছতা নিয়ে উন্মুখর হচ্ছেন, তাঁর একদা-একান্ত প্রিয় ইংরেজি সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা শেক্সপিয়র-এর জিজ্ঞাসা নিয়েও ব্যাপৃত হচ্ছেন। বার বার করে পড়তে হয় এই লেখাগুলি।

গোপাল হালদার দুই খণ্ডে তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন : 'রূপনারানের কূলে'। সেই স্মৃতিকথার খসড়ার একটি টুকরো আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বিশেষ অনুধাবনযোগ্য আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর ইংরেজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত থাকবার সূত্রে আলাপ-হওয়া সেই পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে তাঁর উক্তি : 'মানুষ হিসাবে আমি তো এই ঝড়ের যুগে কম মানুষকে দেখিনি—আর আয়ুও কম হয়নি—আগেও দেখেছি, পরেও দেখেছি—গণ্য, নগণ্য, অগ্রগণ্য অসংখ্য মানুষের মধ্যে আমার মনে তবু সুরেশ মজুমদার মহাশয় ঝাপসা হয়ে যাননি পরের বছরগুলিতে। সহোদর দেশপ্রেমী কর্মীদের

সঙ্গে ব্যবহারেও সুহৃৎ-তুল্য মানুষ।' গোপাল হালদারের মতো এমন স্বতন্ত্র কমিউনিস্টই সম্ভবত রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দিক থেকে চরম প্রতিদ্বন্দ্বী কারো সম্পর্কে এমনধারা উক্তি করতে পারেন।

জানি, আক্ষেপ করে লাভ নেই, তবু আক্ষেপ করার ব্যাকুলতা তো তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না, তাই বলতেই হয় : গোপাল হালদারদের মতো মহানুভব চিন্তাবিদ পৃথিবীতে এখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

গোয়েন্দা গল্প থেকে দর্শনে

বর্তমান আলোচকের মতো যাঁরা সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে, বাল্যকাল কাটিয়েছেন, তাঁদের প্রাথমিক চেতনা জুড়ে ছিল দুটি বিশেষ আলোড়ন, দুটিই স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মোহের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের শৈশব-উন্মাদনা ঘিরে সূর্য সেন-গণেশ ঘোষ-অনন্ত সিংহ-প্রীতিলতা ওহ্‌দেদারদের শৌর্যকাহিনী, পাশাপাশি ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার গতিপ্রকৃতি নিয়ে অর্ধেক বোঝা, অর্ধেক না-বোঝা উত্তেজনা। গোটা সমাজ, প্রধানত হিন্দু-শাসিত সমাজ, বিপ্লবীদের প্রসঙ্গে যেমন উদ্বেল-উচ্ছ্বসিত, মৃত-বলে-ঘোষিত, ফিরে-আসা ভাওয়ালের মেজোকুমারকে নিয়েও সেই সমাজের দখিন দুয়াব নিয়ত খোলা। কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই, যে লক্ষ্মীছাড়া সামান্য সন্দেহও প্রকাশ করবে, বিরক্তির তরবারি দিয় তার গলা কাটা হবে। বাকল্যান্ড-বাঁধে আবির্ভূত সন্ন্যাসীটি মেজোকুমার, মেজোকুমারই সন্ন্যাসী; সাহেব প্রভুরা তা মানতে চাইছে না, তাদের দিয়ে মানাতেই হবে, এটাও যে স্বাধীনতা যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যুক্তি ছাপিয়ে আবেগ, দেশমাতৃকা বন্দনার আবেগ, আমাদের অস্তিত্ব যেন নির্ভর করছে সন্ন্যাসীর কুমারত্ব প্রমাণের উপর। আমরা জানতাম খয়ের

খাঁ-রা, ষড়যন্ত্রকারীরা, আশেপাশেই আছে, এটাও জানতাম এক নচ্ছার বাঙালি সবকাবি উকিল জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কেঁদে পড়ে বলেছে . 'হুজুর, কলকাতায় সুপারিশ করে এক খাঁটি সাহেব হাকিমকে দিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করুন, কোনো বাঙালি বিচারককে ভরসা নেই'। এই আর্জির কথা শহরে ফাঁস হয়ে গেছে, আমাদের গুরুজনরা এবং আমরা রাগে ফুঁসছি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাঙালি বিচারকই আদালতে বসলেন · পণ্ডিত, বিবেকবান, ন্যায়পরায়ণ পান্নালাল বসু মহাশয়। তিন বছর ধরে মামলা চলালো। আমাদের উত্তেজনাও প্রলম্বিত। গোনাগুনতির বাইরে এই পক্ষের সাক্ষী, ওই পক্ষের সাক্ষী, টাকা খেয়ে কিংবা ভয় খেয়ে কোন পক্ষের কোন সাক্ষীকে বিগড়ে দেওয়া হয়েছে তাই নিয়ে গুজব। সাক্ষীসাবুদের পালা চুকলে দুই পক্ষের আইনজীবীদের তরজা। সে-সব পালা চুকলে, যথেষ্ট সময় নিয়ে পান্নালালবাবু নিজের হাতে রায়ের বয়ান লিখলেন; যাতে জানাজানি না হয়ে যায়; টাইপও করলেন নিজের হাতে। রায় যে দিন ঘোষিত হলো, শহর জুড়ে উৎসবের ঋতু। জনৈক ভদ্রলোক, বঙ্কিমচন্দ্র সাহা, শহরে এক পয়সা দামের এক দৈনিক পত্রিকা, 'চাবুক', বের করতেন। তাঁকে সে দিন দশ-বারো বার পত্রিকা ছাপতে হয়েছিল, বিক্রি হয়েছিল মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও। তবে ঢাকা জেলার আদালত থেকে আপিল কলকাতাস্য হাইকোর্টে, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু, হাইকোর্ট থেকে ফের আপিল লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে, তত দিনে আমরা নবীন যুবক।

সেই মামলা অবশ্যই রাজনৈতিক ইতিহাস। কিন্তু তাতে উপন্যাসের ঘোরও। এত ঘটনার-চরিত্রের সমাবেশ, এত সংঘাত-প্রতিঘাত, যেন একটি বিশেষ সময়ের, বিশেষ যুগের, বিশেষ

মানবসম্প্রদায়ের কাহিনী উন্মোচিত হচ্ছে। পান্নালাল বসুর দীর্ঘ রায়ের পাণ্ডুলিপি এত সুলিখিত, এত সাহিত্যগুণ-সমন্বিত যে উপন্যাস পাঠ করছি দাবি করলে এমন-কিছু বাগাড়ম্বর হতো না। একটু বড়ো হয়ে আমরা সেই ছাপানো পুঁথি পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি রচনার অন্বীক্ষা-শক্তি ও বিশ্লেষণ-প্রসাদে, ভাষার সৌকর্যেও।

সাত শতকের ব্যবধানে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সেই কাহিনীর পুনর্বর্ণনা ও পুনর্বিশ্লেষণে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। আমার প্রথম আবেগোক্তি, আহা, পার্থ চট্টোপাধ্যায় না লিখে আমি যদি এমন বই লিখতাম। সেই সঙ্গে, একটু সংকোচের সঙ্গে এটাও বলি, মনে সামান্য ভয়ও ছিল, পার্থবাবুকে মাঝে-মধ্যে উত্তর-আধুনিক মহলে আড্ডা দিতে দেখা গেছে বলে জনপ্রবাদ, কে জানে, হয়তো পরিবেশ-বৈগুণ্যে ভাওয়াল মামলার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে-সেঁটে-থাকা স্বদেশিয়ানাকে রামচিমটি কাটবেন, হয়তো শাসক ইংরেজদের দিকেই মিষ্টান্নের ভাণ্ডটি এগিয়ে দেবেন।

তাঁর কাছে নিপাট ক্ষমা চাইছি, সমস্ত আশঙ্কা ভুল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় আদর্শ সমাজবিজ্ঞানীব অপক্ষপাতিত্বের সঙ্গে পুরনো দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটেছেন, যাকে যা দেয় দিয়েছেন; যাকে ভর্ৎসনা করবার করেছেন, যাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে, তাঁর জবানিতে বিশ্বাস অর্পণ করেছেন। জমাট গোয়েন্দা গল্পের আকর্ষণ গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায় অনুভব না করে উপায় নেই। মামলার কী পরিণতি তা তো আমাদের জানা, আমদের আগ্রহ অপরমুখী, পার্থবাবু কী ব্যক্তিগত উপসংহারে পৌঁছন, তা নিয়ে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে অবশেষে, পার্থবাবুর সিদ্ধান্ত পান্নালাল বসুর বিচারকে আদৌ নস্যাৎ করেনি।

এখানেও কিন্তু একটি বিশিষ্টতার কথা বলতে হয়। জেলা-আদালত থেকে হাইকোর্ট, হাইকোর্ট থেকে প্রিভি কাউন্সিল,

মাঝখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুস্তর সময়সমুদ্র ব্যবধান। আবেগের সম্পূর্ণ নিষ্কাশনের জন্য আমাদের তেরো-চোদ্দো বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। এমন নয় যে প্রতিটি পর্যায়েই সিদ্ধান্তের তুলাদণ্ড একই দিকে ঝুঁকে থেকেছে। হাইকোর্টের তিন বিচারকের মধ্যে একজন কুমারকে জাল বলে বিবেচনা করেছেন, রহস্যের ঘোর তাই বরাবর অব্যাহত থেকেছে। একটি খটকা তখনো ছিল, এখনো আছে; পার্থবাবু বারবার করে সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বিবাদী পক্ষ দাবি করেছেন কুমারের মৃতদেহ দার্জিলিঙের 'স্টেপঅ্যাসাইড' বাড়িতে সারারাত শায়িত ছিল, পরদিন ভোরবেলা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হয়। বাদী পক্ষ সম্পূর্ণ অন্য কথা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, দাহকার্য নাকি রাত্রিবেলাই সম্পাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, শ্মশানে দেহ নামানো হয়েছিল, কিন্তু চিতায় তোলবার আগেই তেড়ে বৃষ্টি আসে, শবানুগমনকারীরা এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে যান, বর্ষণ ক্ষান্ত হলে ফিরে দেখেন, শ্মশান ফাঁকা, শবদেহ উধাও সেই ঘটনা চেপে গিয়ে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসেন, পরদিন সকালে ঢাক-ঢাক গুড-গুড়, অন্য-একটি দেহ কী করে সংগ্রহ করে শ্মশান-যাত্রার অভিনয় করেন।

সেদিন নিশীথে দার্জিলিঙের সর্বত্র বৃষ্টি হয়েছিল কি না, শ্মশানস্থানেও হয়েছিল কি না, তা নিয়েও তথ্যদ্বৈধের নিরসন সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় একটি শব সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে কী প্রকরণে হয়েছিল, তা-ও অস্পষ্ট। এপক্ষে-ওপক্ষে সাক্ষীদের কয়েক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি-ধারণা থেকে প্রতীতিতে পৌঁছেছেন, কেউ-কেউ অবশ্য নিখাদ স্বার্থবিচার থেকে।

শেষ পর্যন্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীর নায়ক কিন্তু সেই অতিরিক্ত জেলা বিচারক পান্নালাল বসু। কলকাতা হাইকোর্টে বিবাদী পক্ষের হয়ে সওয়ালকারী বাঙালি সাহেব আইনজীবী,

নাকসিটকোনোয় তুখোড়, পান্নালালবাবুর ভাষার সৌষ্ঠবকে ব্যঙ্গ করে মন্তব্য জুড়েছিলেন, 'মফঃস্বলি শেক্সপিয়ার'। পার্থবাবুর ঘৃণা সেই ব্যারিস্টারকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই দাহ করেছে, যেমন করেছে সেই বাঙালি সরকারি উকিলকে, যিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাহেব বিচারকের জন্য একদা ধর্না দিয়েছিলেন।

পার্থবাবুর বিবরণ থেকে এটাও স্পষ্ট, বিলেত থেকে যে-বিচাবকেরা আসতেন, তাঁরা সবাই নিকষ ভারতবিদ্বেষী সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। হাইকোর্টে বিচারপতি লজ ঈষৎ অনাচারী হয়েছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কস্টেলো ভারতীয় বিচারক চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই একমত। বরঞ্চ যদি কাউকে খলনায়ক হিশেবে প্রতিপন্ন করতেই হয়, সেই নিন্দাবাদ সম্ভবত চারুচন্দ্র বিশ্বাসেরই প্রাপ্য, উগ্র স্বাদেশিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি একটি অপকর্ম করেছিলেন। কস্টেলো সাহেব ছুটিতে বিলেতে চলে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁর রায় লিখে পাঠান। হাইকোর্টের ভিতরে ও বাইরে টানটান উত্তেজনা, লজ সাহেব পান্নালালবাবুর সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছেন, চারুচন্দ্রবাবু অন্য পক্ষে তা সমর্থন করেছেন, বলতে গেলে হাফ টাইমে খেলার ফল ১-১। চারুচন্দ্রবাবু নিজের সিদ্ধান্ত জানানোর পর হঠাৎ বাড়তি মন্তব্য যোগ করে দিলেন, বিচারপতি কস্টেলোর সিদ্ধান্ত নাকি গ্রাহ্য নয়, কারণ তা তিনি বিলেতে বসে লিখেছেন। কলকাতায় বসে লেখেননি। কস্টেলো সাহেবের রায় যখন সিলমোহর খুলে পড়া হলো, চারুচন্দ্রবাবু বেকুব বনে গেলেন; আত্মঘাতী গোল দেওয়ার উপক্রম করেছিলেন তিনি।

দুটি পার্শ্বচরিত্র পার্থবাবুর বিচারে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম জন মেজোরানী। বিজয়ী সন্ন্যাসী কুমার তাঁকে বেশ কিছু টাকা জমিদারি সেরেস্তা থেকে গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মেজোরানী দৃঢ়তার

সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন: যে-স্বামীকে তিনি মৃত বলে বিশ্বাস করেন, তাঁর কপট বিকল্প পুরুষের কাছ থেকে সামান্যতম করুণাও যাচ্ঞা করেন না, করবেন না। দ্বিতীয় উল্লেখনীয় চরিত্র বড়োরানী, অর্থাৎ বড়োকুমারের বিধবা পত্নী। তিনি মনে হয় যথার্থই সন্ন্যাসীকে দেবর হিশেবে চিনতে পেরেছিলেন, এবং স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন, মামলা চালানোর জন্য পয়সাকড়িও উদ্যোগী হয়ে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

ভুলে যাওয়ার আগে অন্য একটি বিষয় উত্থাপন করি। এমন মনোহর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-সম্পৃক্ত গ্রন্থে একটি সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের অধ্যায় 'দি আইডেন্টিটি পাজ্‌ল', পরিচয়ের হেঁয়ালি। এই অধ্যায়ে পার্থবাবু আর নিছক ঐতিহাসিক বা বর্ণনাকার নন, তিনি দর্শনের প্রত্যন্তভূমিতে উত্তীর্ণ। কুমার কি সত্যিই সন্ন্যাসী হতে পারেন, সন্ন্যাসী কি ফের কুমার হতে পারেন, শারীরবিদ্যা কী বলে মনোবিজ্ঞান কী পরামর্শ দেয়, এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করে পার্থবাবু আমাদের আকুল করেছেন। প্রশ্নগুলির তিনি নিজেও স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পাননি, আমরাও পাইনি; হয়তো সেরকমই তাঁর অভিপ্রায় ছিল।

শেষ পর্যন্ত দার্শনিকতারই আশ্রয় নিতে হয়। মামলার পুরো ফয়সালা হওয়ার পর কয়েক প্রহরের মধ্যে আইন-স্বীকৃত মেজোকুমার ঠন্‌ঠনে কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন। তিনি ফের বিবাহ করেছিলেন, দ্বিতীয়া স্ত্রীর জন্য তেমন-কিছু সম্পত্তি রেখে যেতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না, লাভের গুড় দুই পক্ষের আইনজীবীরাই চেটেপুটে ভোগ করেছিলেন। সব যায়, শুধু স্মৃতিটুকুই রয়, কিংবা তা-ও হয়তো রয় না, কারণ মেজোকুমারের হয়ে বিভিন্ন বিচারালয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যে-বিখ্যাত ব্যারিস্টার মামলা পরিচালনা করেছিলেন, বি সি চ্যাটার্জি, বিজয়চন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, দু'বছর আগেও তিনি লোকপ্রিয়তার শীর্ষে, ১৯৩৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকা জেলা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে হেরে ভোল হলেন।

প্রার্থনা করবো এই গ্রন্থ (এ প্রিন্সলি ইম্পস্টর : দা কুমার অফ ভাওয়াল অ্যান্ড দা সিক্রেট হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্। পার্থ চ্যাটার্জি।) কোনো অক্ষম বাংলা প্রকাশক বা অনুবাদকের লোভের শিকার হবে না।

হালকা চালে গভীর কথা

লেখককুল সৃষ্টিশীল জীব বলে বাজারে সুনাম-দুর্নাম। প্রথা মেনে তাঁদের সৃজনপ্রতিভাকে কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ ইত্যাদির নানা রীতির বিন্যাসে তাঁরা উজাড় করে উপস্থাপন করেন। তবে, অসহ্য সৃষ্টিযন্ত্রণায় অহরহ দীর্ণ হচ্ছেন বলেই হয়তো, প্রথাগত রীতির পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকতে লেখকরা সব সময় সম্মত নন। তাঁরা যে মাঝে-মাঝে এক খাঁচা থেকে অন্য রীতির খাঁচায় বিহার করতে উদ্‌গ্রীব শুধু তা-ই নয়—ঔপন্যাসিকরা কবিতা মকশো করছেন কিংবা নাট্যচর্চায় ডুবে যাচ্ছেন—তাঁদের সমান আগ্রহ নতুন রীতি উদ্‌ভাবনে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ট্রুম্যান ক্যাপোটে মার্কিন সাহিত্যে এমনধারা একটি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'ইন কোল্ড ব্লাড' নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল তখন। এক নতুন ধারা-প্রথা . ঠিক ইতিহাস নয়, ঠিক উপন্যাসও নয়, অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। ইতিহাসে তথ্যের প্রতি আনুগত্য প্রতি অধ্যায়ে-অনুচ্ছেদে-পঙ্‌ক্তিতে অটুট রাখতে হবে, উপন্যাসে পুরোটাই কপোলকল্পনা, ঐতিহাসিক উপন্যাস আবার সম্পূর্ণ অন্য রকম, একটি-দুটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাহার, কিন্তু ওই পর্যন্তই, তারপর কল্পনার ঘোড়া তেপান্তরের মাঠ

পেরিয়ে ধাবমান। ক্যাপোটে এই সব-কিছুর বাইরে গিয়ে নতুন একটি রীতির দিগন্ত উন্মোচন করলেন। কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে, কিন্তু তার বুনন উপন্যাসের মতো কল্পনাসর্বস্ব নয়, বর্ণিত ঘটনাবলি সত্য, প্রধান চরিত্রাবলিও রক্তমাংসের, উল্লিখিত সন-তারিখের বাস্তবতাও না মেনে উপায় নেই। অথচ প্রথাগত ইতিহাস রচনাও নয়। কারণ চরিত্র-ঘটনা-সন-তারিখের অনুশাসন মেনে নেওয়ার পরেও লেখক তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন : ঘটনার বিন্যাসে সত্যের অপলাপ নেই, কিন্তু তার ব্যাখ্যায় লেখক নিজের কল্পনাকে উজাড় করে দিয়েছেন, চরিত্রগুলির উল্লেখ ও তাদের আচরণ-বিচরণে দলিল-দস্তাবেজের দায়বদ্ধতা থেকে যদিও ন্যূনতম বিচ্যুতি নেই, বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক তাঁর সৃজন-অধিকার সোচ্চার ব্যক্ত করেছেন, এমনকী কখনো-কখনো তাঁর জীবনদর্শনের বোঝাও চাপিয়েছেন চরিত্রাবলির চিন্তার কর্মের মর্মার্থ বিশ্লেষণে। ইতিহাস রচনার ধারাক্রম থেকে অনেক দূরে তাঁর অবস্থান, অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাসের গল্পভারাতুরতাও নেই, কী শিরোনামে ভূষিত করা হবে এই নব্য রীতিকে? মার্কিন মুলুকে যে-বিশেষ্যটি চালু হয়েছিল তা 'বাস্তব কল্পকাহিনী' অনেকটাই সোনার পাথরবাটির মতো, তবে সোনার পাথরবাটি আজ পর্যন্ত কারো দৃষ্টিগোচর হয়নি, অথচ 'ইন কোল্ড ব্লাড'-এর সরব উপস্থিতি গত শতকের ষাটের দশকে উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় যখন কিস্তিতে-কিস্তিতে রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন থেকেই আলোড়নের ঝড়, যখন বই আকারে প্রকাশ পেল, ক্যাপোটে আর শাদামাটা লেখককুলচূড়ামণি নন, এক অভিনববিধানসৃষ্টিকারী পয়গম্বরে রূপান্তরিত হলেন।

এম. জে. আকবরের 'ব্লাড ব্রাদার্স' পড়তে গিয়ে সেই পুরনো ইতিবৃত্ত মনে এলো। আকবর তাঁর পরিবারের তিন পুরুষের বৃত্তান্ত

এই গ্রন্থে বিধৃত করেছেন; তৃতীয় পুরুষ তিনি স্বয়ং। তাঁর পিতামহ, নাম প্রয়াগ, উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিহারের এক ভোজপুরী গ্রামে হতদরিদ্র হিন্দু কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্তরের দশকের মন্বন্তরে গ্রামে-গ্রামান্তরে কাতারে-কাতারে মানুষের মৃত্যু, প্রয়াগের পরিবারেও আর কেউ বাঁচেনি, কোন্ দৈববলে এগারো বছরের শিশুটি টিকে রইলো। ইংরেজ মুলুক, সেই মুলুকে দেশের রাজধানী কলকাতা, কলকাতার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারলে নাকি কোনোক্রমে জীবিকার সংস্থান সম্ভব, এই জনপ্রবাদের ভরসায় শিশুটির পূবমুখো এক ট্রেনে চেপে বসা, চন্দননগর স্টেশনে অসহায় উদ্দেশ্যহীনতায় ভর করে নেমে পড়া, সেখান থেকে উদ্‌ভ্রান্ত পদচারণায় প্রয়াগের তেলিনীপাড়া পল্লীতে পৌঁছনো। সন্নিকট ভিক্টোরিয়া চটকল কারখানা, কারখানার লাগোয়া মজুর বস্তি, গরিবগুর্বোর ভিড, গরিবগুর্বোদের জন্য খোলা এক একটেরে চায়ের দোকানের মালিক ওয়ালি মোহম্মদ নামে এক বিহারী। ইতস্তত ঘুরে-বেড়ানো হতভম্ব শিশুটিকে ওয়ালি মোহম্মদ ও তাঁর স্ত্রী, নিঃসন্তান তাঁরা, আশ্রয় দান করলেন। স্নেহ ও মমতার স্পর্শ পেয়ে প্রয়াগের উজ্জীবন ঘটলো। সে সৎ ও পরিশ্রমী, চায়ের দোকানের কাজকর্ম শিখলো, ক্রমে ওয়ালি মোহম্মদ ও তাঁর সহধর্মিণীর ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়ালো। ওয়ালি মোহম্মদের মৃত্যুর পর, স্বাভাবিক নিয়মেই যেন, দোকানটির উত্তরাধিকার প্রয়াগের উপর বর্তালো, ওয়ালির পত্নী পালিত পুত্রের জন্য কনে বাছলেন, প্রয়াগের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তার শাদি প্রায় একই সঙ্গে, তার ধর্মান্তর-উত্তর নাম রহমতউল্লাহ্। রহমত শান্ত, ধর্মপরায়ণ, কর্মনিষ্ঠ, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী যুবক। তার ব্যবসা আস্তে-আস্তে ফুলে-ফেঁপে উঠলো, তেলিনীপাড়ায় সে সফলতম পুরুষ, তার উপর যেমন লক্ষ্মীর অকৃপণ কৃপাবর্ষণ, তেমনই তাকে

ঘিরে, যতই দিন গড়ায়, সখ্যের ক্রমবর্ধমান পরিমণ্ডল। রহমতউল্লাহ্‌র দোকানদারির পাশাপাশি গরিব ছাপোষা মানুষদের জন্য ঘর তোলা। ঘর ভাড়া দেওয়ার ব্যবসাতেও মনঃসংযোগ করলো, সে, এই উদ্যোগেও সমান সফল। এক দিন তার চক-মেলানো প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি উঠলো, যা তেলিনীপাড়ায় প্রথম। ইতিমধ্যে পল্লীটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন, তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-দুর্দশা ভালোবাসা-পরশ্রীকাতরতা ধর্মাচরণ-সাম্প্রদায়িকতাবোধ সব-কিছু জড়িয়ে তেলিনীপাড়ার এক বিশিষ্ট স্বকীয়তা।

ঊনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায়, বাইরের পৃথিবীতে বিবিধ আলোড়ন, তার সামান্য তরঙ্গ তেলিনীপাড়াকে স্পর্শ করে, অনেকটাই করে না। তবে মহামারী, মহাযুদ্ধ, চট শিল্পের, তথা জাতীয় অর্থব্যবস্থার, চড়াই-উতরাই, জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ক্রমশ-ঘন-হতে থাকা জটিলতা, তেলিনীপাড়ার জনসংখ্যা বাড়ে, রহমতউল্লাহ্‌র জাগতিক সাফল্যও সেই সঙ্গে। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় তার ও তার স্ত্রীর আকুল প্রার্থনা, সেই হেতুই, তার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বরের দোয়া, তার পুত্রসন্তান লাভ। পুত্র আকবর আলিকে ঘিরে শেখ রহমতউল্লাহ্‌র উচ্চাশা, আকবর আলি ইংরেজি ভাষায় তথা ইংরেজি বেশভূষা ও কেতায় দুরস্ত হয়, চন্দননগর কলেজে শিক্ষালাভ করে, চটকলের নব্য স্কট সাহেবদের সঙ্গে তার দোস্তি। ইতিমধ্যে রহমতউল্লাহ্ তেলিনীপাড়ার অগ্রণী পুরুষ বলে বিবেচিত, গরিবগুর্বো-উঠতি মধ্যবিত্ত তাকে মান্য করে। ধর্মপ্রাণ মানুষটি এক প্রাজ্ঞ গ্রাম্য ফকিরকে পরিত্রাতা মেনে সসম্মানে আশ্রয় দান করে, তার সচ্ছল সংসার ঘিরে সজ্জন বন্ধুদের নিত্য সমাগম, তাদের মধ্যে সব স্তরের মানুষের অধিষ্ঠান: কেউ শিক্ষক, কেউ ক্ষুদে

ব্যবসায়ী, কেউ গালিব-আওড়ানো কাব্যানুরাগী তথা বুদ্ধিজীবী, কেউ হয়তো চটকলের কুলিসর্দার, কিংবা স্থানীয় মাঝারি-গোছের কোনো পুলিশ কর্তা। তবে তেলিনীপাড়ায় কুচক্রীরাও জড়ো হয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটাবার লক্ষ্যে দৃঢ়কল্প ষড়যন্ত্রকারীরা। এরই মধ্যে, ওই সখা পুলিশ কর্তার দৌত্যে, অমৃতসরবাসিনী এক কাশ্মিরকন্যার সঙ্গে আকবর আলির বিবাহ, রহমতউল্লাহ্‌র পরিবারে নতুন সংস্কৃতির প্রলেপ। আকবর আলির ছেলে মুবাশের কনভেন্টে শিশুশিক্ষার তালিম নেয়, সেখান থেকে তার কলকাতা বয়েজ স্কুলে উত্তরণ, তার উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর প্রতিভার ক্রমউন্মেষ, প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন, অতি দ্রুত তার প্রথিতযশা সাংবাদিক ও লেখক হিশেবে আত্মপ্রকাশ বিখ্যাত এম. জে আকবর আদতে শেখ রহমতউল্লাহ্‌র আদরের পৌত্র মুবাশের।

রহমতউল্লাহ্‌ উদারচরিত পরোপকারী উঠতি গৃহস্থ, তার স্ত্রী সমপরিমাণ হৃদয়বতী, সব স্তরের পড়শি মহিলাদের সুখ-দুঃখে তার জড়িয়ে-থাকা, এমনকী পুত্র-সখা পাটের সাহেবরা যখন স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে যায়, তাদের অন্তত একজনের রক্ষিতাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দান। তা হলেও অশান্তির দহনজ্বালা এড়ানো সম্ভব হয় না। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে চিড় ধরাবার মতো কুচক্রীরা আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, যেমন পাড়ার মসজিদে অসহিষ্ণু মোল্লা কিংবা কোনো উগ্র সনাতনপন্থী রাম-নয়-তো-কৃষ্ণ-সেবক। তা ছাড়া, সন্দেহ না করে উপায় থাকে না, হাঙ্গামা বাঁধাবার জন্য বাইরে থেকে টাকারও আমদানি ঘটে। স্বভাবশান্ত তেলিনীপাড়াও তাই মাঝে-মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে, চোরাগোপ্তা ছুরি চালিয়ে নিরীহ মানুষ খুন, রাতের অন্ধকারে এই সম্প্রদায়-ওই সম্প্রদায়ভুক্তদের জীর্ণ বস্তিতে অগ্নিসংযোগ। বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষের দিকে একটা

সময়ে, অন্তত কিছু দিনের জন্য, অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল যে রহমতউল্লাহ্‌র সপরিবার পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে ছোটা। কিন্তু তার একবগ্গা উচ্চারণ, ভারতবর্ষের প্রতি আস্থা হারানো পাপ। সুতরাং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরিবারটির তেলিনীপাড়ায় প্রত্যাবর্তন। ঘোঁট-পাকানো মানুষের অভাব নেই, ভাড়াটে খুনি-গুণ্ডারও নেই, কিন্তু রহমতউল্লাহ্‌, আকবর আলি, মুবাশের জাভেদ আকবর, এই তিন পুরুষের কাহিনী, 'ব্লাড ব্রাদার্স', শেষ পর্যন্ত জীবনের কথা বলে, সামাজিক শুভের প্রতি প্রত্যয় জ্ঞাপন করে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে-বিচিত্র বিভিন্ন ধারার মিশ্রণ, তার জয়গান গায়।

যা পারিবারিক কাহিনী, রক্তমাংসের ব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্তান্ত, তাতে এখানে-ওখানে আকবর কল্পনার সংশ্লেষণ ঘটিয়েছেন : ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশে কাল্পনিক চরিত্রের হাজির হওয়া, অথবা দু'টি-তিনটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে একটি কাল্পনিক চরিত্রের ধৃতিতে বন্দী করা। চরিত্রগুলি হয়তো কখনো-কখনো কোনো আবেগ বা অভিসন্ধির প্রতীক, যার বিশ্লেষণে আকবর কোরানের ইতস্তত সূত্র মেলে ধরেছেন, অথবা হিন্দু পুরাণগাথার আশ্রয় নিয়েছেন; কখনো অবশ্য এই ধর্মীয় ইঙ্গিতগুলি কৌতুক বা ব্যঙ্গের রসে টইটম্বুর। প্রধান কাহিনীর শরীর জড়িয়ে অনেক উপকাহিনী : কোথাও তাদের একটি বাস্তব ভিত্তি, ধরে নিতে হয়, বর্তমান, কিন্তু আকবরের কল্পনা-সহকারশাখা তাদের অনেক-অনেক দূরে ঠেলে নিয়ে যায়।

আকবরের গদ্য ঝরঝরে, ঝকঝকে, কচিৎ তাতে দুষ্টুমির ঝিলিক। 'ব্লাড ব্রাদার্স' তাই তরতর করে পড়ে যাওয়া যায়, চরিত্রাবলির ভিড় থেকে সামলে-সুমলে বেরিয়ে আসি আমরা। এমন নয় যে বাস্তব ঘটনাবলির বৃত্তান্তে লেখক যথার্থ তথ্যের কক্ষপথ থেকে একটু-আধটু এদিক-ওদিক হেলে পড়েননি, তবে তা কখনো মারাত্মক বাড়াবাড়িতে

পর্যবসিত হয়নি। সুখপাঠ্য গ্রন্থ 'ব্লাড ব্রাদার্স', কিন্তু স্রেফ সুখভোগের জন্য পাঠকদের বইটি পড়বার অনুরোধ জানাচ্ছি না, হালকা চালে হলেও অনেক গভীর কথা এই বইতে উপ্ত ভোজপুরের গ্রামের সেই অনাথ ছেলে প্রয়াগের মতো, আমরা সবাই-ই নিজেদের ছাড়িয়ে যেতে পারি, মহত্ত্বের প্রকোষ্ঠে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শুধু নিজের উপর বিশ্বাসই নয়, পড়শিদেরও বিশ্বাস করা, তাদেরও কাছে টেনে আনা, পৃথিবীতে সহিষ্ণুতার কোনো বিকল্প নেই।

সব শেষে একটি বিষাদ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো। ইংরেজিতে লেখা বই, ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থাদির বিশ্ব-জোড়া বাজার। 'ব্লাড ব্রাদার্স'-এর নিহিত উৎকর্ষের সঙ্গে সুনিপুণ প্রচারের সাযুজ্য ঘটেছে, ধরেই নিতে পারি হাজার হাজার কপি স্বদেশে, এবং বিশেষ করে বিদেশে, বিক্রি হবে। অথচ গত এক-দুই দশকে, ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়, সম উৎকর্ষের সম গুণসম্পন্ন সম-ধর্মী এন্তার গ্রন্থ সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছে, যেহেতু সে-সব গ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা নয়, প্রচারের আলোচনাও, মরুপথে গতি-হারানো নদীর মতো, দ্রুত সমাপ্ত। 'ব্লাড ব্রাদার্স' অবশ্যই তার প্রাপণীয় স্বীকৃতি পাক, আমরা দু' হাত তুলে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাবো, কিন্তু সেই অভিনন্দন-মুহূর্তে প্রাদেশিক ভাষায় লেখা সম-আকর্ষক যে-সব গ্রন্থ খ্যাতির মুখ দেখলো না, তাদের জন্যও যেন দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলি।

বিশ্বায়নে ছুঁলে আঠারো ঘা

গোলামের জাত ছিলাম আমরা, গোড়ার দিকে সাহেবদের জন্য বল কুড়োতাম, সেই বল কুড়োতে কুড়োতেই হুকুমবরদারদের মধ্যে একজন-দু'জন স্বকীয় প্রতিভাবলে খেলাটা রপ্ত করে নিতে সফল হতেন। কেউ চৌকশ ব্যাট ঘোরাতেন, কেউ জোরে বা কায়দা করে কব্জি বা আঙুলের মোচড়ে আস্তে বল নিক্ষেপ রপ্ত করতেন, এমনি করেই এই গরিব দেশে সাহেবদের খেলা ক্রিকেটের গোড়াপত্তন। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে অবশ্য সাহেবরা ফুটবল-হকির জন্য যেমন, ক্রিকেটের জন্যও নিজেদের আলাদা-আলাদা আঞ্চলিক দল গড়েছিলেন, মাঝে-মাঝে কলকাতার সাহেব দল 'বন্ধুত্বপূর্ণ খেলা' খেলতো মাদ্রাজের বা বোম্বাইয়ের দলের সঙ্গে, এ-নগর ও-নগরের সাহেব-মেমসাহেবরা ছুটির দিনে ভিড় করে সে-সব খেলা দেখতে আসতেন। ক্রমে-ক্রমে হুকুমবরদাররা প্রধানত নিজেদের চেষ্টায়, তখনো-পর্যন্ত-সুসংরক্ষিত আগল ভেঙে ক্রিকেটের অঙ্গনে ঢুকে পড়লেন, ক্রমশ জাতিভেদ ঘুচালো, কিন্তু মান বাঁচিয়ে, এবং সুচিন্তিত উপায়ে, বর্ণভেদকে প্রশ্রয় দিয়ে : ইওরোপীয় দল, হিন্দু দল, মুসলিম দল, পার্শি এবং জগাখিচুড়িদের অন্য দল। তা ছাড়া অবশ্য বিভিন্ন

প্রাদেশিক দলের মধ্যেও প্রতিযোগিতা শুরু হল। তবে ওই কলোনিয়াল কালে এই উপমহাদেশে ক্রিকেট নিছক শহুরে খেলা, সাহেবদের বিনোদনের উপাদান, দেখাদেখি দিশি শহুরে বাবুরাও শীতের সকালে তাড়াতাড়ি ভাত-মাছের ঝোল খেয়ে খেলা দেখতে মাঠে হাজির হতেন। গরিব দেশ, যাঁরা ক্রিকেটে কুশলতার শীর্ষে পৌঁছুতেন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো দিশি নবাব-রাজা-মহারাজাদের কাছ থেকে অর্থানুকূল্য পেতেন। যেমন সি কে নাইডু, মুস্তাক আলিদের পুষতেন ইনদওরের হোলকার, উজির আলি-নাজির আলিদের কখনো পাতিয়ালার মহারাজা, কখনো পটৌডির নবাব সাহেব, দক্ষিণী অনেক খেলোয়াড়দের কৃপা জুটতো বিজয়নগরম-এর রাজার কাছ থেকে। কচিৎ একজন-দু'জন খেলুড়ে সওদাগরি দফতরে কাজ পেয়ে বর্তে যেতেন।

দেশটা তখন সত্যি-সত্যিই গরিব ছিল। ক্রিকেট খেলোয়াড়রা প্রধানত স্বয়ংশিক্ষিত, এর-ওর-তার কাছ থেকে উপদেশ-বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে ব্যাট করার কায়দা-কানুন উত্তম করে শেখবার লক্ষ্যে ব্রতী হতেন, অথবা কোন কেরামতিতে বলে আরো বেশি জাদু ঘটানো সম্ভব, সেই বিদ্যা আহরণে। হয়তো এখানে-ওখানে পৃষ্ঠপোষক রাজা-মহারাজারা কোনো থুত্থুড়ে বুড়ো অবসর-নেওয়া খেলোয়াড়কে ধরে এনে তাঁদের পোষ্য তরুণদের একটু-আধটু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। তবে সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না।

দেশটা এখনো গরিব আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর ষাট বছর গড়িয়ে গেছে, এই গরিব দেশেও দশ-পনেরো কোটি মানুষ বিশ্বায়নের কল্যাণে খাসা আছেন। দেশের এই শতকরা বড়ো জোর দশ ভাগ মানুষের যেমন হাল ফিরেছে, হাল ফিরেছে ক্রিকেট খেলারও, সেই সঙ্গে ক্রিকেট খেলুড়েদেরও। টেলিভিশনের মধ্যবর্তিতায় এখন গোটা পৃথিবীতে

যেখানেই ক্রিকেট খেলা দেখানো হোক না কেন, তা পাঁচ দিনের টেস্ট খেলাই হোক বা এক দিনের ধুমধাড়াক্কা ফাটকা, ঘরে বসে তা দেখবার সুযোগ এখন ভারতবাসীর কাছে সমুপস্থিত। ওই দশ-পনেরো কোটি ভারতবাসী, এই গরিব দেশেও যাঁরা সচ্ছলতায় ভাসছেন, তাঁরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে টেলিভিশনের পর্দায় খেলার মজা লুটছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বিরতির ফাঁকে-ফাঁকে, উইকেট পড়ে গেলে, কিংবা দুই ওভারের মধ্যবর্তী ক্ষণিক মুহূর্তে, বিজ্ঞাপনের সমাচ্ছন্নতাও তাঁদের চেতনা জুড়ে। এই দশ-পনেরো কোটি মানুষ হয়তো বছরে দেড় লক্ষ-দুই লক্ষ কোটি টাকার সওদা করেন, টেলিভিশনের পর্দায় যে-যে পণ্য বিজ্ঞাপিত হয়, ওই বিজ্ঞাপনের মোহিনী মায়ায় প্রধানত সে-সব জিনিশপত্রই তাঁদের চাহিদার কেন্দ্রবিন্দুতে। টেলিভিশনে ক্রিকেটখেলা প্রদর্শনের সঙ্গে তাই শিল্পের বিজ্ঞাপনের বাজার ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তারই অনুষঙ্গে অপেক্ষাকৃত দক্ষতর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভাগ্য ফিরেছে। কোনো রকমে যদি কোনো খেলোয়াড় এক বার জাতীয় দলে ঢুকবার সুযোগ পেয়ে যান, বিজ্ঞাপন দেনেওয়ালারা তাঁর পিছু ধাওয়া করবেন, তাঁদের বিজ্ঞাপিতব্য পণ্যাদির জন্য খেলোয়াড়টির কাছ থেকে শংসাপত্র সংগ্রহ করবেন, তেমন-তেমন হলে তাঁকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে চলচ্চিত্র বানিয়ে পণ্যের মহিমা কীর্তনের ব্যবস্থা করবেন। যুক্তিটা এ রকম : এই দশ-পনেরো কোটি শাঁসালো ভারতবাসী যেহেতু ক্রিকেটকে ভালোবাসেন, ক্রিকেট খেলুড়েদেরও তাঁরা অসম্ভব ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন; খেলুড়েরা তাঁদের হাসতে বললে তাঁরা হাসবেন, কাঁদতে বললে কাঁদবেন। খেলুড়েরা কোনো বিশেষ পণ্যকে যদি পয়লা নম্বর সার্টিফিকেট দেন, তবে ক্রেতাবাহিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে বাজারে ছুটে গিয়ে সেই জিনিশ কিনবেন।

শংসাপত্র বিতরণের কিমাশ্চর্য পরিণাম, ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট

দলের খেলোয়াড়দের অনেকেই এখন কোটিপতি; কয়েক জন হয়তো একশো-দুশো বা পাঁচশো কোটি টাকার অধীশ্বর। তাঁরা অবশ্যই উজ্জ্বল ঐশী প্রতিভার অধিকারী। কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত করেছেন অক্লান্ত অধ্যবসায়, অধ্যবসায়ের দীর্ঘ প্রহর অতিক্রম করে, তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে তাঁরা উচ্চ মানে পৌঁছেছেন।

গরিব দেশ, কিন্তু ক্রিকেট এখন উপমহাদেশে ধনৈশ্বর্যের স্বর্গোদ্যান। ক্রিকেটাররা সবাই পেশাদার, পেশার বরেই তাঁরা এত বিত্তশালী হতে পেরেছেন। এটা তাই অতি স্বাভাবিক যে, জাতীয় দলের এমন ভারি-ভারি খেলোয়াড়দের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হবে। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ তা-ই করেছেন। প্রথম পর্বে অবসর নেওয়া কোনো বিখ্যাত দেশী খেলোয়াড়, যিনি জাতীয় দলে একদা খেলেছেন, প্রশিক্ষক নিযুক্ত হতেন। কিন্তু বিশ্বায়নের ঠেলার নাম বাবাজি। সাত-আট বছর আগে নতুন ঋতু ও রীতির উন্মেষ। নিউজিল্যান্ডের জাতীয় দলের প্রাক্তন দলপতি, ইনিংস শুরু করিয়ে বিখ্যাত ব্যাটসম্যান, জন রাইটকে দিয়ে নতুন যুগের সূচনা। প্রায় পাঁচ বছর ভারতীয় দলের সঙ্গে রাইট নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর চুক্তি'র মেয়াদ ২০০৫ সালে শেষ হলে যিনি এলেন, তিনি আপাতত বহু আলোচিত, বহু বিতর্কিত গ্রেগ চ্যাপেল। চ্যাপেল খোদ বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান ছিলেন, এখন প্রশিক্ষণে ঝুঁকেছেন। নিজের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জন রাইট দুই সাংবাদিকের সহযোগিতায় ভারতীয় দলের সঙ্গে সময় কাটানোর তাঁর যে-অভিজ্ঞতা, তা নিয়ে বই লিখেছেন (জন রাইট্‌স ইণ্ডিয়ান সামার)। নিউজিল্যান্ড ছোট্ট দেশ, যদিও বৈভবে উপচে পড়া। তা হলেও সে-দেশে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা তেমন কিছু আহা-মরি উপার্জন করতে পারেন না। যে-দেশে একুনে মাত্র তিন লক্ষ মানুষ বসবাস

করেন, বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ সেখানে সীমিত হতে বাধ্য। জিনিশপত্রের বিপণনের জন্য খেলুড়েদের দেওয়া সাফাইয়েরও তাই ততটা চাহিদা নেই, তাদের উপার্জনও তাই আকাশচুম্বী নয়। রাইট-এর বইটি বিনয়ে ছাওয়া। তিনি সম্ভবত স্বভাবতই স্বল্পভাষী, ভেবেচিন্তে কথা বলেন, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছন, যাঁদের তিনি প্রশিক্ষণে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের যশ-মান-খ্যাতি ও বিত্তের নিরিখে তিনি নিতান্ত ছাপোষা। এটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই তিনি প্রশিক্ষণকর্মে অতি সতর্কতার সঙ্গে বিচরণ করেছেন। তাঁর উত্তরসূরি গ্রেগ চ্যাপেল ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে-যে দক্ষতার অভাব নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন, সেই ত্রুটিগুলি যে রাইট-এর চোখে পড়েনি তা নয়, তিনিও চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা দ্রুত রান নেওয়ার কৌশল ও দক্ষতা অর্জন করুন। কিন্তু রাইট প্রতিটি খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাদা করে মৃদু উচ্চারণে কথা বলা অভ্যাস করেছিলেন। আপাতকটু কথা হাসির মাধুর্য মিশিয়ে ব্যক্ত করতেন, কারো উপর গা-জোয়ারি খাটাতে যাননি। তিনি এটাও সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে উপমহাদেশীয় খেলোয়াড়দের শরীর ও পেশিশক্তির ওপর ততটা নির্ভর না করলেও চলে। তাঁদের কব্জি ঘোরানোর কুশলতা, কিংবা কোনো বিশেষ বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে বলকে ক্ষিপ্র গতিতে বাউন্ডারি পার করে দিতে তাঁদের আলাদা প্রতিভা, অন্য অনেক ঘাটতি পুষিয়ে দেয়।

রাইট তাঁর সাধ্যমতো ভারতীয় জাতীয় দলের খেলুড়েদের দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন, এবং, তাঁর কপাল ভালো, তিনি প্রশিক্ষক ছিলেন এমন বছরগুলিতে যখন পয়লা সারির ক্রিকেটাররা তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শনের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। এখানে-ওখানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে অথবা আবহাওয়ার কারণে কোনো খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। কোনো একটি বিশেষ দেশে, যেমন নিউজিল্যান্ডে, ফল

খারাপ হয়েছে। কিন্তু রাইট ভাগ্যবান, অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্যের বিজয়মুকুট তিনি অর্জন করতে সফল হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন খেলুড়েরা। সমসৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন তাঁর মেয়াদের পুরোটা সময় জুড়ে যিনি দলপতি, সেই সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়ও।

রাইট খুব সাবধানী। দলপতি সম্পর্কে অনেক প্রশংসাবাক্য বইটিতে প্রবিষ্ট। তা হলেও, সন্দেহ হয়, কোথাও বোধহয় পারস্পরিক মানসিকতার আড়াআড়ি ছিল। তিনি অনেক-অনেক বেশি উচ্ছ্বাসবান লক্ষ্মণ ও দ্রাবিড়কে নিয়ে। এবং তেন্ডুলকর অবশ্যই তাঁর কাছে মস্ত বিস্ময় বালক। রাইট আরো যা বলতে চেয়েছেন, তা মেনে নিতে কোনো পক্ষেরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় : প্রশাসক কর্তৃপক্ষ, প্রশিক্ষক এবং দলপতি, প্রত্যেকেরই আলাদা-আলাদা কর্তব্যভূমি আছে, যা সীমারেখার গণ্ডিতে বাধা। সীমা পেরিয়ে কেউ গেলেই সমস্যার উদ্রেক। রাইট-এর মেয়াদের অধিকাংশ জুড়ে ভারতীয় ক্রিকেটের একচ্ছত্র অধিপতি জগমোহন ডালমিয়া। প্রথম দিকে একটু ঘাবড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ায় রাইট-এর অসুবিধা ঘটেনি, বরঞ্চ বইটির সমাপ্তি পর্বে ডালমিয়াকে অকুণ্ঠ তারিফই করেছেন।

তবে রাইট ঘুরিয়ে, অতি সন্তর্পণে, যে-মোক্ষম কথাটি বলেছেন, তা মেনে নেওয়ার মতো মনামেজাজ ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসকদের বা খেলোয়াড়দের মধ্যে এখনো বিদ্যমান কি না, তা সন্দেহের। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, কিন্তু কাঁচা পয়সা হাতে এলেও স্বভাব নষ্ট হওয়ার অবশ্যসম্ভাবনা। বহু ইতস্তত করেও রাইট শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর ভয় হয়, ভারতের পয়লা সারির খেলোয়াড়রা আপাতত বিজ্ঞাপন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে টাকা করতে এত ব্যস্ত যে-ক্রিকেট তাঁদের কাছে প্রায় গৌণ। খেলার ঋতুর বাইরে যে সময়,

তাঁর অধিকাংশ তাঁরা ব্যয় করেন বিজ্ঞাপনচর্চার মৌতাতে নিমগ্ন থেকে টাকা করতে, ক্রীড়া অনুশীলনে নয়। অন্তত প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে এই গোছের মানসিকতা ও ব্যবহারিক প্রবণতা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ হয়তো খেলুড়েদের হাতে তুলে দিচ্ছেন না টাকা, কিন্তু পণ্যাদির জন্য শংসাপত্রে স্বাক্ষর করে তাঁদের জুটছে কোটি-কোটি টাকা। খেলার মাঠে গোল্লা পেলে বিজ্ঞাপন শিল্প থেকে উপার্জনও যে দ্রুত গোল্লায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা অনেকেই খেয়াল রাখছেন না।

রাইট ভারতের জাতীয় দলের প্রশিক্ষক হওয়ার সুযোগ পেয়ে গৌরবান্বিত, সেই গৌরববোধের কথা বহু বার জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভাবিত, টাকা করার প্রতিভা খেলার প্রতিভাকে বিনষ্ট করবে না তো?

বিশ্বায়ন ছুঁলে আঠারো ঘা, ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও।

'দুনিয়ানামা'?

সুহৃদজনদেব লেখা বই নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যে ঝুঁকি থাকে। অপক্ষপাতের ধনুর্ভঙ্গ অঙ্গীকারের পরিণাম সর্ব ক্ষেত্রে শুভ হয় না, যথাযথ স্থানেও প্রশংসার প্রকাশে হয়তো বায়কুণ্ঠা ভর করে। তা সত্ত্বেও যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিসর্জন দিয়ে তপন রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথা 'বাঙালনামা' সম্পর্কে সবব হতে সাহস করছি, তার হেতু যুগপৎ সহমর্মিতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ। কিছুদিন আগে নিজে একটি স্মৃতিভিত্তিক গ্রন্থ লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি কাজটি কত দুরূহ। আমিত্বকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে স্মৃতিচারণ সম্ভব নয়, অথচ প্রতি পদে, নেহাত অচেতনভাবেই, আত্মম্ভরিতার আস্ফালন-আশঙ্কা, নয়তো নিছক পুনঃপৌনিকতার ক্লান্তি। তপন রায়চৌধুরীকেও এই দুস্তর সংকটের দরিয়া পার হতে হয়েছে। তিনি যে কোনো কিছুর পরোয়া না করে আমার পথের পথিক হতে এগিয়ে এসেছেন, সে জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানানো আমার নৈতিক কর্তব্য। সমশ্রেণির অভিজ্ঞতার শরিক হিসেবে সহানুভূতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগটি তাই ব্যবহার করছি।

'বাঙালনামা' অতীব সুখপাঠ্য। তপনবাবুর বলবার ভঙ্গি সচ্ছল,

বাক্যগুলি তরতর করে বয়ে চলে, ভাষাতে কোনো কালোয়াতি বা দেখানেপনা নেই। তিনি গল্পের পর গল্প বলে যাচ্ছেন, আমরা আঁটো হয়ে বসে শুনছি। গোটা বইটি জুড়ে এই ফুরফুরে মেজাজের পরিবেশ অক্ষুণ্ণ; তাঁর সাহসিকতার তারিফ না করে উপায় নেই। (আমার মৃদু আপত্তি তাঁর একটি মুদ্রাদোষ নিয়ে · 'সত্যি বলতে গেলে', আমি জোড় হাত করে বলব, শ্রুতিরোচক তো নয়ই, সম্ভবত ব্যাকরণবিশুদ্ধও নয়।)

সব মিলিয়ে পাঠ্য হিসেবে 'বাঙালনামা' প্রথম শ্রেণি পাওয়ার যোগ্য রচনা। তবে আমার প্রথম সমস্যা স্মৃতিগ্রন্থটির নামকরণ নিয়েই। তপন রায়চৌধুরী রসিক মানুষ, তায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্। ভেবেচিন্তেই, এবং সহর্ষে, বইয়ের নাম রেখেছেন, নিজেকে নিয়ে যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করেই, 'বাঙালনামা'। কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? জন্মসূত্রে তিনি বরিশাল জেলার বাঙাল; তাঁর একুশ বছর বয়সে দেশভাগ, তবে তার আগে থেকেই, যবে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়ে ডাফ হস্টেলে দীর্ঘস্থায়ী ডেরা গাড়লেন, তখন থেকেই তাঁর বাঙালত্বের অবসান। এমনকী তার-ও আগে, ছুটিছাটায়, নিকটাত্মীয় ব্যারিস্টার তথা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের কলকাতাস্থ ইওরোপীয় অ্যাসাইলাম লেনের প্রাসাদোপম গৃহে তাঁর সতত আগমনের প্রভাবে, তপনবাবুর বাঙাল অস্তিত্ব কুড়ি পেরোনোর আগেই অনেকটা ঘুচে গিয়েছিল। 'বাঙালনামা'য় পৃষ্ঠাসংখ্যা বিন্যাসের হিসেব নিয়েও দেখুন, প্রায় চারশো পৃষ্ঠার বইতে বরিশাল তথা পূর্ববঙ্গ প্রসঙ্গ একশো পৃষ্ঠা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তেমন আর নেই। স্কটিশ চার্চ কলেজ-প্রেসিডেন্সি কলেজ-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন পর্বে যে-নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি গেছেন, তা তাঁকে অতি দ্রুত কলকাতাইয়া

নাগর করে তুলেছে। তারপর কলকাতাতে তরুণ অধ্যাপকরূপে তাঁর দিনযাপন বৃত্তান্ত, গবেষণায় উদ্যমী হওয়ার কাহিনী, বিভিন্ন বৃত্তের সখাসখী সমাচার, বিদেশে পড়তে যাওয়া, ইওরোপে বিস্তৃত পরিভ্রমণ ও পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতির গহনে অবগাহন, এক রোমাঞ্চ জাহাজে দেশে প্রত্যাবর্তন, নতুন দিল্লিতে মহাফেজখানায় ও পরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে অধ্যাপনা, সব শেষে গত শতকের সত্তরের দশকের গোড়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, পাকাপাকি অক্সফোর্ডবাসী বনে গিয়ে বিদেশে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপনা, মাঝে-মাঝে এই মহাদেশ-ওই মহাদেশ চংক্রমণ। এই ঠাসা কর্ম তথা বিচরণের পঞ্জিকায় বরিশাল বা বাঙালভূমি আর ফিরে আসার সুযোগ পায়নি। মানসিকতার দিক থেকেও, তপন রায়চৌধুরী তাঁর একাধিক বক্তব্য যথেষ্ট প্রাঞ্জল করে ব্যক্ত করেছেন, তিনি ঘোর বিশ্বায়িত পুরুষ, ভারতে অবসর কাটাতে তাঁর যেমন অসুবিধা হয় না, বিদেশে বসবাসেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। এমনকী তিনি পাণিগ্রহণ করেছেন যে-বিদগ্ধা অশেষ গুণবতী পরমাসুন্দরী মহিলার, তিনি পর্যন্ত নিকষ প্রবাসী বাঙালিনী, শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর কাটিয়েছেন, সেখানে সম্ভবত অনেক একদা-বাঙালের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে মনে হয় না নিজে পদ্মা কোনোদিন পেরিয়েছেন।

তপনবাবুর স্মৃতিগ্রন্থটির নাম, সেই প্রেক্ষিতে বিচার করলে, 'বাঙালনামা' রাখার বিশেষ যৌক্তিকতা নেই, 'অক্সফোর্ডনামা' লিখলেও তেমন আপত্তি উঠত না, তবে বোধহয় উপযুক্ততম নাম 'বিশ্বনামা', অথবা, লেখকের ঐসলামিক ইতিহাসবেত্তা সত্তার প্রতি সম্মান জানিয়ে, 'দুনিয়ানামা'।

তথাচ একটি ধন্দের মুখোমুখি হতে হয় 'বাঙালনামা'-র পাঠককে। তপন রায়চৌধুরী যতক্ষণ বাল্যস্মৃতিতে উদ্বেল হচ্ছেন, কীর্তিপাশা গ্রাম

ও বরিশাল শহরের কথা বলছেন, বলছেন গাঁয়ের বাড়ির আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিবর্গ দাসদাসীদের কথা, স্কুলজীবন, শিক্ষকবৃন্দ ও স্বাধীনতা-পূর্ব পূর্ববঙ্গে স্বদেশি তথা বিপ্লবী আন্দোলনের বৃত্তান্তে বিস্তৃত হচ্ছেন, অথবা নিজের বাবা-মা-দাদা-ভাই-বোনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করছেন, দেশভাগের পরিণতিতে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে গোটা পরিবারের কলকাতায় পৌঁছে স্রেফ টিঁকে থাকার সংগ্রামের বিবরণ পেশ করছেন, কলকাতায় কলেজে ঢুকে হস্টেলজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় মগ্ন হচ্ছেন, স্কটিশ চার্চ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে বুদ্ধিচর্চার ও প্রথম যৌবনের বিবিধ শিহরনের স্মৃতিবিন্যাসে উৎসাহী হচ্ছেন, তৎকালীন বন্ধুবান্ধবের কথা বলছেন, 'বাঙালনামা' উচ্ছল নিঝরিণীর মতো এগিয়ে গেছে। কলকাতায় প্রথমে গবেষণায়, অব্যবহিত পরে অধ্যাপনায় বৃত হওয়ার দিনগুলির বিবরণও সমান স্বচ্ছতাগুণসম্পন্ন। কখনো আনন্দউচ্ছল, কখনো ব্যথাবিধুর অভিজ্ঞতা, প্রিয়জনদের নিবিড় সখ্য ও সান্নিধ্য, বিভিন্ন-বিচিত্র মানুষের মনমোহিনী কাহিনী। (যেমন যে-আজব গুণী মানুষটির কাছে তিনি ফার্সি ভাষায় প্রথম তালিম নিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে হার্দ্য, মজাদার কথন); এই পর্বেও তপনবাবুর লিখন মুনশিয়ানার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে। অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবনে, এবং গবেষণাসূত্রে হল্যান্ডে বছর দুয়েক কাটানোর সময়, যে-সব অভিজ্ঞতা, সেই বর্ণনাও রসে ভরপুর। (হল্যান্ডে যে-আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের ছাত্রাবাসে-পরিবর্তিত একদা-রাজপ্রাসাদে তিনি ডেরা বাঁধেন, তাঁর আগমনের বছর দুয়েক আগে সেই ঠিকানায় আমিও ছিলাম, তাই তাঁর তখনকার পরিচিতবর্গের একজন-দু'জনের সঙ্গে আমারও আলাপ ছিল, তবে তাঁদের সম্পর্কে তপনবাবুর উপাখ্যানমালার সঙ্গে আমার গল্পগাছা হয়তো সর্বত্র খাঁজে-খাঁজে মিলবে না।) অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি

নিয়ে ফিরে দেশের রাজধানীতে প্রথমে জাতীয় মহাফেজখানায়, পরে দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্‌স-এ, যোগদান এবং কনস্টিটিউশন হাউসে অবস্থানের যে-ঋতু, তাব কাহিনী বিন্যাসেও তিনি নিপুণ, অন্তর্দৃষ্টির প্রক্ষেপণের সঙ্গে সরসতার সুচারু সম্মেলন। আমলাতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম মোলাকাতের বৃত্তান্তের বিশ্লেষণশক্তির সঙ্গে নাস্তিকতাবোধ গায়ে-গায়ে সাঁটা। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের জমজমাট বিবরণ ওস্তাদ লিখিয়েদেরও ঈর্ষার উদ্রেক করবে। পাশাপাশি মহাফেজখানায় সে-সময় কর্মরত নীরব জ্ঞানতপস্বী শৌরীন রায়ের বিষয়ে তপন রায়চৌধুরীর সশ্রদ্ধ অনুচ্ছেদগুলিও 'বাঙালনামা'-র মর্যাদা বাড়িয়েছে। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্‌স-এর অত্যুজ্জ্বল প্রথম পর্বে তিনি অধ্যাপকবৃন্দের অন্যতম ছিলেন; যেহেতু তিনি ঐতিহাসিক, সম্ভবত হংস মধ্যে বক হয়েই ছিলেন, তা হলেও অমর্ত্য সেন-সুখময় চক্রবর্তীদের মধ্যে সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাধরদের সঙ্গলাভ থেকে তিনি যে যুগপৎ হ্লাদিত ও উপকৃত হয়েছিলেন, অকুণ্ঠচিত্তে তা স্মরণ করেছেন।

এই পর্যন্ত 'বাঙালনামা' খাসা পাঠ্যবস্তু। সমস্যার শুরু এর পর থেকে। নিজের বিষয় নিয়ে গভীরতর চর্চা ও শিক্ষকতার সুযোগ পাবেন ভেবে স্কুল অফ ইকনমিক্‌স থেকে সরে গিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যে-আশা নিয়ে তপনবাবু যোগ দিয়েছিলেন, তা আদৌ পূরণ হয়নি। স্পষ্টতই স্কুল অফ ইকনমিক্‌স-এ বুদ্ধিবৃত্তির মগডালে পৌঁছনো সতীর্থদের সাহচর্য থেকে তিনি যে-তৃপ্তি কুড়িয়েছিলেন, ইতিহাস বিভাগে তার তুলনায় অনেকটাই খামতি ছিল। তা ছাড়া, তাঁর নসিব খারাপ, সম্ভবত ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপককুল, বয়সের দিক থেকে আরো একটু প্রবীণ ছিলেন, বোধহয় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে নির্দয়তাও বৃদ্ধি পায়,

কুচুটেপনা-দলাদলি-কলহবিবাদের কুশ্রী নর্দমায় তিনি নিপতিত হলেন। শিক্ষা বিস্তারের উৎকণ্ঠাসম্পন্ন, গবেষণার কন্দরে ঢুকে যেতে সদা-আগ্রহশীল কোনো অধ্যাপকের পক্ষে এই কুশ্রীতা মেনে নেওয়া দুরূহ। কলহবিবাদের মধ্যে আদর্শগত বিভেদের একটি নাতিতুচ্ছ ভূমিকা হয়তো ছিল, কিন্তু তা ছাপিয়ে প্রকটতর ভারতীয় তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বভাবজ কুটিলতা তথা পরশ্রীকাতরতা। অন্য একটি বিষয়ও এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে যতটুকু ক্ষমতাদখল ও ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ, সেখানে আমরা হামলে পড়ি, বীর্যের গদা ঘুরিয়ে কল্পিত অথবা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে অহোরাত্র আমাদের সাধনা। এই প্রবণতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও মোটেই দূরস্থানে নন।

এত নীচতা-তিক্ততার সঙ্গে সহবাস তপন রায়চৌধুরীর সহ্যের সীমানার বাইরে। কয়েক বছর অতিক্রান্ত হলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি বিদেশবাসী হলেন। সেই থেকে তপন রায়চৌধুরী প্রবাসী বাঙালি তথা ভারতীয় মনীষী, তাঁর অধ্যাপনা-গবেষণা-ধর্ম-কর্ম সব কিছুই অক্সফোর্ডকে ঘিরে। ওখানে অনেক শ্রুতকীর্তি পণ্ডিত মানুষের সাহচর্য ও সৌহার্দ্য থেকে তিনি আনন্দ ও ভরসা পেয়েছেন, বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়াদির শিক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতি, শিক্ষককুলের বিদ্যানুরাগ ও আচরিক সংস্কৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, অক্সফোর্ডের সু-উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত থেকে তপনবাবু মাঝে-মাঝেই দেশে শিক্ষাব্যবস্থার হাল নিয়ে হা-হুতাশ করেছেন, 'বাঙালনামা'র অনেকখানি জুড়ে এই বিলাপগাথা : হায়, পটনা বা জয়পুর বা গুয়াহাটি কেন অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের মতো সভ্য-ভব্য-সংস্কৃত নয়!

বিনয় সহকারে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের সমকক্ষই হবে, তা হলে আমরা অনুন্নত গরিবখানা হয়ে আছি কেন? আমাদের দারিদ্র-মালিন্য-কদাচার আমাদের দারিদ্রেরই অনুষঙ্গ। যেহেতু তপন রায়চৌধুরী একজন অগ্রগণ্য ইতিহাসবিদ, এটা যোগ করা সম্ভবত আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে যে ইওরোপীয় মনীষা-পাণ্ডিত্য-জ্ঞানসম্ভার-সংস্কৃতির উৎসমুখে অন্তত খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বাস্তবতা অস্বীকার করা বেয়াকুফ ব্যাপার। আমরা পিছিয়ে থাকার সঙ্গে ওঁদের এগিয়ে যাওয়ার একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। 'বাঙালনামা'র বেশ-কিছু জায়গায় তপনবাবু স্বয়ং এবংবিধ শোষণ সম্পর্কে তাঁর বীতরাগ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

আমার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, পরনিন্দা-পরচর্চা-ঘোঁট পাকানো বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও তেমন কিছু কম নয়। ওখানকার এক প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নামি অর্থনীতিবিদ তাঁর এক নিকটাত্মীয়কে তাঁর সুদৃঢ় সংকল্পের কথা জানিয়েছিলেন, 'আমার প্রথম কাজ হবে বিভাগ থেকে সমস্ত বামপন্থীদের ঝেঁটিয়ে তাড়ানো।' তবে এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে একটি পরিসূক্ষ্ম আস্তরণ থাকে। তথাপি, সেই একশো বছর আগেই তো দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখে গেছেন, বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা-রুপোর নয়।

অন্য একটি সমস্যাও সম্ভবত সমান প্রাসঙ্গিক। জাতির মুখোজ্জ্বলকারী বিদ্বজ্জনেরা যদি সবাই নীরদচন্দ্র চৌধুরী মশাইর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদেশবাসী হন, তাঁদের প্রতিভা ও জ্ঞানচর্চার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান থেকে দেশের ছাত্রছাত্রীরা তা হলে বঞ্চিত হবে। অবশ্য এ-সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও সিদ্ধান্তকে মান্য করতে হয়।

যেটুকু শুধু যোগ করবার, যাঁরা প্রবাসী ও বিশ্বনাগরিক-রূপে পরিচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের মুখে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপগত ও অধোগামী মান নিয়ে বাগবিস্তারে কোথায় যেন যুক্তির হ্রস্বতা আছে।

সে যা-ই হোক, গত পঁয়ত্রিশ বছর অক্সফোর্ড থেকে মাঝে-মধ্যে, অধ্যাপনা বা গবেষণাহেতু কিংবা নেহাতই পরিব্রাজকের আকাঙ্ক্ষা নিবারণের উদ্দেশ্যে, তপনবাবু বিভিন্ন মহাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, ক্যালিফর্নিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, গালাপাগোস থেকে আলাস্কা, কিছুই বাদ যায়নি; এ-সমস্ত জায়গায় অবশ্যই আরো অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। বইটির শেষের দিকে অধ্যায় জুড়ে প্রধানত ইত্যাকার ভ্রমণ তথা আলাপন কাহিনী, পড়তে একটু ক্লান্তিকর ঠেকে, হঠাৎ সন্দেহ হয়, কে জানে, বোধহয় এই কারণেই বইটির 'বাঙালনামা' নামকরণ : লেখক বাঙালদের হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন।

অবশ্য সব ভালো যার শেষ ভালো। অনেক আপাত-অগম্য পারাপার করে শেষ পর্যন্ত তপন রায়চৌধুরী তাঁর সুখী গৃহকোণে প্রত্যাবর্তন করেন, স্ত্রী-কন্যা-জামাতা-নাতনি নিয়ে তাঁর নিটোল সুখী সংসার, যা নিয়ে তাঁর পরিপূর্ণতাবোধের শেষ নেই।

সুতরাং আমিও প্রত্যাবর্তন করব আমার মুগ্ধতাবোধে। 'বাঙালনামা' পরম সুখপাঠ্য, সরসতায় টইটম্বুর, মাঝে-মাঝে, রসের অন্তর্বর্তী অলিন্দে, চিন্তার ভুবন। তপনবাবুকে অভিনন্দন জানানোর অন্য কারণটি গোড়াতেই ব্যক্ত করেছি। আত্মস্মৃতি-রচনা ভারি বিপদসঙ্কুল প্রয়াস, অহমিকা বিচ্ছুরণের কাদা এড়িয়ে প্রতি পদে এগোতে হয়। স্মৃতিচারণে অবতীর্ণ হয়ে কয়েক বছর আগে আমাকে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। লেজ-কাটা শেয়ালের আত্মপ্রসাদ নিয়ে তাই আমি তপনবাবুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি।

সমাজঅব্যবস্থা

সংবাদে নেই, বিসংবাদে নেই, মাঠে-ঘাটের কলকোলাহলেও তিনি বরাবর অনুপস্থিত, অথচ প্রফুল্ল রায়ের সমাজসচেতনায় খামতি নেই। আত্মপ্রচারের ধারকাছ দিয়ে কোনো দিন হাঁটেননি, বিবেকবান সাহিত্যিক হিশেবে মঞ্চে বুক চিতিয়ে দাবির আত্মম্ভরিতা থেকে সরে থেকেছেন বহু যোজন দূরে, অথচ সমাজদর্শন তাঁর সাহিত্য দর্শনের সঙ্গে সর্বক্ষণ অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে। সর্ব অর্থে নিঃশব্দ সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়, সেই নিঃশব্দতাই তাঁর রচনাগুলিকে জোরালো বাঙ্ময়তা দিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রসায়ন তাঁকে যে-সত্যে উপনীত করেছে, পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যজীবনভর তা তিনি পৌঁছে দিয়েছেন পাঠককুলকে। সৎ সাহিত্যের এর চেয়ে বড়ো অভিজ্ঞান আর কী হতে পারে।

যেটা বাড়তি বলা প্রয়োজন, প্রফুল্ল রায়ের রচনাবিন্যাসে কোথাও ভণিতা নেই, ভড়ং নেই, নেই কোনো ভুজুংভাজুং-ও। শাদামাটা শব্দ-সহ পর পর বর্ণনার পরিবেশন, যে-বর্ণনার মধ্যে নিহিত আগুন কিন্তু তাঁর ভাষাকে স্পর্শ করে না। ভাষার অপক্ষপাতিত্ব এবং সারল্য অটুট রেখেও তিনি অসমসাহসী—কাহিনী, কাহিনীর পর কাহিনী বয়ন

করে যান। এই নৈপুণ্য ঐশী অনুদান বলে ভাবা ভুল, এর পিছনে অনেক অধ্যবসায়, চিন্তা ও চিকীর্ষার ইতিহাস।

অন্য অনেক লেখকের ক্ষেত্রে যে-চাতুরীর অভিযোগ তোলা সম্ভব, প্রফুল্ল রায়ের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে তা অনুপযুক্ত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জারকে নিষিক্ত তাঁর কলমচারিতা। ধূসর শৈশবে পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে সহায়সম্বলহীন ভেসে বেড়ানোর উপাখ্যানই তো তাঁর প্রথম পর্যায়ের লেখাগুলির উপজীব্য, অনাড়ম্বর বিবরণে হঠাৎ-মাথায়-বাজ-পড়া উদ্বাস্তু মানুষগুলির বৃত্তান্ত ইতিহাসের মূল্যবান উপদলিল হয়ে থাকবে। সমসাময়িক প্রজন্ম সে-সব উপাখ্যান পাঠান্তে কতটুকু বিচলিত হয়েছিলেন, রাজনৈতিক মহলেই বা কতটা ভাবনা বা যন্ত্রণার উদ্রেক ঘটেছিল, ইত্যাকার প্রসঙ্গ যদি আপাতত সরিয়েও রাখা যায়, প্রফুল্ল রায়ের প্রথম পর্বের লেখাগুলি পেড়ে নিয়ে পড়বার, এবং তা থেকে জ্ঞানলব্ধ হওয়ার, সুযোগ এখনো নিঃশেষ হয়নি।

তবে অতীতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিলাপ-মন্থনে নিজেকে আটকে রাখেননি প্রফুল্ল রায়। তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা যখন মধ্যগগনে, দিগন্তকে এক বিকল্প-প্রান্তে প্রসারিত করেছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার পর বিহারের উত্তরাঞ্চলে কিছু কাল তাঁর স্থিতি। দরিদ্রতম ভারতীকে না দেখে তাঁর উপায় ছিল না। দরিদ্রতম মানুষজন, শোষণের মধ্যবর্তিতায় দরিদ্রতম; দ্বিবিধ শোষণ : শ্রেণিভিত্তিক, ভূমিভিত্তিক শোষণ, জমিদার-মহাজনরা লেঠেল-বন্দুকবাজদের সহায়তায় যার বুনিয়াদ রচনা করে, সেই সঙ্গে বর্ণভিত্তিক শোষণ, জাতপাতের ক্রূর জাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানব সম্প্রদায়। দুটি শোষণের ধারা উত্তর ও মধ্য বিহারের পরস্পরের শরীরে লেপটে গেছে। এমন আশ্লেষের কী ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে তা নিয়ে

বর্তমান 'কাহিনীসংগ্রহ', ছটি উপন্যাস অথবা বড়ো গল্প, সেই সঙ্গে গোটাদশেক ছোটো গল্প।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বিখ্যাত ভূমিসংস্কারক তথ্য সমাজবিজ্ঞানী উল্ফ লাডিজেন্‌স্কি বিহারের বাতাইদার-সঙ্কুল পল্লী অঞ্চলে শোষণ কতটা কদর্য, বীভৎস রূপ নিতে পারে, এক প্রতিবেদনে তা পরিবেশন করে রাজনৈতিক নেতৃকুলকে ঈষৎ অপ্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু সহজেই সামলে নেন ওঁরা। অবস্থার কোনো পরিবর্তন যে হয়নি, প্রফুল্ল রায়ের কাহিনীগুলি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সামান্যসংখ্যক কিছু মানুষ যেহেতু তাঁরা ধনবান তথা ভূমাধিকারী, যেহেতু তাঁরা উচ্চবর্গীয়, যেহেতু তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন, তাঁরা সমাজের অধিকাংশ মানুষকে শুষে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছেন। বেশির ভাগ এই মানুষগুলি, যারা সর্বস্ব খুইয়ে বসেছে, তা হলেও তারা বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে, নীড় বাঁধে, সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসায় ঘিরে রাখে, আর আশা পোষণ করে, হয়তো তাদের জীবন-দুর্গতির একটু হেরফের ঘটবে কোনো জাদুমন্ত্রবলে। তারা গরিব হতে পারে, তা বলে মহৎ হতে বাধা তো নেই! যেমন 'ভাতের গন্ধ' কাহিনীর দম্পতি ধানোয়ার ও লাখপতিয়া। বহু মাস বাদে তাদের বাড়িতে ভাত রান্না হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরা অভুক্ত থেকে সেই অন্ন তুলে দেয় অন্যের মুখে, অপরের তৃপ্তিতেই তাদের তৃপ্তি।

অভিজ্ঞতার টিবিতে দাঁড়িয়ে আছেন বলেই আশা ছেড়ে দেননি প্রফুল্ল রায়, বাঙালি কবি বঞ্চনাদ্বীপ পার হয়ে নব-সমুদ্রের ঠিকানা নিয়ে যে-প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর প্রতিধ্বনি এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত 'ধর্মান্তর' ও 'আকাশের নীচে মানুষ' কাহিনীদ্বয়ে। নিজের সন্তানকে 'বড়ে সরকার'-এর লোকজন পিটিয়ে প্রায় শেষ করে দিচ্ছে,

আবহমান কাল ধরে গৈরনাথ জেনে এসেছে তার ধর্ম এই নৃশংসতাকে নতমস্তকে মেনে নেওয়ার মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ তার ধর্মান্তর ঘটে, 'হোঁ-শি-য়া-র—হোঁশিয়ার— হোঁ-শি-য়া- র', উচ্চগ্রামে সে লাফিয়ে উঠে ছেলেকে আগলে দাঁড়ায়। অনুরূপ আশাব্যঞ্জক 'আকাশের নীচে মানুষ' কাহিনীটি। হাজার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমিদার মহাজন-গোছের মানুষরা, ভয়ের সঙ্গে ভক্তির রসায়ন ঘটিয়ে, ছোটা আদমিদের ভোট আদায় করে নির্বাচনের মরসুমে মিষ্টি-মিষ্টি বলে, 'আমি তো তোদেরই একজন, তোদেরই লোক'। এ ধরনের বুজরুকি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে রঘুনাথের মতো অতি নিঃস্ব মানুষও হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে চিৎকার শুরু করে: 'ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনিকো আদমী নেহী'!

এই সংগ্রহগ্রন্থে 'প্রস্তুতিপর্ব' ও 'শান্তিপর্ব' দুই কাহিনীর পটভূমিকায় কিছু মিল আছে, সমাপ্তিতে নেই। বিহারের ছোটো মফঃস্বল শহর, অর্জুন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান, সরকারি চাকুরে, তার কী মতি হলো, কমলা নাম্নী এক অচ্ছুৎ কন্যাকে বিয়ে করবার ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসলো। শহর তোলপাড়, ব্রাহ্মণের সঙ্গে অচ্ছুতের বিয়ে নেহি চলেগা-নেহি চলেগা। দাঙ্গা লাগার উপক্রম, প্রশাসনও চিন্তিত, সন্ত্রস্ত। শেষমেষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গুটিকয় নাগরিকের প্রয়াসে মধুরেণ সমাপয়েৎ। কিন্তু শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে। 'শান্তিপর্ব' এক প্রতীপ, বিষণ্ণ কাহিনী। বিহারের অখ্যাত শহরের প্রতিবেশী দুই জমিদারবংশ, মিশ্র আর দুবে, ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি। দুবে মহাশয়ের রাজনৈতিক উচ্চাশা, রাজ্যের মন্ত্রী থেকে ক্রমশ খোদ কেন্দ্রের মন্ত্রী বনবেন, তার জন্য বহু আগে থেকেই ছক কষেছেন, মিশ্রজির কন্যাকে পুত্রবধূ হিশেবে বেছে রেখেছেন। সেই কন্যাকে নতুন দিল্লির কনভেন্টে পড়িয়ে, শৌখিন কলেজে শিক্ষা দিয়ে মেমসাহেব বানিয়ে নিজের একান্ত সচিব হিশেবে দেখতে চান তিনি, মন্ত্রীগিরি করতে

গেলে চোস্ত্ ইংরেজি বলিয়ে-কইয়ে সুন্দরপানা একান্ত সচিব দরকার! কিন্তু কী সর্বনাশ, ভাবী পুত্রবধূ দিল্লিতে মেমসাহেব বনতে গিয়ে সমাজসেবীদের পাল্লায় পড়লো, সমাজসেবায় উৎসর্গপ্রাণ এক তরুণ অধ্যাপকের প্রতি আসক্ত হলো, যে-তরুণ আদতে অচ্ছুৎ থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। অনুরাগের পরিণামে ভাবী পুত্রবধূর ভ্রূণ সঞ্চার, এর চেয়ে লজ্জাকর অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে কিছু হতে পারে না। অথচ, শেষ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধ হলো না। দিল্লি থেকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে এনে গর্ভপাত ঘটানো হলো, মহা জাঁকজমক সহকারে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করে তারপর গর্ভশুদ্ধি। দুর্বৃত্তের উচ্চাশা কোনো প্রতিবন্ধকতা মানতে নারাজ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের শুচিতা হয়তো অক্ষুণ্ণ রইলো, অথবা রইলো না, কিন্তু মন্ত্রিত্ব মানেই বৈভব, সেই মন্ত্রিত্ব লাভের পরিকল্পনায় কন্যাটিকে বিনিয়োগ হিশেবে ব্যবহার করে হয়েছিল, বিনিয়োগকে কি নষ্ট হতে দেওয়া যায়? প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে যেন কপট-কুটিল গোটা সমাজব্যবস্থাকে ধিক্কার দেয়।

ছোটো গল্পগুলির মধ্যেও অনুরূপ সমাজবোধ, সমাজযন্ত্রণা। আমার বিশেষ পক্ষপাত 'জাহান্নামের গাড়ি' গল্পটির প্রতি। পুরনো আমলের অভিজাত বিদেশি মোটরগাড়ি, বৃদ্ধ মাসুদ জান একদা যার চালক। প্রথম মালিক এক লম্পট সাহেব, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে পর পর দু-তিন জন বাইজি সেই গাড়ির মালিক হয়েছেন, মাসুদ জান তাঁদের চালক হিশেবে বহাল থেকেছেন। সব শেষে যে-বাইজি মালিক ছিলেন, তাঁর জৌলুস কমে এলে দয়াপরবশ হয়ে শস্তায় সেটি মাসুদ জানকেই বেচে ছিলেন। মাসুদ অতঃপর স্বত্বাধিকারী তথা চালক। এক বেস্তওলা বিহারী তার রক্ষিতার জন্য গাড়িটি কিনতে আগ্রহী। মাসুদ রাজি হলেন, গাড়ি নিয়ে পটনা যাওয়ার পথে ঘটনা বাঁক নিল। পশ্চিম বাংলা থেকে বিহারে পাচার হতে-যাওয়া চারটি তরুণীকে উদ্ধার করে

গাড়ি নিয়ে মাসুদ জান কলকাতায় ফিরলেন। যে-গাড়িতে একদা বহু লাম্পট্য ও জাহান্নামের লীলা সংঘটিত হয়েছে, এতদিন বাদে, সেই গাড়ির ভাগ্যলিখনের, মাসুদ জান স্বগত ভাবলেন, এটাই পুণ্যতম পরিসমাপ্তি।

প্রফুল্ল রায়, দোহাই, কলম থামাবেন না।

বাংলার নানা মুখ

বিদ্রূপরূপী বিধাতার পরাক্রম থেকে কারো অব্যাহতি নেই। 'পুরাতন ভৃত্য' কিংবা 'পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে' লেখবার দায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে আমৃত্যু বহন করে যেতে হয়েছে। জীবনানন্দের দুর্ভোগ অবশ্য শুরু তাঁর মৃত্যুর পর। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' এই উচ্চারণের প্রতি প্রত্যয় জানিয়ে তিনি যে-কবিতামালা রচনা করেছিলেন, অথবা সিগনেট প্রেস যে-কবিতাগুচ্ছ নিয়ে 'রূপসী বাংলা' শিরোনামে সাজিয়ে বাজারে বই পরিবেশন করেছিলেন, সেগুলি, অন্তত আমার বিবেচনায়, তাঁর নিকৃষ্টতম রচনা, প্রধানত বাংলার নিসর্গ শোভার বিবরণ ঠাসা এক ধরনের সানুনাসিকতা, যাকে তাঁর শব্দব্যবহারের জাদুকাঠিও মহত্ত্বের স্পর্শ দিতে পারেনি।

সে কথা থাক। জীবনানন্দ বাংলার যে-রূপ দেখেছিলেন, তা নেহাতই প্রকৃতিলগ্ন। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছগাছালি, নদী-খাল-বিল, রাত্রির স্তব্ধতা, দিনের আকৃতি সব কিছু জড়িয়ে নিয়ে সঘন প্রথাগত রোমান্টিকতা। হয়তো জীবনানন্দকে তির্যক ব্যঙ্গ করবার অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়েই রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আজ-থেকে-আট-বছর আগে প্রকাশিত গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'বাংলার মুখ'। তাঁর

বয়ানে ধরা পড়েছে এক অন্য বাংলা, অবশ্যই খণ্ডিত বাংলা, পূর্ববঙ্গ, যা থেকে রাজনীতির নিয়তিতে, ভূগোলের কারণেই, অপসৃত। তা ছাড়া রাঘবের কথকতা-বর্ণনা-বিশ্লেষণের অভিমুখ বাংলার প্রাকৃতিক লক্ষ্মীসম্ভার নয়, বাংলার অতি সাধারণ মানুষজন, যাঁদের পোশাকি ভাষায় এখন নিম্নবর্গীয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়, শোষিত-বঞ্চিত-পদদলিত-শতলাঞ্ছিত মনুষ্য শ্রেণি রাঘব-দৃষ্ট বাংলার রূপ রচনাকার। সেই সঙ্গে উপস্থিত আর এক ধরনের প্রান্তিক মানুষ, যাঁরা ঘটনাক্রমে, অথবা ইতিহাসের পীড়নে, সমাজের বাইরে চলে গেছেন, ডাকাত-গুণ্ডা-সিঁদকাটার অক্ষৌহিণী বাহিনী। বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখনই এ-সমস্ত লেখা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যায়। যে-মানুষগুলি আসলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ, রাজ্যের সামাজিক তথা আর্থিক পরিকাঠামো টিকিয়ে রাখতে যাঁদের ভূমিকা অপরিহার্য, চোখে আঙুল দিয়ে তাঁদের বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন রাঘব। এমনধারা মানুষজনদের জড়িয়ে কিছু-কিছু উপাখ্যান সেই কবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের শুনিয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরসূরির সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয়। কিন্তু রাঘব দাবি করতে পারেন, সাহিত্যের বাস্তবতাকে সেলাম জানিয়েই তিনি আরো এগিয়ে গেছেন, উপকথা বা অলীক বলে তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির বিচরণ-আচরণ উপেক্ষা করা যাবে না। ঘাটে-মাঠে-বনে-বাদাড়ে ঘুরে তিনি তাঁর লেখার রসদ সংগ্রহ করেছেন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন-অনুবেদন ঘেঁটেছেন, বহু ক্ষেত্রে মানুষগুলির-নিজেদের-বলা মুখের কথা, আঁটোসাঁটো-ধাপে-ধাপে সাজিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় তিনি হন্যে হয়ে ঘুরেছেন, উত্তরের জেলাগুলিও বাদ পড়েনি। আলোকিত চরিত্রগুলির টিকে থাকার টিকে না-থাকার বর্ণনা, তাঁদের স্বপ্ন-দেখা ও

স্বপ্নহীনতার বিবরণ, তাঁদের জেদের কথা, ঘোরের কথা, সংগ্রামের কথা, আত্মসমর্পণের কথা নিপুণ বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর কথনে যেমন উঠে এসেছে সুমি বেসরাদের শাল-মহুয়ার জঙ্গল কেটে জীবনধারণের কাহিনী, তেমনই এসেছে বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে সমাজ-অব্যবস্থার আপাত-অমোঘ নিয়মে হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া মেয়েগুলির কথা : হয়তো ঠিকেদারেরা এসে তাদের ভিনরাজ্যে বিয়ে দিতে কিংবা বিয়ে দেওয়ার নাম করে নিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা আর ফেরেনি, ফেরে না কখনো। আমরা সেই সঙ্গে রাঘবের সৌজন্যে পড়তে পারি রাক্ষুসে বোয়াল মাছের সঙ্গে লড়াই করে জেতা বঙ্কিম মাঝির বৃত্তান্ত। পাশাপাশি পড়ি তিস্তার পরাক্রমে বানভাসি পলিভূমিতে ঘর-বাঁধা সারা বছর অর্ধভুক্ত লোকগুলির কথা, যারা হাতির সঙ্গে মিতালি করে, আবার বুনো হাতিকে খেদায়। হঠাৎ মনকে স্নিগ্ধ করে দেয় রক্তমাংসের জঙ্গল সাঁওতাল ও তাঁর স্ত্রী পাঞ্চো-র কাহিনী। ভদ্রলোকের পণপ্রথা কী করে গরিবগুর্বোদের সংসারে সমস্যার সঞ্চার করে তার নিখুঁত বিবরণ, কাছাকাছি জায়গা করে নিয়েছে বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তসংলগ্ন গঙ্গা নদীর অববাহিকায় গদাইচরের ঠিয়া জলদস্যুদের লোমহর্ষক পাঁচালী। দুঃখের কাহিনী, বঞ্চনার কাহিনী, কুসংস্কারের কাহিনী, অথচ এর মধ্যেই হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে যায় ঈষৎ আস্তিকতার আভাস। হ্যাঁ, পাল্টাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ পাল্টাচ্ছে। একটু-একটু করে উন্নয়নের রেশ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, যার প্রমাণ আমলাশোলের ময়ূরঝরনা, কিংবা সমুদ্রে মাছ শিকারে যাওয়ার জন্য গোটা গ্রামকে উদ্বুদ্ধ করা অলিচকের রমানাথ জেলে। বাঁশপাতা দিয়ে নাড়ি কাটার ঋতু যদিও অবসিত নয়, হরিহরপাড়ার আমান স্কুলের কথাও কিন্তু কানু মুচির মুখ থেকে শোনার সুযোগ হয় আমাদের।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর গড়িয়ে গেছে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামবিহার তবু চলেইছে। 'বাংলার মুখ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি নতুন কিছু রচনা যোগ করেছেন। সংযোজিত লেখাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের ''৪২-এর লড়াই, বন্যা, দুর্ভিক্ষ' এবং 'নুন মারা পিছাবনির আখ্যান' · ১৯৪২ সালে তমলুক-কাঁথি অঞ্চলে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বন্যার কাহিনী-সমৃদ্ধ কথকতা। এই রচনা দু'টিতে ইতিহাস ব্যাখ্যানের সঙ্গে মানবিকতাবোধ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। তবে সংযোজিত অন্য লেখাগুলির চরিত্র অনেকটাই আলাদা। শুধু যে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখার দৃষ্টি পাল্টেছে তা নয়, তাঁর আস্তিকতায় অবশ্যই গ্রহণ লাগতে পারে, যা দিনকাল, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য-কিছুও ঘটেছে; যা তাঁকে এক চিন্তার দোদুল্যমান উপত্যকায় উত্তীর্ণ করেছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যবর্তিতায় গ্রামের কঙ্কালগোছের মানুষগুলি হয়তো কিছুটা উন্নয়নের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনীতির অনুপ্রবেশ, রাজনীতি থেকে মারদাঙ্গার সূত্র ধরে লাশের পর লাশ পড়ে যাওয়া, যে-লাশগুলি আর শহিদের সম্মান পায় না, তারা কঙ্কালে পুনঃপ্রবর্তিত হয়। গ্রাম্য মেয়ে কুসুমের প্রতি শশী ডাক্তারের যে-অনুযোগ ছিল তার কি শরীর নেই?— রাঘব সেই সূত্র ধরেই যেন জিজ্ঞাসায় পৌঁছন · 'কঙ্কাল, তোমার কি রাজনীতি নেই?' অথচ, রাজনীতি থাকার পরিণামেই জ্যান্ত শরীরগুলি ফের কঙ্কালে পরিণত হয়। তা হলে, রাঘব যে সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিতে এখনো রাজি নন, তার প্রমাণ 'পঞ্চায়েত এবং কর্তার ভূত' রচনাটি।

উত্তরবঙ্গে জনজাতির জেহাদ, সেই সঙ্গে ছোটোলোকদের সর্বত্র বড়োলোক হওয়ার শখ কিংবা বাই, তা নিয়ে উথালপাথাল। গ্রামাঞ্চলের এক জগাখিচুড়ি চেহারা, যার বিবরণ রাঘব 'নিধিরামের গণতন্ত্র' প্রবন্ধে উল্লেখ করে আপাতত গ্রামবৃত্তান্তে ভঙ্গ দিয়েছেন।

মুশকিল হলো, ইতিহাস তো ফুরিয়ে যাওয়ার বস্তু নয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্য এক ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্যপ্রকাশিত অন্য গ্রন্থ 'আশমানি কথা : উচ্ছেদের ৫ কাহন' এই বদলে-যেতে-থাকা বৃহত্তর কলকাতাকে নিয়ে। এখানে অন্য এক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি আমরা। তিনি ক্রুদ্ধ, তিনি শ্লেষাশ্রয়ী, তিনি অন্ধকার ভেদ করে কোনো আশমানি স্বপ্ন আপাতত দেখাতে পাচ্ছেন না। যে-পঞ্চকাহিনী তিনি পরিবেশন করেছেন, তাদের তেমন স্পষ্ট আলাদা অবয়ব নেই, যেটুকু আছে, তা-ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন, টুকরো-টুকরো বিভিন্ন উপাখ্যান একে অন্যের অঙ্গে মিলিয়ে গেছে। মেছোভেড়ি ভেঙে শহরের আয়তন বাড়ছে, বস্তিতে-বস্তিতে সর্বস্ব-হারানো উদ্বাস্তুদের ভিড়, পাড়ার একটি-দু'টি বনেদি বাড়ির আধুনিক-চিন্তায়-বেড়ে-ওঠা মেয়ে দ্রুত অন্যরকম হতে-থাকা পরিবেশের ঝাঁকুনি সহ্য করতে না পেরে কোথায় হঠাৎ উধাও। খালপাড়ের ঝুপড়িবাসীরা বুলডোজারের শিকার হচ্ছে, তাদের জীবনের আদৌ কোনো দাম নেই, অসুখে ভুগে, অথবা পুলিশের রাইফেলে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে, কিংবা ঠিকাদারের কেরামতির চাপ সহ্য করতে না পেরে, তারা ভূতপূর্ব বনে যাচ্ছে। দখনে অঞ্চলের এক অতি অভাবী ঘরের অনাথ সন্তান নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শবাদী অধ্যাপক হিশেবে টিকে থাকতে চায়, পারে না; তাকে নির্মম-নিস্পৃহ রাজনীতির শিকার হতে হয়। একই রাজনীতির শিকার হচ্ছেন একদা-আদর্শবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্যন্ত্রণার সঙ্গী হতে আমরা অনেকেই নাম লেখাবো। সমস্যাটি অন্যত্র। তাঁর হতাশা, রোষ ও বেদনাবোধকে প্রকাশ করতে যে ভাষাবিন্যাস তিনি বেছে নিয়েছেন, তা কিন্তু তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুবার সাধনায় বাগড়া দিতে পারে। তিনি বর্ণনাতে

সমাজতত্ত্বের পালিশ দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে ব্যঙ্গের ঠাসবুনোনি, এই প্রকরণের অনুষঙ্গে ভাষাব্যবহারে এক দুঃসাহসী বিপ্লব; সাহিত্য-সাংবাদিকতার অভ্যস্ত ভাষার সঙ্গে বস্তির ভাষা সচেতন ভাবে যত্রতত্র তিনি জুড়ে দিয়েছেন, সমাজব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করবার মহান উদ্দেশ্যে; কখনো বা ব্যঙ্গকে উচ্চকিত করার লক্ষ্যে সাধু ভাষায় পঙ্‌ক্তি যোজনা করেছেন। এখানেই প্রশ্ন। বস্তির মানুষদের দুর্দশা তথা সর্বনাশের কথা লিখছেন বলেই তাঁদের অভ্যাসগত খিস্তির ভাষা ব্যবহার করা অবশ্যপ্রয়োজন, তা প্রমাণ করতে তাঁকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। আপাতত তাঁর লেখা তো বস্তিবাসীরা পড়বে না, পড়বো আমাদের মতো ফেরেব্বাজ দুরন্ত তথাকথিত মধ্যবিত্তকুল। তবে যদি রাঘব ঘোষণা করেন, তিনি এদের পশ্চাদ্দেশে পদাঘাত করবেন, তা হলে নটেগাছটি এমনিতেই মুড়োবে।

রাঘব অকপট সত্যবাচনে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন, তাঁর সাহসকে কুর্নিশ জানাই, তাঁর আবেগকে সম্মান তথা শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তা হলেও তাঁকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি, কোন মধ্যবর্তিতায় তিনি বুকের ভিতর যে-আগুন জ্বলছে, তাকে প্রকাশ করবেন। অনেক সময় যা বলতে চাই, তা একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বললে ফল শুভতর হয়। যে সমাজব্যবস্থা নিয়ে বলছি, তা তো ঘোরালো-প্যাঁচালো, তাকে কব্জা করতে গেলে ভাষায় একটু ঘোমটা টানা হয়তো জরুরি।

আভিধানিক

যা পরিস্থিতি বাংলা ভাষাই আর তেমন বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় বাংলা অভিধান নিয়ে মাতামাতি ঈষৎ অশ্লীল বলে বিবেচিত হতে পারে কারো-কারো কাছে। অন্য পক্ষে অন্তত একজন-দুজন বিবেকবান মানুষ ভাবতে পারেন, যদি অভিধানের বিশুদ্ধতার দৃষ্টান্ত দিয়ে নতুন করে সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করা সম্ভব, তা হলে হয়তো কেউ-কেউ, নিছক লজ্জাবশতই, ভাষাচর্চায় ফিরবেন। এখানেই, আমি বলবো, অভিধান রচনার সামাজিক সার্থকতা। অভিধানের মধ্যবর্তিতায় আমি নিজের ভাষাকে চিনছি-জানছি, সেই ভাষার রহস্যের সঙ্গে আমার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে মুখোমুখি পরিচয় হচ্ছে, সেই পরিচয়ের পরিণামে আমি আমার নিজেরই ভাষার আরো অনেক রহস্য জানতে পারছি যা এতদিন আমার পরিধির বাইরে ছিল।

আমার মতো আকাট ব্যক্তি অভিধানে কী অন্বেষণ করে বেড়ায়? আমি প্রধানত শব্দের ব্যুৎপত্তি হাতড়ে বেড়াই। একটি শব্দ একটি ওঙ্কারের মতো; তার উৎস কোথায় তা আমার জানা প্রয়োজন, আমার আত্মপরিচয় জানা যতটা প্রয়োজন, ঠিক ততটাই। আমরা বাঙালিরা তো মিশ্র জাতি, আমাদের ভাষাও মিশ্র সম্পদে আকীর্ণ।

তৎসম-তদ্ভব'র ধ্রুপদী বিভাজন তো মোটা ব্যাপার, আমি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতো একটি আঁটোসাঁটো অভিধান হাতে পেলে খুঁজে বেড়াই কোন শব্দাবলি আরব দেশ থেকে এসেছে, অথবা পারস্য বা তুরস্ক থেকে, বা ইংরেজির গা ঘেঁষে, কিংবা পর্তুগিজের অপভ্রংশ হিশেবে। এই জ্ঞানের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যঞ্জনা আছে। আমার মাতৃভাষা এক সঙ্গে পাঁচটি-ছ'টি বিভিন্ন ভাষার সারাৎসার আয়ত্তে এনেছে। আমার ভাষাকে ভালোবাসবার মধ্য দিয়ে আমি সুযোগ পাচ্ছি এই এতগুলি বিদেশি ভাষাকেও মান্য করবার। অক্ষয় ভাষার ভুবন-জোড়া উত্তরাধিকার। প্রক্রিয়াটি সহজ সরল, গোটা পৃথিবীর সমাজভুক্ত আমরা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা আকর সংগ্রহ করি এবং তা পরে আমাদের ভাষার অবয়বের সঙ্গে মিলিয়ে দিই। এই মেলানোর ইতিহাস কীভাবে সংগঠিত হয়, অভিধান আমাকে তা জানায়। সেজন্যই, যখন সুযোগ আসে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিই অলস-মন্থর সকালে, অথবা প্রগাঢ় দ্বিপ্রহরে, শব্দের রহস্য অনুসন্ধানে।

সময় তো বেশি নেই। কে জানে কবে কোন রাষ্ট্রীয় ফরমানে আমাদের ভাষাই উবে যাবে। হয়তো রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়াও ফের বন্ধ করে দেওয়া হবে, জরুরি অবস্থার সময় যেমন করা হয়েছিল; আদেশ জারি করা হবে, অমুক মুহূর্ত থেকে অমুক মুহূর্ত পর্যন্ত, হয়তো দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টার সংকীর্ণ পরিসরে, মাতৃভাষার চর্চা করা যাবে, তার বেশি উৎসাহ দেখালে পেয়াদা এসে ধরে নিয়ে যাবে। সময় কম, পরিসর সংকীর্ণতর, সুযোগ ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে। এই সুযোগ থেকেই কিছুটা পরিসর বের করে নিয়ে আমার অভিধানে নিমগ্ন হওয়া।

পরতের পর পরত, ভাষার ঐশ্বর্য, ভাষার রহস্য, ভাষার

অলংকার। এই ভাষার আলিঙ্গন দয়িতের আশ্লেষের মতো। প্রতি মুহূর্তে আমি তার সঙ্গে অভিসারে যাচ্ছি, অভিধানের অশ্বরথে সওয়ার হয়ে। আমার ভাষা এই কর্কশ পৃথিবীতে আর বেশিদিন টিকবে না, টিকতে দেওয়া হবে না তাকে। আমিও তো দু'দিন বাদে থাকবো না, ইতিমধ্যে হাতে গোনাগুনতি যে-কটা দিন, মদিরার মতো ভাষার ঐশ্বর্যে হ্লাদিত করি নিজেকে, অভিধানের দৌত্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে না।

মৃত্যুর মুখোমুখি আমরা; তা হলেও, না কি বলবো সেজন্যই, অভিধান, যে-অভিধান আমাকে ভাষা চেনায়, ভাষাকে চেনায় বলে সমাজকেও চেনায়। অভিধানের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

অন্য ভূমিকায় জীবনানন্দ

অভিমতটি উচ্চারণ করলে এখন গলা-ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা। আমার মনে হয়, তাঁর জীবদ্দশায় যে-বিশাল রচনাসম্ভার জীবনানন্দ দাশ প্রকাশের অনুমতি দেননি, তাঁর মৃত্যুর পর আগল ভেঙে সে-সব রচনা—কবিতা শুধু নয়, এনতার গল্প, তথা উপন্যাস—বিস্তর ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রকাশ করা আদৌ নীতিসম্মত হয়নি। জীবনানন্দ তোরঙ্গে-ঢোকানো এ-লেখাগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর চিন্তা জুড়ে ছিল দ্বিধাচ্ছন্নতা : বিচারের কষ্টিপাথরে, রুচির দিক দিয়ে ইত্যাকার রচনাগুলি ছেপে বের করা সম্ভবত বিধেয় নয়। তবে এই প্রসঙ্গে নতুন করে আলোচনা তুলে লাভ নেই, যা ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে।

শুধু কবিতা নয়, তাঁর প্রতিটি লেখাই জীবনানন্দ বরাবর সময়ের নিরিখে বিচার করতে চাইতেন। প্রাথমিক রচনার পর আপাত-অবহেলায় ফেলে রেখে দিতেন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর বাদে সেই লেখার আকর গুণাবলি সময়ের উচ্চাবচতার সুমেরু-কুমেরু উত্তীর্ণ হতে পারবে কি পারবে না সেই অন্বেষায়। তাঁর এখন-অতি-পরিচিত, অতি-বিখ্যাত যে-কোনো কবিতার পাণ্ডুলিপি

পর্যবেক্ষণ করলেই প্রতীয়মান হয়, তাঁর তৃপ্তি নেই, শব্দের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন, বিন্যাস ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, যে-কথা প্রচ্ছন্নভাবে বলতে চাইছেন তা কী মনে করে অপ্রচ্ছন্নতার অলিন্দে হাজির করছেন। অহরহ সৃষ্টি করছেন, কিন্তু প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গেই যন্ত্রণার আলোড়ন, রচনা কেন আরো পরিশুদ্ধ হচ্ছে না, সোনালি সকালের মতো বা অমাবস্যার অন্ধকারের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মতো আরো দীপ্যমান হচ্ছে না, নিরন্তর সেই উৎকণ্ঠা।

মানুষটি তাঁর রচনার একটি বিরাট অংশ যে আবৃত্তা আড়ালে রেখে দিয়েছিলেন, তাঁর দিক থেকে তার নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ ছিল। আর্থিক দুর্ভাবনায় ক্ষয়ে-ক্ষয়ে তিনি তাঁর শেষের কয়েকটি বছর, বলতেই হয়, প্রায় মৃতবৎ ছিলেন। ১৯৫৪ সালের হেমন্ত ঋতু পালাবদল ঘটিয়ে দিল। জীবনানন্দ দাশ 'আবিষ্কৃত' হলেন, বাজারে তাঁর রচনার চাহিদা বাড়লো। কেউ-কেউ সেই চাহিদা মেটাবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ভাণ্ডার উজাড় করে লুক্কায়িত তাঁর নানা রচনা লোকসমক্ষে হাজির করা শুরু হলো। বেঁচে থাকলে জীবনানন্দের হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে যেত কিনা তা নিয়ে আজ আর কে-ই বা ভাববেন?

তবে এখানে আলোচ্য চারটি প্রবন্ধ সম্পর্কে ঠিক সে ধরনের প্রতিপর্যুক্তি দাঁড় করানো অবশ্যই সম্ভব নয়। 'দেশ' পত্রিকার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার বিভিন্ন সংখ্যা ঘেঁটে, প্রধানত শিক্ষাবিষয়ক, জীবনানন্দের এই প্রবন্ধগুলি তাপস ভৌমিক জড়ো করেছেন 'কোরক' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। আমার ধারণা, ঠিক ওই সময়ের বৃত্তে জীবনানন্দ আরো বেশ-কিছু গদ্য বিভিন্ন পত্রিকার জন্য তৈরি করেছিলেন। অনুসন্ধিৎসু গবেষক জাতীয় গ্রন্থাগার বা অন্য কোথাও গিয়ে, কিংবা যদি 'চতুরঙ্গ' বা 'পূর্বাশা' পত্রিকার চল্লিশের দশকের উপান্তের কিংবা পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকের সংখ্যাগুলির ভিড়ে

নিজেকে হারিয়ে যেতে দেন, তা হলে জীবনানন্দের আরো বেশ-কিছু রচনার সন্ধান তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হয়। তাই আমি স্বপ্ন দেখবো যে অন্তত একজন-দু'জন সাহিত্য-রসিক খুঁজে পাওয়া যাবে, যিনি এই দুঃসাহসী ব্রতে মগ্ন হবেন। আরো যদি প্রগাঢ়তর দুঃসাহসী কেউ থাকেন, তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে হোক, গোয়েন্দা লাগিয়ে হোক, 'স্বরাজ' পত্রিকার পুরনো ফাইল টুঁড়ে বের করবার চেষ্টা করুন না কেন? বছর দুই-আড়াই জীবনানন্দ তো ওই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন, অন্য অনেকের লেখার সঙ্গে নিজেরও একটা দুটো রচনা রবিবারিক সংস্করণে হয়তো ছাপিয়েছিলেন। কিন্তু আপাতত সেই চিন্তা না হয় শিকেয় তুলে রেখে আমি উৎসুক পাঠকদের নিমন্ত্রণ জানাবো এখানে সন্নিবিষ্ট এই গুটিকয় প্রবন্ধ নিয়ে একটু ব্যাপৃত হওয়ার জন্য।

এই প্রবন্ধগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দের ভূমিকা বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি ঠিক কবি হিশেবে কিংবা লেখক হিশেবে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে বিব্রত হচ্ছেন না, তিনি লিখছেন একজন শিক্ষকের, বা অধ্যাপকের, দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর পর্যালোচনায় সামাজিক পরিবেশ উপেক্ষিত থাকেনি, পাশাপাশি অধ্যায়নাগারের অন্তর্বর্তী পরিবেশ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। অন্তত একটি প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের আভাস পাই। বিগত পাঁচ-ছয় দশকে পটভূমি আদ্যন্ত পাল্টেছে। নানা সঙ্কুল সমস্যা সত্ত্বেও শিক্ষা এখন প্রচণ্ড জনমুখী। তিন-চার যুগ আগে যেখানে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে বড়োজোর এক লক্ষ-দেড় লক্ষ শিশু অনুপ্রবেশ করতো, এখন এই খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে সেই সংখ্যা প্রায় ষাট লক্ষ। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও আদ্যন্ত পরিবর্তিত। সুতরাং জীবনানন্দ ঠিক কী বলছেন তা নিয়ে তেমন

ভাবনাবিলীন না হয়ে কেমন করে বলছেন, কোন্-কোন্ প্রসঙ্গ তাঁর বিবেচনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়েছে, সে-সব বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করবো।

অন্য একটি প্রবন্ধ, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', আর এক ধরনের আস্বাদ নিয়ে হাজির। জীবনানন্দ দুই বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে সমান্তরাল চিন্তা করছেন, চিন্তা করছেন অতি তীক্ষ্ণ ইতিহাস চেতনার প্রেক্ষিতে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের ভাষা ও রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক মস্ত সংকট উপস্থিত। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সে-সময় দ্বন্দ্ব আবর্তিত হচ্ছে, জীবনানন্দ গভীর আশাবাদী হওয়া সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত ভাবতে পারছিলেন না যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা সত্যি-সত্যি সফলতায় পৌঁছুবেন কিনা, যদি পৌঁছন তা হলে তা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, জীবনানন্দের বিবেচনায়, মস্ত বড়ো লাভ।

অথচ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃঢ়বন্ধনের মধ্যে, বাণিজ্যিক কারণে ইংরেজি ও হিন্দির ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কতটা নিজেদের সত্তা টিকিয়ে রাখতে পারবে তা নিয়ে প্রবন্ধ-রচনার মুহূর্তে, স্পষ্টই বোঝা যায়, জীবনানন্দের মনে অনেক প্রশ্ন। হিন্দির পরাক্রম স্বাধীন ভারতবর্ষে যে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, সে-বিষয়ে জীবনানন্দ সচেতন, কিন্তু, এলোমেলো অবস্থা, ইতিহাস ভবিষ্যৎকে শেষ পর্যন্ত কোন্ দিকে ধাক্কা মেরে নিয়ে যাবে তা তাঁর কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। সেজন্যই পাঠকদের অনুরোধ করবো, এই প্রবন্ধের শেষের কয়েকটি বাক্যবন্ধ বারবার পড়বার জন্য। জীবনানন্দ সামনের দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারছেন না ইতিহাসের আবেগে কোন্ দিকে ঢল নামবে, সমাজ কোন্ নির্দেশ পৌঁছে দেবে জনগণের মানসে। তা হলেও এই শিক্ষক, যিনি যেহেতু কবিও, নিজের

ভাষাকে সন্তানের মমতা দিয়ে ভালোবাসেন, তিনি, আবছা উচ্চারণে হলেও, পরম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন এই বাক্যাবলির মধ্যবর্তিতায়।

হিন্দি শিখে হিন্দিতে লিখলে, কিংবা নিজেদের বইয়ের হিন্দি অনুবাদের সম্ভাব্য লক্ষ লক্ষ পাঠকদের কথা ভেবে বই রচনায় নিযুক্ত হলে, গরিব সাহিত্যিকদের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য ঢের বেড়ে যেতে পারে হয়তো, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ ভ্রমরার অচিরে মৃত্যু ঘটবে। সমস্ত ভারতবর্ষকে এক করতে হলে একটি একক ভাষার প্রয়োজন। ইংরেজি বিদেশী ভাষা, সেই স্থান পূর্ণ করতে পারে না, কিন্তু দেশি হিন্দি তা পারে। একথা মেনে নিয়ে বাঙালি পণ্ডিত ও সাহিত্যিক সম্প্রদায় একদিন হিন্দিকে আরো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরবেন কিনা; সেই চিন্তায় জীবনানন্দ শঙ্কিত। দেশকে এক করতে হলে, পৃথিবীকেও এক করতে হলে, একটি বিশেষ ভাষার প্রয়োজন আছে কিনা তা নিয়েও তাঁর গভীর সন্দেহ।

সকলের সঙ্গে লেনদেন ইত্যাদির জন্য ওই গোছের একটি ভাষা একদিন দাঁড় করাতে পারলেও, মানুষের বিভিন্ন মনোস্বভাব অনুযায়ী নিজেদের জ্ঞান ও রুচি বিকাশের পথে সে-ভাষা বরঞ্চ বিপত্তি ঘটাতে পারে বলে জীবনানন্দের আশঙ্কা। ক্যানাডা বা সুইটজারল্যান্ডের মতো জনবিরল দেশে পর্যন্ত কোনো একটি প্রধান ভাষা নেই, সোভিয়েট রাশিয়ায়ও ছিল না, আমাদের দেশেও থাকতে পারবে বলে তাঁর মনে হয় না। আগামী দু-এক দশকে হিন্দির প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যেতে পারে। শুধু রাষ্ট্র ও সমাজ চালনার সমস্যা কিংবা অর্থবণ্টনের সঙ্গে জড়িত দোষদুর্বলতার জন্যই নয়, অন্য নানা কারণেও এখন থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্দিন এসে পড়ার আশঙ্কা। যে-সাহিত্যিকদের আগামী দিনে আবির্ভাব ঘটবে, তাঁরা সংখ্যায়

অপ্রতুল হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথাসম্ভব তার সম্রান্ত ধারাবাহিকতায় টিঁকিয়ে রাখবার মতো প্রাণ ও মনের বিশেষ শক্তি তাঁরা প্রদর্শন করতে পারবেন কি? জীবনানন্দের স্বগত উচ্চারণ, ভবিষ্যৎ যতটা অন্ধকার আপাতত মনে হচ্ছে, ততোটা না-ও হতে পারে।

সবশেষে যে-প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত, 'কবিতা পাঠ : দুজন কবি', তাঁর উন্মেষ মুহূর্তের যে-দুই বাঙালি কবি জীবনানন্দকে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁদের শ্রদ্ধাপ্লুত তর্পণ। 'ঝরাপালক' পেড়ে পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়, তাঁর উদ্যম অধ্যায়ে জীবনানন্দ যখন কবিতা মক্সো করছিলেন মাত্র, কত ঋণী ছিলেন এই দু'জনের কাছে। সেই ঋণের স্বীকৃতি প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত ছড়িয়ে আছে।

আসুন, পরিমিতিবোধে ফিরি

শতবার্ষিকীতে মহোৎসব শেষ হয়েছে, এখন আপাতত কিছু সময় শান্তি আমল বিরাজ করবে। কতগুলি কথা, যা বলা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল, অথচ শতবার্ষিকীর সমারোহের মধ্যে যা বলতে গেলে রুচিহীনতার অভিযোগ উঠতে পারতো, সে সমস্যার হাত থেকে আমরা অন্তত এখন মুক্ত। যে-কথাগুলি এত বছর ধরে বলা হয়নি, এবার তা হলে তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যেতে পারে।

'বনলতা সেন' কাব্য পুস্তিকাটি কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সার একটি' কাব্যমালায় যখন প্রকাশিত হলো, মহাযুদ্ধের ঘন দুর্যোগ সর্বত্র, আমি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, আমার সঙ্গে স্কুলে এক সঙ্গে পড়া এক বন্ধু কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে। 'বনলতা সেন' কবিতাটি নিয়ে তার সঙ্গে আমার বহুদিন ধরে একটি ওঁচা তর্ক চলছিল। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন, —পঙ্‌ক্তিটির আমার বন্ধু কর্তৃক আক্ষরিক ব্যাখ্যা : পাখির বাসায় ডিম যেমন তার নিঃসঙ্গ উজ্জ্বলতা নিয়ে চকমক করে, ধূসর মুহ্যমান সন্ধ্যায় বনলতা সেনের উপস্থিতি ঠিক সেরকমই বুকে চমক জাগানো। আমার অসম্মতি জ্ঞাপন, বরঞ্চ স্পষ্টতর ব্যাখ্যা : পাখির নীড় সেই পাখিদের

পক্ষে যেমন শান্তি ও স্বস্তির দ্যোতক, বনলতা সেনের পরিবেশে শান্তন-ছড়ানো উপস্থিতির অনুরূপ আবেগ আলোড়ন। আমাদের তর্কের নিরসন হয় না, একটা সময় বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ঠিকানায় সালিশি মেনে তাঁকে আমার চিঠি দেওয়া, তাঁর উত্তর ঈষৎ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ঠাসা, পঙ্‌ক্তিটির মানে এ-ও হয়, ও-ও হয়, তবে আমার মনে হয় আপনার কৃত ব্যাখ্যাই অধিকতর ঠিক।

উদ্বাস্তু আমি, চল্লিশ পঞ্চাশের দশকগুলিতে অহরহ আবাসস্থল বদলেছি, চিঠিপত্রের জড়ো হওয়া স্তূপ, ক্যাম্বিসের ঝোলার পর ঝোলা ভর্তি, কোথায় অচিরে মিলিয়ে গেছে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার যুবা-বয়সের প্রগল্‌ভতার কোনো সাক্ষ্যই আর অবশিষ্ট নেই। তবে সেই যে শুরু হলো তারপর জীবনানন্দের সঙ্গে পত্রালাপ বহুদিন অব্যাহত ছিল, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। তিনি বরিশাল থেকে কলকাতায়, আমি উত্তর ভারতে, এবং তারপরে বিদেশে ভ্রাম্যমাণ। তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে, আমার ধারণা, আমাদের মতো মাত্র গুটিকয় জীবনানন্দতে মজে গিয়েছিলেন। সেই মজে-যাওয়া সত্ত্বেও আমরা জীবনানন্দের কোনো উপকারে আসতে পারিনি। তিনি হন্যে হয়ে একটি ভদ্রগোছের অধ্যাপনার অন্বেষণ করছিলেন গোটা উত্তর ভারতের যে-কোনো জায়গায়। কিন্তু গণ্যমান্য এঁকে-ওঁকে-তাঁকে ধরেও জীবনানন্দর জন্য সেই সুযোগ সৃষ্টি করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে একজন-দু'জন মাসের পয়লা মাইনে পেলে তার প্রায় অর্ধেক কিংবা তিন-চতুর্থাংশ উজাড় করে জীবনানন্দ-গৃহ থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অথবা 'ঝরা পালক'-এর পুরনো কপি কিনে নিয়ে এসে সুহৃদ্‌ সখাদের মধ্যে বিলিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সাধ্য তো কখনোই তা পেরিয়ে যেতে পারেনি।

ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে সেই নিদারুণ ঘটনা

ঘটলো। জীবনানন্দ প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুর পর অমরত্বে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর অপ্রকাশিত পুরনো লেখা, তোরঙ্গের পর তোরঙ্গ, আবিষ্কৃত হতে লাগল এমন কী গদ্য রচনাও, এমন কী গল্প-উপন্যাসও। বাঙালি বিবেক হঠাৎ নিজের কাছে মাথা নত করলো। তাঁর জীবদ্দশায় জীবনানন্দের যে-প্রাপ্য, তার ন্যূনতম উপাচারও তাঁকে বাঙালি সমাজ সাজিয়ে দেয়নি। এখন থেকে প্রায়শ্চিত্তের প্রহর শুরু। কিছুটা খাঁটি আবেগ, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছুটা হুজুগের পাঁচ মিশেলও; রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ, একমাত্র জীবনানন্দ; বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিশের দশক থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের উপান্ত পর্যন্ত, ইতিহাস হঠাৎ অপাঙ্‌ক্তেয়, জীবনানন্দ বিনে গীত নেই।

ওই বছরগুলিতে আমি কখনো দিল্লিতে, কখনো বিদেশে। পঞ্চাশ-ছাপান্ন-সাতান্ন সালে আমার পিতা-মাতা অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করতেন, বাড়িটির নাম এখনো মনে পড়ে, 'ধান্যকুড়িয়া'। মাঝে-মাঝে যখন একদিন-দু'দিনের জন্য কলকাতা ঘুরতে যেতাম, লাবণ্য দাশ কী করে যেন খবর পেতেন, সমাহিত দুপুরে বা নির্জন অপরাহ্ণে ত্রিকোণ পার্ক থেকে চলে আসতেন। যেটা বলতে ভুলে গেছি, আমার মা তাঁর প্রথম জীবন কাটিয়েছেন বরিশাল শহরে, সুতরাং জীবনানন্দের পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। লাবণ্য দাশ কিন্তু আসতেন প্রধানত আমার কাছেই, তাঁর দুঃখের ঝুলি উজাড় করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে।

যে-কাতরোক্তি লাবণ্য দাশ আমার কাছে বহুদিন করেছিলেন তার বাচ্যার্থ এবম্প্রকার : জীবনানন্দ তাঁকে, লাবণ্য দাশকে, বার-বার করে বলে গিয়েছিলেন তাঁর তোরঙ্গে-রক্ষিত রচনাদি যেন বাইরের কাউকে দেখানো না হয়, প্রকাশের প্রসঙ্গে তো দূর অস্ত। 'তুমি তো জানো উনি

প্রতিটি কবিতা একবার দু'বার নয়, বহুবার পরিমার্জনা করতেন, একই কবিতার, অতৃপ্ত, বহুবার মক্সো করতেন'। শব্দ-ব্যবহারে সত্যিই অতীব খুঁতখুঁতে ছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর সমগ্র চিন্তা-মানসিকতা জুড়ে অতৃপ্তি, অথচ ত্রিকোণ পার্কে যে-আত্মীয়ের বাড়িতে, আশ্রিতা লাবণ্য দাশ, তাঁর ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকছেন, সেখানে তাঁর বয়ানে, বিচিত্র ঘটনাক্রম সংঘটিত হচ্ছে। প্রকাশকরা সেখানে আসছেন, যাচ্ছেন, প্রকাশকদের ফড়েরা আসছেন-যাচ্ছেন। পাশের ঘরে জীবনানন্দের অপ্রকাশিত রচনাবলি প্রকাশের সমারোহ চলছে। অথচ, লাবণ্য দাশের বিলাপ এবং অনুযোগ, তাঁকে কেউ দেখছেন না, তাঁর সঙ্গে কেউ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছেন না। যেন জীবনানন্দ হাসপাতালের শেষ শয্যা থেকে মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁকে, লাবণ্য দাশকে, নিয়ে আদৌ ভাববার কিছু নেই।

এখন বলতে বাধা নেই, লাবণ্য দাশ সেই বছরগুলিতে অনেকটা সময়েই অতি দ্রুত ভেঙে পড়তেন, কখনো-কখনো রাগে ফুঁসতেন যদিও, বেশির ভাগ সময় অসহায় কান্নায় উথলে উঠতেন।

আমি, কবুল করছি, তাঁকে খুব একটা সুপরামর্শ দিতে পারছিলাম বলে মনে হয় না। বোধহয় বলেছিলাম, যে-আত্মীয়ের সঙ্গে আছেন, তিনি উচ্চ সরকারি পদাধিকারী, তার উপর তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর আলাদা সামাজিক পরিচিতি আছে, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে জীবনানন্দের রচনা প্রকাশ নিয়ে যে-জটিলতা দেখা দিয়েছে তা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় মিটিয়ে নিতে। যতদূর মনে পড়ে, লাবণ্য দাশ সে সময় অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের কাছাকাছি বৃত্তে কী করে যেন পৌঁছে গিয়েছিলেন, একবার-দু'বার আমাকে বলেছিলেন, তাঁর ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যে অন্যায়-অবিচার করা হচ্ছে তার প্রতিবিধানের জন্য অতুল্যবাবুর দ্বারস্থ হবেন। আমি তাঁকে কোনোরকম ব্যবহারিক

সাহায্যই করতে পারিনি। তা ছাড়া হঠাৎ বিদেশে চলে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাঁর মৃত্যুর সময়ও আমি বিদেশে। দেশে ফেরার এবং কলকাতায় স্থিত হওয়ার পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে, মঞ্জু হয় টেলিফোন করেছে, কিংবা টেলিফোন না করেই চলে এসেছে। তাঁর মনেও অনেক অনুযোগের প্রশ্নমালা, সেই সঙ্গে তাঁর পিতার স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে তাঁর অনেক স্বপ্ন দেখা। কিন্তু মঞ্জু কোনোদিনই তাঁর মনের কথাকে মুখের কথায় ব্যক্ত করতে পারতো না। সে আসতো, যেত, কেন আসতো সে ইতিহাস অলিখিতই থেকে গেল। এখন লাবণ্য দাশ বেঁচে নেই, মঞ্জুও গত, তাঁর সহোদর ভাইটিও। প্রকৃত অর্থেই জীবনানন্দ দাশের বংশপরম্পরা এখন নিশ্চিহ্ন। তাছাড়া বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ জীবনানন্দকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার সেই অধ্যায়ও অবসিত। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ, বাংলা সাহিত্যের এই পরম্পরা এখন আর তীর-ধনুক-কামান-পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করেও বিনষ্ট করা সম্ভব হবে না। হয়তো সেই কারণেই, আমি যে, কথাগুলি এখন বলছি, বলা সহজ হচ্ছে।

আমি যখন পাকাপাকি কলকাতায় বসবাস করতে এলাম, ততদিনে লাবণ্য দাশ প্রয়াত, তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর অভিযোগের পাহাড় একটি নিরুচ্চারিত প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রইলো। মঞ্জু অবশ্য প্রায়শ আসতো, অথবা টেলিফোনে অনুযোগ-উপরোধ জানাতো। আমার সাধ্যমতো বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনেক সময়েই মনে হতো মঞ্জু চিত্ত-অস্থৈর্যে ভুগছে, আজ এটা-কাল সেটা পরশু-অন্য-কিছু বলছে, এবং যদিও তাঁর বাবার সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করার কথা সে বহুবার বহু বিভঙ্গে ব্যক্ত করেছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই কেঁচে গণ্ডূষ। যে-ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়স্বজনেরা জীবনানন্দের সামগ্রিক রচনার অধিকার সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কেও তার হয়তো কোনো অভিমান একটু-একটু করে জমা হচ্ছিল, কিন্তু আমাকে অন্তত স্পষ্ট করে তা কোনো দিন বলেনি। তা ছাড়া তার জীবনানন্দ অ্যাকাডেমি নিয়ে মাঝে-মাঝে যে-শোরগোল তোলা, তাতে বরাবরই আমি ধৃতির অভাব লক্ষ করেছি, মাঝে-মাঝে তাও মনে হয়েছে সে হয়তো কোনো কুচক্রী পরমার্শদাতার খপ্পরে পড়েছে।

তবে শেষ পর্যন্ত মঞ্জুও তো মিলিয়ে গেল, তাঁর মনের মধ্যে যে-ঢাঁই হওয়া অতৃপ্তি, তা অন্তত জীবনানন্দের স্মৃতি সংরক্ষণে কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই পালন করতে পারলো না। এর মধ্যে শুনতে পেলাম, সমরানন্দও আর বেঁচে নেই। জীবনানন্দের গোটা পারিবারিক অতএব ইতিহাসের শূন্যতায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু আমার যে-অস্বস্তিবোধ, তা কিন্তু এখনো অব্যাহত! ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার ঘটেছে, তাঁর সমকালীন অন্য, সমস্ত কবি ও সাহিত্যিককে কুপোকাত করে একমাত্র জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে নিজের সংহত সিংহাসন জুড়ে বিরাজ করছেন গত কয়েক দশক জুড়ে। এমন-কী আবেগ-উত্তাল বাঙালি কাজী নজরুল ইসলামের বিশেষ সংস্থানটি পর্যন্ত জীবনানন্দের উপাসনায় অর্ঘ্য সাজিয়ে উৎসর্গ করতে প্রায় প্রস্তুত। জীবনানন্দ আর বাংলা ভাষার প্রধান কবি নন, তিনি প্রধান প্রবন্ধকারও, উপন্যাস তথা গল্প-লেখকও। একটি জাতি বা অনুজাতি যদি তাদের বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা কোনো মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়, তা হলেই এই আজব হতশ্রী অতি উদ্ভট সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হওয়া সম্ভব।

এখন যাই বলতে যাবো কর্কশ জনরোষের শামিল হতে হবে আমাকে। অথচ ইতিহাসের স্বার্থরক্ষার খাতিরে কতগুলি কথা না বলে

উপায় নেই। আমার বক্তব্য প্রধানত তিনটি সমস্যাকে জড়িয়ে, (ক) জীবনানন্দের গদ্য কোনো মানদণ্ডেই বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের সোপানে গ্রহণীয় নয়; (খ) বাংলা পাঠককুলের জীবনানন্দ-সমাচ্ছন্নতা তাঁর সমসাময়িক কবিকুলের প্রতি গভীর অবিচার ব্যঞ্জক, এবং (গ) জীবনানন্দ হয়তো একটি ইতিহাস চেতনার অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন শেষের কয়েক বছর, কিন্তু তিনি কোনো স্পষ্টতায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি; যাঁরা তাঁর রচনার মধ্যে-মস্ত মস্ত দর্শনের গন্ধ শুঁকতে পারছেন, তাঁরা আমার বিবেচনায় স্রেফ বাচাল উক্তি বকছেন।

শতবার্ষিকীর উদ্যোগ এখনো অব্যাহত থাকলে হয়তো এই কথাগুলি বলতে গেলে আমাকে সমাজে একঘরে করা হতো, কিন্তু সে-সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা যেহেতু পেরিয়ে এসেছি, আমার বক্তব্য তাই স্পষ্টভাবেই নীচে নিবেদন করছি। যাঁরা জীবনানন্দের গদ্য মুড়ি-মুড়কির মতো খাতা থেকে নকল করে বাজারে ছেড়েছেন, তাঁরা সজ্ঞানে পাপ করেছেন এমন কথা আমি বলছি না, কিন্তু জীবনানন্দের প্রতি গভীর অবিবেচনাই প্রদর্শন করেছেন। যে-কথাগুলি তিনি বার বার উচ্চারণ করেছেন : তাঁর লেখা তিনি ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পছন্দ করতেন, শিশুদের যেমন ঘুম পাড়ানো হয়, সে রকম। একটু স্পর্ধিত উক্তি হয়তো করছি, জীবনানন্দের আদৌ কোনো গদ্য-প্রতিভা ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তদের সম্পর্কে তাঁর মনে একটি প্রকাণ্ড বিস্ময় সর্বদা সঞ্চারমান ছিল : ওরা গল্প লিখেছে, উপন্যাস ফাঁদছে, প্লটের শরীরে মাংস জোগাচ্ছে, ওরা যা লিখছে তা দিব্যি পড়ে যাওয়া যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, কিন্তু আমার সেই দক্ষতা নেই; ওরা পারে আমি পারি না। এই অক্ষমতা থেকে জীবনানন্দ বহু বছর ভুগেছেন, এবং তার তাড়নায়, যদিও নিজের সামর্থ্য নিয়ে কোনো মোহই তাঁর ছিল না, যে-সমস্ত গদ্য মক্সো করে

গেছেন, সে সব রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো গাঁথুনি নেই, কোনো ধৃতি নেই, জীবনানন্দ নিজেও তা জানতেন। একটি বিশেষ উপন্যাস-প্রয়াসে তাঁর স্ত্রীর প্রতি যে-গভীর অবিচার করেছেন তা-ও, আমার ধারণা জীবনানন্দের গোচরে ছিল। লাবণ্য দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জীবনানন্দ অনেক এলোমেলো অসংলগ্ন কথা বলতেন, কিন্তু তারই মধ্যে লাবণ্য দাশের হাত শক্ত করে ধরে তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, তোরঙ্গে-রক্ষিত কোনো লেখাই প্রকাশকের খপ্পরে পড়বে না। লাবণ্য দাশ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু যাঁরা উদ্যোগ নিয়ে জীবনানন্দের যাবতীয় গদ্য উজাড় করে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরাও সমান অপরাধী। আমি আমার একাধিক সুহৃদকে জেরা করে দেখেছি তাঁরা জীবনানন্দের গদ্য একবারের বেশি দু'বার পড়তে পারেন কিনা; তাঁরা মুখ নিচু করে জানিয়েছেন না, তাঁরা পারেননি। জীবনানন্দের গদ্যরচনা নিয়ে যাঁরা আপাতত কলকল করছেন তাঁরা এটাও কেন ভুলে থেকেছেন যে জীবনানন্দের গদ্য নিয়ে মাতামাতি 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি' পর্বের অন্য লেখকদের প্রতি ঘোর অবিচার। আমবা জীবনানন্দের গল্প উপন্যাসে মজে যাওয়ার হুজুগে বিভোর হয়ে রইলাম। কিন্তু যদি প্রশ্ন করি আমাদের মধ্যে ক'জনের শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-সরোজকুমার রায়চৌধুরী-মণীন্দ্রলাল বসু-স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য প্রভৃতির লেখার সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয় আছে, কী উত্তর দেবেন তারা? তাঁদের জীবনানন্দ আচ্ছন্নতা-হেতুই বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ যুগের এ-সমস্ত মহান লেখকেরা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে রইলেন।

এবার কবিদের প্রসঙ্গে আসি। গত চল্লিশ বছর বাঙালি পাঠককুল কবিতা বলতে রবীন্দ্রনাথের পরে একমাত্র জীবনানন্দের কাব্যকে

নির্বাচন করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-মোহিতলাল মজুমদারের প্রসঙ্গ ছেড়েই দিন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ এই প্রজন্মের সম্পূর্ণ লেখককুলকে তাঁরা অন্যমনস্ক অবজ্ঞার সঙ্গে পাশে সরিয়ে রেখেছেন। এটা কোনো অর্থেই সুবিচার হয়নি। জীবনানন্দ আবিষ্টতা বাঙালি আবেগগ্রন্থির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিশে গেছে। কিন্তু কোন্ প্রগল্‌ভতা আমাদের এই নিরক্ষর মরুভূমিতে চিরনিক্ষিপ্ত রাখবে যে আমরা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসু-অমিয় চক্রবর্তীদের আদ্যোপান্ত ভুলে থাকবো? এই অবজ্ঞার কোনো ক্ষমা নেই।

যে-কথা বহুবার বহু প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছি, জীবনানন্দ আমার প্রিয়তম কবি, আমার চেতনা-ধমনী অধিকার করে তাঁর প্রব্রজ্যা। কিন্তু তা বলে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে আমার যথাযথ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ থেকে কেন নিবৃত্ত থাকবো? আমরা বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন অচিরে পরিমিতিবোধে প্রত্যাবর্তন করি।

ঘোতন কোথায়

পাঁচ বছরের একটি বাচ্চা ছেলেকে একদা ধন্দে ফেলবার চেষ্টা করেছিলাম 'ধরো তোমাকে বাঁদিকে একটা প্লেটে ছ'টা ইয়া বড়ো পানতুয়া আর মস্ত-মস্ত চারটে সন্দেশ সাজিয়ে দেওয়া হলো; অন্যদিকে বাহারি নানা বাদাম ও ফলের টুকরো-বসানো তিন থরে একটি আইসক্রিমও দেওয়া হলো। তোমাকে বাছতে হবে কোনটা পছন্দ।' বাচ্চা ছেলেটির অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নির্বিকার বিচারশক্তি, 'আমার দুটোই চাই; প্লেট-ভরা পানতুয়া সন্দেশ চাই, আর তে-তলা আইসক্রিমটাও চাই।'

আমার অবস্থাও সেই বাচ্চা ছেলেটির মতো। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, লীলা মজুমদারের এন্তার রচনার মধ্যে কোনগুলি আমার পছন্দ, অম্লানবদনে জবাব দেবো, আমার বাছবিছার নেই, ওঁর সমস্ত লেখা আমার সমান পছন্দ। আমার 'পদিপিসির বর্মিবাক্স'-ও চাই, 'বদ্যিনাথের বড়ি'-ও চাই, 'বড়দিনের উপহার'-ও চাই। এবং আমার এই ধ্যানধারণার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি গত ষাট-সত্তর বছর সময় ধরে। বরাবরই লীলা মজুমদার আমার কাছে আরাধ্যা দেবীসমা। অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ যদি উহ্য রাখি, তা হলেও প্রতি মুহূর্তে বিস্ময়ে বিস্ফারিত

হতে হয় এই ভেবে যে এমন নিটোল স্বচ্ছ ঝকঝকে বাংলা ওঁর অবর্তমানে আমাদের আর কে উপহার দেবেন।

তবে আরাধ্যা দেবীদের তো দূর থেকেই প্রণাম জানাতে হয়। আমিও তাই আজীবন দূরে-দূরে থেকেছি। শুধু বছর বারো আগে একবার তাঁকে চোখে দেখেছিলাম, সেই প্রথম এবং শেষ। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান। লীলা মজুমদারকে সাম্মানিক উপাধি দেওয়া হবে, আমার উপর দায় পড়েছে সমাবর্তন ভাষণ দেওয়ার। মঞ্চে পাঁচ-ছ হাত দূরে পাশাপাশি উপবিষ্ট আমরা। মাঝামাঝি আরো গোটা দুই চেয়ার, উপাচার্য এবং খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, যিনি কিনা মহামান্য রাজ্যপাল স্বয়ং। রাজ্যপালের সান্নিধ্যে আমরা একটু সংস্কৃত-সংস্কৃত হয়ে বসে আছি। অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী গম্ভীর বক্তৃতার পালা, তারপর উপাধি বিতরণ। রাজ্যপাল মানেই তো রাজ্যপাল একা নন, পুলিশ-শান্ত্রীর সমারোহ, তাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি, কেউ যাতে কোনো রকম অন্যায় বা অশালীন কিছু না করে বসে।

কী আর করা, লীলা মজুমদার কাঠ হয়ে বসে, আমিও তাই। যখন তলব এলো, উঠে গিয়ে তোতলাতে-তোতলাতে ভাষণ পড়লাম। ওঁর সময় এলে লীলা মজুমদারও রাজ্যপালকে বিনম্র নমস্কার জানিয়ে উপাধি গ্রহণ করলেন।

অনুষ্ঠান শেষ। কিন্তু আমাদের তো হইহই করে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ার উপায় নেই। মহামান্য রাজ্যপাল সর্বাগ্রে প্রস্থান করবেন, তারপর আমাদের পালা। আমাদের উঠে দাঁড়ানো, রাজ্যপালও আসন থেকে উত্থিত, উপাচার্য-অধ্যাপকবৃন্দ ও মন্ত্রী-শান্ত্রীরা রাজ্যপালকে নিয়ে মন্থর গতিতে পা মেপে-মেপে মঞ্চ থেকে অবরোহণ করলেন, প্রস্থানদ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন। এমন মুহূর্তে লীলা মজুমদার

অনুপম কণ্ঠলাবণ্যসহ প্রায় উচ্চস্বরে বললেন : 'আহা, আমি এর আগে এত কাছে থেকে কোনো রাজ্যপালকে দেখিনিকো।'

মন্ত্রী-শান্ত্রী পরিবৃত পরিবেশে সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যা বলার, ওইটুকু মন্তব্যর মধ্যে লীলা মজুমদার সব কিছু বলে দিলেন। সাধে কী আর তিনি আমার আরাধ্যা দেবীসমা।

তবে একটি মিথ্যাভাষণ দিয়ে শুরু করেছিলাম। হ্যাঁ, লীলা মজুমদারের সব রচনাই আমার সমান পছন্দ, তা হলেও সমান পছন্দের মধ্যেও একটু আরো বেশি পছন্দ সেই গল্পটি 'ঘোতন কোথায়?' অসুস্থ লীলা মজুমদারকে বিরক্ত করতে নেই। তা হলে একবার যদি সাহসে ভর করে তাঁর কাছে হাজির হতে পারতাম, সবিনয় সমিনতি অনুরোধ জানাতাম : 'দয়া করে একবার ঘোতনের সঙ্গে আমার একটু আলাপ করিয়ে দেবেন?'

গদ্য, যা কবিতারও অধিক

স্মৃতিতে প্রহৃত হতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে, অথবা হয়তো শেষ হতে তখনো কয়েক মাস বাকি, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নানা-সময়ে-লেখা কিছু গল্পের একটি সংকলন 'কবিতাভবন' থেকে প্রকাশ করেছিলেন। বইয়ের আকার ডবল রয়্যাল, সেই কঠিন সময়ে যতটা শৌখিন কাগজ সংগ্রহ করা সম্ভব সেরকম কাগজে লেটার প্রেসে ঝকঝকে নির্ভুল ছাপা, আকাশ-নীল মলাটের উপর গাঢ় রঙে বইয়ের নামাঙ্কন, বুদ্ধদেব বসুর স্বাক্ষরের প্রতিলিপি, কাগজে কিংবা বোর্ডে বাঁধাই। গ্রন্থপ্রকাশ সংস্কৃতি বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর কিছু অতি স্পষ্ট ধ্যান-ধারণা ছিল, ওই 'গল্পসংকলন' জুড়ে তার ছাপ।

আমার কাছে 'গল্পসংকলন'-এর যে-কপি ছিল, কবে তা হারিয়ে গেছে। একজন-দু'জন ভাগ্যবান সম্ভবত এখনো আছেন যাঁরা বইটি যত্ন করে তাঁদের সংগ্রহে রক্ষা করেছেন। পড়তে, দেখতে, হাতে নিতে, গন্ধ শুঁকতে 'গল্পসংকলন' থেকে সুখের ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়তো। সেই স্মৃতি দ্বারা সতত প্রহৃত হতাম বলেই জনৈক প্রকাশক যখন বুদ্ধদেব বসুর রচনাবলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করতে শুরু করেন, ছাপা-বাঁধাই-সম্পাদনায় কুৎসিত অমনোযোগিতা তথা দৈন্য

বিবমিষার উদ্রেক ঘটিয়েছিল। যদি এটা মেনে নেওয়া হয়, রবীন্দ্রনাথ-উত্তীর্ণ যুগে সাহিত্যের সর্ব কন্দরে বিচরণকারী হিশেবে বুদ্ধদেব প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, তা হলে ওই গ্লানিবোধের যৌক্তিকতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

এবং সেজন্যই লোকমুখে যখন শুনলাম এক সম্ভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধদেব বসুর গদ্য সংগ্রহ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে, মস্ত আশার সঞ্চার হয়েছিল। বাড়তি আশা জড়ো হয়েছিল এটা জেনে, এই গ্রন্থ প্রকাশ তত্ত্বাবধানের জন্য মনোনীত যে-সম্পাদকমণ্ডলী, তাঁদের অনেকেই অগ্রণী সাহিত্য-রসভোক্তা, কয়েকজন বুদ্ধদেব বসুর খুব কাছের মানুষ।

যে-আশা নিজেকে দিয়েছিলাম, ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসুর 'প্রবন্ধসমগ্র ১' মোটেই নয়ন-ভুলানো-এলে কী-হেরিলাম-নয়ন-মেলে পর্যায়ে পড়ে না। ন্যূনতম সৌষ্ঠব, শৌখিনতার নামগন্ধ নেই, গ্রন্থপ্রকাশের যে মানদণ্ড বুদ্ধদেব বসু স্থাপন করেছিলেন, তার নামগন্ধ নেই, অতি সাধারণ কাগজে ছাপা, শত-শত বাংলা-ভাষায় রচিত যে সব গ্রন্থ প্রতি বছর প্রকাশিত হয় তাদের সগোত্র। এই গ্রন্থ সাধারণের ভিড়ে মিশে যেতে বাধ্য।

কিন্তু আমার প্রধান অস্বস্তিবোধ তা নিয়ে নয়। সম্পাদকমণ্ডলী, আমি ধরে নিয়েছিলাম, প্রথম সুযোগেই পাঠকদের জানাবেন কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের সম্পাদ্য পরিপূরণে অগ্রসর হচ্ছেন, কোন-কোন প্রবন্ধগুচ্ছ থেকে রচনাগুলি সন্নিবেশ করা হচ্ছে, কী বিন্যাসে সাজানো হচ্ছে, প্রকাশিত পুস্তকাদির বাইরে বুদ্ধদেব বসুর আরো অজস্র প্রবন্ধ এখানে-ওখানে ছড়ানো গত দশকের তিরিশের-চল্লিশের-পঞ্চাশের দশকের বিভিন্ন পত্রিকায়, সে-সব অন্বেষণান্তে উদ্ধার করে প্রস্তাবিত 'প্রবন্ধসংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে

কি না। পাঠককুল আরো উন্মুখ অন্য একটি কারণে : তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধাবলি রচনার কালানুক্রমে সাজানো হবে, এবং তা হলে তাঁরা বুদ্ধদেবের গদ্য ভাষাশৈলীর বিবর্তন ও ক্রমপরিণতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে পারবেন, লেখকের সাহিত্যচিন্তা, সমাজদর্শন, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদির পরিশীলন-সম্মার্জন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সু-স্বচ্ছ হবে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাষা যেমন কথিত, প্রায়-ঘরোয়া, বাংলার ক্রমশ কাছাকাছি চলে এসেছে অথচ কবিতাসুষমা হারায়নি, প্রায়-গদ্য শব্দাবলির অবয়ব জুড়ে নিটোল কবিতার কিঙ্কিণী, অনুরূপ জাদুবলে তাঁর গদ্যভাষাও, বছর যতই গড়িয়েছে, অলঙ্কার আতিশয্যের দায়ভার-মুক্ত হয়েছে সরল থেকে সরলতর, অথচ সেই সঙ্গে কাব্যিক ভাষার কাছাকাছিও চলে এসেছে! গদ্য পড়ছি, কিন্তু বাক্যগঠনে কাব্যের সংহতি, শাদামাটা প্রতিদিন ব্যবহারের গদ্য, অথচ এমন করে সাজানো, বসানো, আদর করে উপস্থাপিত, যে কখনো-কখনো অকৃত্রিম কাব্য বলে মনে হয়।

এমন গদ্য বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য বস্তু। পাঠকবৃন্দ এই গদ্যশৈলী কোন প্রবাহ বেয়ে কোন উৎস থেকে কোন গন্তব্যে কী বিন্যাসের নির্ভরে পৌঁছুলো, কখন কোথায় ঈষৎ বা অসামান্য মোড় নিল, তা অনুধাবন করতে স্বভাবতই আগ্রহবান।

এমনকী কোন মুদ্রাদোষ কবে থেকে প্রকট হলো, কবে তা মিলিয়ে গেল, কিংবা আদৌ বর্জিত হলো না, ইত্যাকার তথ্যও তাঁরা জানতে উৎসুক। উদাহরণত, উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে ক্রিয়া ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসু প্রথম জীবনে অতি সচেতনতার সঙ্গে, 'উম' প্রয়োগ করতেন : 'খেলুম-দেখলুম-বসেছিলুম-হেসেছিলুম' ইত্যাদি। ঠিক কোন পর্বে হালুম-খেলুম-মলুমের পালা শেষ হলো, লেখক পৌঁছুলেন 'আম'

প্রয়োগের প্রান্তরে—খেলাম-দেখলাম-বসেছিলাম-হেসেছিলাম'-এর অভ্যন্তরায়, সেই ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজতে গেলে সমগ্র রচনার কালভিত্তিক ধারাবাহিকতাকে সম্মান জানাতেই হয়।

'বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসংগ্রহ'-এর সম্পাদকমণ্ডলী এ ধরনের বিবেচনাদি, সখেদেই বলছি, সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি : 'প্রবন্ধসংগ্রহের বিন্যাস বিষয়ানুক্রমিক এবং বিষয় বিশেষে কালানুক্রমিক'। অর্থাৎ বিষয়ের সারাৎসার প্রধান বিবেচ্য, কালানুক্রমিকতার ব্যাপারটা পরে আসবে। আলোচ্য খণ্ড, যা সংগ্রহের প্রথম খণ্ড, সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত, লেখকের 'আত্মজীবনী ও রম্যরচনা' একসঙ্গে উপস্থাপন করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'প্রবন্ধসংগ্রহ'-এর শুরুতে গ্রন্থিত হয়েছে 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন' ও অসমাপ্ত 'আমাদের কবিতাভবন', এবং পরে রম্যরচনা হিশেবে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'উত্তরতিরিশ'।

ঝটপট কয়েকটি উপসংহারে পৌঁছে যাই আমরা। সম্পাদকমণ্ডলী সম্ভবত নিশ্চিত, 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন' এবং 'আমাদের কবিতাভবন'-এর বাইরে বুদ্ধদেব বসুর আত্মজৈবনিক আর কোনো রচনা নেই। তাঁরা বোধ হয় এটাও মনস্থ করেছেন, যা তাঁরা 'রম্যরচনা' বলে আখ্যাত করেছেন, সেই গোত্রের লেখালেখি বুদ্ধদেব বসুর জীবনবৃত্তান্তে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ও 'উত্তরতিরিশ'-এ সীমাবদ্ধ। সব কটিই মারাত্মক সিদ্ধান্ত। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি নিয়েই শুরু করা যাক। মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর আগে বুদ্ধদেব বাঙালি রান্না নিয়ে অতি রসালো একটি দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা বইয়ের আকারে যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভোগবিলাসী বাঙালি' শিরোনামে। সেই লেখাটি কি তা হলে 'রম্যরচনা' হিশেবে গ্রহণযোগ্য নয়'? প্রবন্ধ হিশেবে তার অস্তিত্ব তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া

সম্ভব নয়। আমরা কি ধরে নেবো প্রবন্ধসংগ্রহ-এর পরবর্তী কোনো খণ্ডে একটি বিভাগ আদৌ থাকবে 'রন্ধনশিল্প'?

আমার সবচেয়ে বড়ো অস্বস্তির প্রসঙ্গে আসি। সম্পাদকমণ্ডলী সিলমোহর এঁটে দিয়েছেন, 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' এবং 'উত্তরতিরিশ' উভয় গ্রন্থই 'রম্য' বলে বিবেচিত হওয়াব যোগ্য। অথচ এ ধরনের রচনা বাংলা সাহিত্যে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো, লোকমুখে তা তখন 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বলেই বর্ণিত হত, বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং ওই নামকরণের পক্ষপাতী ছিলেন, অন্তত সেরকম আমার ধারণা। তা ছাড়া সম্পাদকমণ্ডলী কি এই কথাই বলতে চান, অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে বুদ্ধদেব বসু অন্য কোনো 'রম্যরচনা' লেখেননি? 'সমুদ্রতীর' অথবা 'সব পেয়েছির দেশে'-র পর্বভাগ করতে গিয়ে তাঁরা একটু অস্বস্তির মধ্যে পড়বেন না কি? না কি 'ভ্রমণকাহিনী' নাম দিয়ে একটি পর্ব জুড়ে বিবেকের দায় মেটাবেন?

আসলে 'রম্যরচনা' লেবেলটি বড়ো ধন্দের। হাতের কাছে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস পাচ্ছি। 'রম্য' বিশেষণটিব তিনি তিনটি আলাদা অর্থ পেশ করেছেন : (১) রমণীয়; মনোহর; সুন্দর, (২) হৃদ্য; রুচ্য; রুচিকর; এবং (৩) বৃষৎ; বলকব। পালোয়ানি রচনার প্রসঙ্গ না হয় অনুত্থাপিত থাক, কিন্তু তার বাইরে মুদ্রিত ও মুদ্রণযোগ্য সব লেখাই তো সুন্দর, রুচিকর, মনোমুগ্ধকর। তা হলে কোন শ্রেণির রচনার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে তাদের 'রম্য' বলে ফরমান জারি করবো? বাস্তবে যা দাঁড়িয়েছে, অন্তত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে যা দাঁড়িয়েছে, একটু লঘু মেজাজের রচনাকে 'রম্য' বলে বর্ণনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি আমরা। লঘু সুরে লেখা প্রবন্ধ, খানিকটা কৌতুক বা ব্যঙ্গের সমাবেশ, ঠুনকো রসিকতার ছিটেফোঁটা কিংবা ঠাসা ভিড়, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ভাঁড়ামিতে পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম। বুদ্ধদেব বসুর 'ব্যক্তিগত'

প্রবন্ধাবলিতে এই লঘুত্বের তকমা চড়াতে অনেকেরই মন সায় দেবে না। ধরুন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র বিখ্যাত প্রবন্ধ 'পুরানা পল্টন'-এর উচ্চারিত বিখ্যাততর উক্তি — 'অনেকদিন আগে যে মেয়েকে ভালোবাসতাম, হঠাৎ কেউ যেন আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ করলো'। কোন নিরক্ষরতার ঢিবিতে দাঁড়িয়ে এই হৃদয়-হৃৎপিণ্ড-ছিন্নভিন্ন-করা বাক্যটিতে লঘুত্ব অর্পণ করবো? অথবা মনে আনুন 'উত্তরতিরিশ'-এ অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'মতান্তর ও মনান্তর'কে : সচ্ছন্দ, প্রাঞ্জল ভাষার প্রস্রবণ বেয়ে প্রবন্ধটির প্রব্রজ্যা, কিন্তু অতীব গুরুতর একটি ব্যক্তিগত তথা সামাজিক সমস্যা অতীব গুরুত্বসহ আলোচিত, একে লঘু রচনা বলা চরম ধৃষ্টতা। ফরাশি belles lettres-এর দ্যোতনা আক্ষরিক বাংলা অনুবাদে ধরা পড়বার বস্তু নয়।

সম্পাদকমণ্ডলীর সার্বভৌম ক্ষমতার জোরে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ও 'উত্তরতিরিশ'-এর 'রম্য' পসরা হিশেবে ঘোষণা যদি মানতেই হয়, আরো একটু মস্ত প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। ঘোড়ার সঙ্গে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক অনস্বীকার্য, অথচ 'রম্য' রচনাদির প্রাঙ্গণে বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণত্রয়কে কেন ঠেলে দেওয়া হলো, তার যুক্তি মেলা ভার। কোন অর্থে 'আমার ছেলেবেলা', 'আমার যৌবন' ও 'আমাদের কবিতাভবন' লঘুত্বের সমগোত্রীয়? বিধাতাপুরুষদের আচার-আচরণ বুঝে ওঠা শিবের বাবারও অসাধ্য, 'প্রবন্ধসংগ্রহ' গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর নিদানও — আমাকে ক্ষমা করুন তাঁরা — সমপরিমাণ দুর্বোধ্য।

এই সব অভিনব সিদ্ধান্তের পরিণামে এক ধরনের উলটপুরাণ আমাদের হাতে পৌঁছেছে। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে লেখা তিনটি স্মৃতিকথা দিয়ে 'প্রবন্ধসংগ্রহ'-এর শুরু, তাদের পালা শেষ হলে একেবারে গোড়ার দিকে লেখা কিছু প্রবন্ধসমষ্টির উপস্থিতি। এ

যেন অনেকটা নব কলেবরে সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলি কেউ প্রকাশ করেছেন ঢক্কানিনাদ সহকারে, এবং প্রথম খণ্ডের কবিতাংশের শুরু এই কবিতা দিয়ে : "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী"।

অথবা এমনধারা কি ঘটেছে, গ্রন্থস্বত্ব-ঘটিত গোলমালে ইচ্ছা থাকলেও সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের পছন্দের বইগুলি আপাতত হাতে পাচ্ছেন না, যে-ক'টি বইয়ের স্বত্ব নিয়ে বিতর্ক বা বিতণ্ডা নেই, সেগুলিই ত্রস্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পর পর সাজিয়ে ছাপিয়েছেন? যদি এমনটাই ঘটে থাকে, খোলাখুলি তা পাঠকদের জানাতে অসুবিধা কোথায়?

যেহেতু বর্তমান মুহূর্তে তাঁরা আমাদের মুখোমুখি অধিষ্ঠান করছেন না, সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি এই সাতকাহন অভিযোগ অবশ্যই একটু কর্কশ ঠেকতে পারে। আমি অভিযোগের ডালা সাজিয়ে দোরগোড়ায় ধাক্কাধাক্কি করছি না, আমার ভূমিকা অনুকম্পায়ী অভিমানীর। কৈশোর-প্রথম যৌবন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-আলোচনা-সমালোচনার ঝলোমেলো ঐশ্বর্যে দিনের পর দিন মোহাবিষ্ট থেকেছি. মানুষটির সাহিত্যসাধনার অবৈকল্য বরাবর আমাদের শ্রদ্ধাবনত করে রেখেছে। যে-অনুযোগঘেঁষা প্রশ্নাবলি উত্থাপন করছি, তা অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ। সেই সঙ্গে সামান্য আশা পোষণ, যে-সব কথা বলা হলো, বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসংগ্রহের আগামী খণ্ডগুলিতে সে-সব বিবেচনাভুক্ত হবে।

যা পেলাম না তা পেরিয়ে বর্তমান খণ্ডে যা যা পেলাম সেই প্রসঙ্গে আসি। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-র প্রবন্ধসমূহ 'আমার যৌবন'-এর স্মৃতিমেদুরতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়; ঢাকা শহর, সে-শহরের রমনা অঞ্চল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে অধ্যাপক-ছাত্রকুলের সম্মিলিত

জীবনচর্চা, 'প্রগতি'-র আড্ডা, যে কাউকে ভালো-লাগা ভালোবাসা, যা কিনা আসলে ভালোবাসাকেই ভালোবাসা, সে এক আশ্চর্য ঋতু। মাঝে-মাঝে মনে হয়, বুদ্ধদেব বসু অন্তহীন পথ পেরিয়েও যেন সেই প্রথম জীবনের বিধুর সামীপ্যে নিয়ত ফিরে-ফিরে গেছেন, সময়ের অবুঝ গণিত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যে-স্মৃতির অসহ্য স্পর্শসুখে তিনি ডুবে থাকতে চাইতেন, তার খানিকটা বাড়তি আভাস সম্ভবত পাওয়া যায় মধ্যযামে রচিত তাঁর দুটি গল্পে—'অপর্ণোর উদ্দেশে' (গল্পের নামটি পরবর্তীকালে বোধহয় পরিবর্তন করা হয়) ও 'ললিতা দেবী' — এবং নজরুলকে নিয়ে তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। তবে এই পর্বে তাঁর স্মৃতিবিন্যাসে একটি শূন্যতা নিয়ে এখনো আমি কৌতূহলী। গত শতকের বিশের দশকের উপান্তে বাংলা সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা সংক্রান্ত মারামারি, অনুরূপা দেবী প্রমুখের চ্যাংড়াদের নচ্ছার বাড়াবাড়ি নিয়ে সক্রোধ বিবৃতি, এরই মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-বুদ্ধদেব বসুরা হঠাৎ জাতে উঠে গেলেন। তাঁরা জাতে উঠে যেতে পারলেন একজন প্রবীণের বদান্যতায়। তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন, তাঁর রাশভারি পত্রিকার কাছাকাছি সংখ্যায় বুদ্ধদেবের 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন' ও অচিন্ত্যকুমারের 'ইতি' গল্পদ্বয় ছাপিয়ে। আমরা অনেকে আশা করেছিলাম, এই আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে এবং পিতামহপ্রতিম জলধর সেনকে নিয়ে, বুদ্ধদেব কোথাও বিস্তৃত করে লিখবেন। সেই আশা পূরণ হয়নি।

রিপন কলেজে তাঁর অধ্যাপনা পর্বের প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব 'আমার যৌবন' ও 'আমাদের কবিতাভবন'-এ অনেকটা লিখেছেন, লিখেছেন বিষ্ণু দে'র সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপের দিনগুলি নিয়ে চৌরঙ্গি থেকে খিদিরপুর-ছুঁয়ে-যাওয়া বালিগঞ্জের ট্রামে চেপে গড়ের মাঠ দীর্ণ করে

তাঁদের দু'জনের বিকেলে বাড়ি ফেরা সমেত। কলেজে অধ্যাপকদের টেবিল জুড়ে চা-চক্রও অনুল্লিখিত নয়। সেই আড্ডায় অন্য সতীর্থরা হই হট্টগোলে মশগুল, কিন্তু ওরই মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খসখস করে মস্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধের খসড়া তৈরি করছেন। কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ সাহিত্যিক তরুণ অধ্যাপকবৃন্দকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। 'আমাদের কবিতাভবন'-এ তার যথেষ্ট উল্লেখ, তবে তাঁর প্রয়াণের পর বুদ্ধদেব 'কবিতা' পত্রিকায় বিস্তৃততর একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলেন, জ্ঞানী অধ্যক্ষের স্নেহকোমল চরিত্রের অতি হৃদয়তা সম্পৃক্ত আখ্যান।

তাঁর কলেজ-পর্ব নিয়ে বুদ্ধদেব একটি গল্প মজা করে আমাকে বলেছিলেন, সুযোগ মিলেছে বলে এখানে লিপিবদ্ধ করি। পড়াতে তাঁর দারুণ আড়ষ্টতা, কলেজে ছাত্রদের পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন, তবে তাতে লোকপরিবাদ কমে না, বাড়ে। অধ্যক্ষের ঘরে কলেজের একমাত্র টেলিফোন। একদিন কোনো প্রকাশককে ফোন করে বুদ্ধদেব সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন, শুনতে পেলেন এক ছাত্র আর একজনকে জ্ঞানান্বিত করছে : 'দেখলি, শালা জাহানারাকে ফোন করে এলো'। জাহানারা অবশ্যই 'স্কুলের মেয়ে'-লেখিকা কলকাতার শৌখিন সমাজে একদা দাপুটে মায়াবনবিহারিণী জাহানারা চৌধুরী; কালস্রোতে প্রায় সমস্ত স্মৃতিই ধুয়ে-মুছে যায়।

বুদ্ধদেব বসু যখন উত্তর-তিরিশে উত্তীর্ণ, ততদিনে তিনি ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-র ফ্ল্যাটে জাঁকিয়ে বসেছেন, 'কবিতা' পত্রিকা সর্বত্র সম্মান কুড়োচ্ছে, 'কবিতাভবন' উতরোল করে প্রতি সন্ধ্যায় জমাট আড্ডা। 'উত্তরতিরিশ' গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পর্বে রচিত। কয়েক বছর বাদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, ব্ল্যাকআউট, এতদিনের নিশ্চিন্ত সমাজবিন্যাসে ঝড়ঝাপটা। কিছু-কিছু

নিত্যদিনের সামাজিক সাংসারিক সমস্যা নিয়ে তাঁর অগম্ভীর মেজাজে প্রবন্ধ রচনা, 'উত্তরতিরিশ'-এ যাদের সমাবেশ। বিভিন্ন বিষয়ে লেখকের মতামত, যেমন, খাকি রং নিয়ে, যেমন ঝোপ কামিজ নিয়ে, তা আপনি মানুন না-মানুন কিছু এসে যায় না, লেখক খানিকটা সময় আপনার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে লিপ্ত হচ্ছেন মাত্র। সময় যতই নিজের অববাহিকা অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছে, স্বয়ং লেখক হয়তো তাঁর মতামত পাল্টেছেন। রচনার বৈদগ্ধ্য তা হলেও তো মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

'উত্তরতিরিশ'-এ অন্তর্ভুক্ত 'ব্ল্যাকআউট' প্রবন্ধটির নিহিত ব্যাখ্যা অনেক রকম হতে পারে। বাধ্যতামূলকভাবে তমসাকে বরণ করতে হচ্ছে, ভাবুক কবি-সাহিত্যিকের পক্ষে তা নিয়ে দার্শনিকতায় মগ্ন হওয়ার নিশ্চয়ই অখণ্ড অধিকার। তবে কাছাকাছি সময়ে ব্ল্যাক-আউট উপলক্ষ করে বুদ্ধদেব একটি লঘু মুহূর্তের কবিতা রচনা করেছিলেন যা 'এক পয়সায় একটি' নামাঙ্কিত সেই অতি ক্ষীণকটি কাব্যপুস্তিকায় জায়গা পেয়েছিল। ব্ল্যাকআউটের বিপদসংকেত ধ্বনিত হয়েছে, সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানুষজন হুড়মুড় হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আশ্রয়স্থলের দিকে ছুটছে, কিন্তু প্রসাধন-বিলাসিনী জনৈকা কিশোরী বা তরুণীর তাতে হেলদোল নেই; সে তার সখী বা সহোদরকে আটকে দিয়েছে, টিপটা ভালো করে আঁকবে সে, তারপর সে অবতরণ করবে। সঙ্গিনীকে সে নির্দেশ দিচ্ছে, হাত আয়নাটি ভালো করে ধরতে : 'এ কী রে তোর হাত কাঁপছে কেন? ঠিক করে ধর, টিপটা পরে নি'। এবংবিধ হাল্কা চালে লেখা সেই যুগের কবিতাও তো এখন আর সহজপ্রাপ্য নয়।

অসমাপ্ত 'আমাদের কবিতাভবন' তন্নিষ্ঠ সাহিত্য-ইতিহাস পাঠকদের কাছে হাহাকার হয়ে থাকবে। 'কবিতাভবন' ঘিরে

যে-পৃথিবী, তার ইতিবৃত্ত একটু-একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডলে এখনো আমরা আবদ্ধ। যবনিকা কম্পমান, ঈষৎ সময়ের ব্যবধানে আরো অনেক অনেক উপাখ্যানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবে, ব্যক্তিকাহিনী-বিষয়চর্চা-ঘটনাবিশ্লেষণ সব মিলিয়ে আশ্চর্য অনির্বচনীয় নানা অভিজ্ঞতার অবশ্যম্ভাবী সমাহার। অবোধ হিংস্র জন্তুর মতো সহসা মৃত্যু সমস্ত প্রতীক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলো, অতএব আমাদের শুধু আক্ষেপের জপমালা।

তবে এখনো যা সম্ভবপর তা পরিপালনে চেষ্টা না হলে যে-ক্ষতি হবে তা নিছক আক্ষেপ দিয়ে ঢাকা যাবে না। বুদ্ধদেব বসুর বহু গদ্যরচনা, অধিকাংশ প্রবন্ধ, অগ্রন্থিত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়ে আছে। 'কবিতা' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত বিবিধ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাদ দিলেও, আরো বহু লেখা গত শতকের মধ্যবর্তী দশকগুলিতে 'সচিত্র ভারত', 'বেতার জগৎ', 'বিজলী' বা 'উল্টোরথ' গোত্রের পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এ-সব প্রবন্ধ প্রধানত লেখা হয়েছিল তাৎক্ষণিক বাড়তি উপার্জনের দায়ে, তা বলে তাদের সাহিত্যিক মূল্য আদৌ গৌণ নয়। বিশেষ করে যাঁরা 'রম্যরচনা'র অন্ধ ভক্ত, তাঁদের পক্ষে হর্ষোদ্দীপক বেশ কিছু রত্নের সন্ধান এই রচনাগুলির মধ্যে মিলবে, অবশ্য যদি তাদের জন্য অন্বেষণ সফল হয়। কেউ যদি দায়িত্ব নিয়ে এই অনুসন্ধানে অবিলম্বে ব্রতী না হন, অনুশোচনার সীমা থাকবে না।

সব শেষে একটি ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তিবোধের কথা বলি। প্রবন্ধসংগ্রহের এই খণ্ডে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-তে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধ, 'ভূতের ভয়', আমাকে এক বিশেষ শৈশবস্মৃতির আনন্দে শিহরিত করলো। আমরা যত নাগরিক হচ্ছি, আধুনিক হচ্ছি, তথ্য-প্রযুক্তি-অবগাহিত বিশ্বায়িত নারী-পুরুষ রূপে আদ্যন্ত

পরিশোভিত হচ্ছে, জীবন থেকে কল্পনা ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। কিছুই আর রহস্যের কুজ্ঝটিকায় ঢাকা থাকে না। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির পৃথিবীতে প্রবেশের অধিকার থেকে নিজেদের আমরা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত করেছি, যেহেতু রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, দেবদূতের গল্প, পরির গল্প আওড়াতে আমরা ভুলে গেছি, হ্যারি পটারের কৃত্রিমতায় আমাদের উত্তেজনা কুড়োতে হয়। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেই এই প্রবণতা নিরীক্ষণে বুদ্ধদেব বসু চিন্তায় আকুল হয়েছিলেন, অন্তঃস্থিত তাড়নায় ভূতের ভয়ের জয়গান রচনা করেছিলেন প্রবন্ধ ফেঁদে। আমার এই আলোচনার ইতি টানছি ওই প্রবন্ধে উদ্ধৃত বুদ্ধদেব রচিত একটি অপরূপ পদ্য পুনঃপরিবেশন করে : 'আমরা যখন ছোটো ছিলাম, পরিমল,/ মনে নেই কি কী হতো? / ইচ্ছে হলেই চলে যেতাম জাঞ্জিবার, / কটোপাক্সি, কীয়োতো। / জোছনা-রাতে দেখতে পেতাম পরিদের / জানলা দিয়ে লুকিয়ে, / অন্ধকারে ভূতের পায়ের আওয়াজে / রক্ত যেত শুকিয়ে'।

আকাশের নীল শূন্যে?

যে-বছরে সদ্য পদার্পণ করলাম আমরা, তা কবি অজিত দত্তের জন্মশতবর্ষ। তাঁর একটি একদা বিখ্যাত কবিতায় অজিত দত্ত নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিকতার সঙ্গে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন : 'জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই থাকে না, / শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায় / কালবিহঙ্গম উড়ে যায় / অবিশ্রান্ত গতি। / পাখার ঝাপটে তার নিভে যায় উল্কার প্রদীপ / লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি। / আমি সেই বায়ুস্রোতে খসে-পড়া পালকের মতো / আকাশের নীল শূন্যে মোর কাব্য লিখি অবিরত'।

এই বিশেষ কবিতাটিকে আমি 'একদা-বিখ্যাত' বলে উল্লেখ ভেবে-চিন্তেই করছি। হালে কেউই আর অজিত দত্ত কিংবা তাঁর কাব্য নিয়ে ন্যূনতম আগ্রহও দেখান না। গত শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর যে-উত্তেজক পর্ব, তার প্রধান নায়ক হিশেবে যে-ক'টি নাম ঘুরে-ফিরে উচ্চারিত হয়—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী — অজিত দত্ত কোনোদিনই সেই তালিকাভুক্ত হতে পারেননি। এই 'অকৃতকার্যতা'-র বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব। অজিত দত্ত, তন্নতালাশ করে

দেখুন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির প্রভাব থেকে সর্ব অর্থে মুক্ত, এমনকী কাজী নজরুল ইসলাম-মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যাদর্শ থেকেও তিনি বহুদূরে সংস্থিত। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যুগ্মভাবে 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, 'কবিতা' পত্রিকার উন্মেষমুহূর্তে অগ্রগণ্য উৎসাহদাতাদের তিনি অন্যতম প্রধান, অথচ বরাবরই যেন একটু আলোদা থেকে গেছেন। হয়তো তাঁর একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছায়া পড়েছে এখানে। কবি-সাহিত্যিকদের আন্দোলনে বরাবরই তিনি থেকেও নেই। ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-র দোতলায় যখন তুমুল কাব্য-সাহিত্যচর্চাজড়িত ঝলোমলো আড্ডা চলছে, ও-বাড়ির তেতলায় অজিত দত্তের ফ্ল্যাটে তখন অন্য মেজাজের আড্ডা, যাতে সাহিত্য ঠিক উপেক্ষিত নয়, কিন্তু তা ছাপিয়ে বহু অন্যতর প্রসঙ্গ, রাজনীতি-চলচ্চিত্র-নাট্যজগতের ঢলাঢলির কেচ্ছা নিয়েই শুধু নয়, ফাটকা বাজারের ওঠা-নামা নিয়ে পর্যন্ত। সেই সঙ্গে—কারো-কারো বিচারে যা অতীব অশ্লীল সময়হেলন—তাস-পাশার অসংকোচ মৌতাতও। অজিত দত্তের তাই যাবতীয় সাহিত্য-আন্দোলনের বাইরে অবস্থান। তা ছাড়া, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন, সমাজসচেতনার কোনো চিহ্নই তাঁর রচনায় নেই। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হলে আলাদা যে-কক্ষে পাওয়া যেত—এবং এখনো যায়—তাতেও কোনো ঋতুতেই তাঁর আদৌ উৎসাহ ছিল না। এ-ধরনের আন্দোলনের কুলপুরোহিতদের থেকে, সময় যতই গড়িয়ে গেছে, তিনি ক্রমশ দূরে সরে গেছেন, এমনকী এঁদের মধ্যে দু-একজনকে নিয়ে একটু-আধটু চিমটিও কেটেছেন ('বদিনাথও পদ্য লেখে...')। আরো যা উল্লেখ্য স্পষ্ট করে বলা না হলেও অনেকেই স্বগত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, অজিত দত্তের স্বাতন্ত্র্য যদিও অনস্বীকার্য, তিনি তা হলেও রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী, যা আধুনিকতার সংজ্ঞার

সঙ্গে খাঁজে-খাঁজে মিলে যেতে অপারগ; তাঁর কবিতায় বিষ্ণু দে'র তীক্ষ্ণ চতুরালি নেই, সুধীন্দ্রনাথের নৈরাশ্য তথা নাস্তিকতার ঠাসবুনুনি নেই, সমর সেনের বিষণ্ণ চতুরালির সঙ্গে অসংকোচে-মেশানো রাজনৈতিক বিঘোষণাও অনুপস্থিত, যেমন অনুপস্থিত জীবনানন্দ-কাব্যের দর্শনজটিলতাযুক্ত ভাষা-কুহেলিকা।

তেলে জলে মিশে খায় না, আধুনিকতার সঙ্গেও নাকি রোমান্টিকতার তেমনতরো আড়াআড়ি; আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে অন্তত সেরকম ফরমানই জারি হয়েছিল। এটা তো ষোলো আনার উপর আঠারো আনা ঠিক, অজিত দত্তের কবিতা রোমান্টিকতায় সমাচ্ছন্ন, তাঁর ভাষা ও সেই ভাষার সাহায্যে গঠিত চিত্রকল্পের পরিমণ্ডল আমাদের রূপকথার পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের দেশে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির রাজ্যে, গুণবতী রাজকন্যার মায়াকাননে। পয়ারের শিথিল রোমন্থনে আমরা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি, কুহকের গভীরে কুহকতর কাউকে যেন খুঁজে পাই, কেউ যেন পাশে বসে আমদের বশীকরণের মন্ত্র পড়াচ্ছে, আমরা কোনো মূর্ছার সম্মোহনে এক আপাত-অধরাকে দু'মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলার উপক্রম-মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছি। অথচ, এরই পাশাপাশি, হঠাৎ ভিন্ন একটি স্বর, সেই স্বরেও কবিত্বের টইটম্বুর সত্ত্বেও শাদামাটা সোজা-সাপটা উচ্চারণ, বাংলা কাব্যে এবংবিধ ঘরোয়া সাহসিকতার সঙ্গে পরিচয় ইতিপূর্বে ঘটেনি। কবিতা যেন কোনো কেতা বা ভব্যতার ধার না ধেরে, না রেখে-ঢেকে আমাদের দৈনন্দিন সংলাপের সঙ্গে অতি সহজে নিজেকে যুক্ত করেছে। এত স্বচ্ছন্দ তার এই অনুপ্রবেশ যে পাঠককুলকে দ্বিধান্বিত হবার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। 'কুসুমের মাস' কাব্যগ্রন্থে এই সারল্যের রাশি-রাশি নিদর্শন ছড়ানো-ছিটোনো। 'ভাবিতেছিলাম আমি এতক্ষণ কেবল তোমায়',

'এক গ্লাস জল দেবে, পেয়েছে পিপাসা', 'তুমি আজ ক্লান্ত বড়ো, বেশি কথা নাহি কহিলাম', 'বাহিরে চাহিয়া দ্যাখো, আজ রাত্রি চমৎকার নয়?', 'ঈশ্বর মানি না আমি, মানি শুধু মনের আদেশ', 'আমি যারে ভালবাসি, সে যদি থাকিত আজ পাশে'। মনে হয় এই পর্বে অজিত দত্ত যেন বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোমান্টিক আকৃতিমালাকে নিখাদ স্বর্ণালঙ্কার নয়তো ঝলোমলো জড়োয়া গয়নার হাঁসফাঁস থেকে মুক্ত করে অনাবিল ঘরোয়া বেশে হাজির করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। সেই বিশেষ সময়েব কথা বিবেচনা করুন, কবিতার ভাষা তখনো ক্রিয়াপদের বনেদি অনুশাসন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তা হলেও একদিকে বুদ্ধদেব বসু স্পষ্ট উচ্চারণে, ঘোর-প্যাঁচ বর্জন করে, নিপাট বাচনে বলেছেন, "জানো না চোখের জল, বাসি মুখে শুধু চেয়ে থাকা / আজিকে এমন দিনে ঠেকিবে যে বড়ো ফাঁকা ফাঁকা', তাব সঙ্গে তাল মিলিয়েই অজিত দত্ত লিখছেন, 'জানুক সকল লোকে, এতটুকু কবি না কেয়ার, / কত ভাল লাগে আর ঔদাস্যেব মিথ্যা অভিনয়'।

তা হলেও অজিত দত্ত ললাটলিখন এড়াতে পারলেন না, সমসাময়িক পরিভাষায় তিনি হাফ-গেরস্ত হয়ে রইলেন : আধুনিক, তবে রোমান্টিক। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য জনপরিবাদ শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে খোল-নলচে তো আমূল পালটেছে। আজ থেকে ছ-সাত দশক আগে যাঁদের পুরো সেলাম ঠোকা বাধ্যতামূলক ছিল, অন্য যাঁদের জন্য দায়-সারা অর্ধেক সেলাম, কালস্রোতে তাঁরা একাকার হয়ে গেছেন, জীবনানন্দ একমাত্র ব্যতিক্রম। তা ছাড়া এক হিশেবে অব্যবহিত রবীন্দ্র-উত্তর পর্বের কবিরা এখন সকলেই সমান উপেক্ষিত। তাঁদের নিয়ে মাঝে-মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়াদির বাংলা সাহিত্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে একটু-আধটু

গবেষণাচর্চা হয় হয়তো, কিন্তু সূক্ষ্ম জাতিবিচারের দিন অবসিত, অজিত দত্ত যতটা মনোযোগ আকর্ষণ করেন, বিষ্ণু দে-সমর সেনরাও প্রায় ততটাই; কে মুড়ি, কে মুড়কি তা নিয়ে ভাবাভাবিও অপ্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে গেছে। এমনকী জীবনানন্দ নিয়ে সম্মোহনেও মনে হয় সম্প্রতি ভাটা এসেছে।

এই অবস্থায় সেই আদি যুগের উদ্ধতসাহসসমৃদ্ধ কবিদের ভাগ্যলাঞ্ছনা নিয়ে বিলাপব্যসনের কোনো সার্থকতা নেই, দুয়ার জুড়ে নতুন অতিথিরা এসেছেন, তাঁরা মালাখানি যথানিয়মে কণ্ঠে ধারণ করেছেন। অজিত দত্ত যতটা বিস্মৃত, বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তীরা ততটাই। অনুরোধে-উপরোধে একটি-দু'টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অজিত দত্তের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ করে একটি-দু'টি সভা সম্ভবত আহূত হবে, দুটো-একটা অধ্যাপকোচিত বক্তৃতা হবে, অতঃপর ফের সর্বসমাচ্ছন্ন বিস্মৃতির অন্ধকার। এবং সেজন্যই একটু আলাদা করে আনন্দ পাবলিশার্সকে ধন্যবাদ, তাঁরা এত যত্ন নিয়ে এ-বছর অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' কাব্যগ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। 'কুসুমের মাস' প্রথম প্রকাশের পর সাতাত্তর বছর অতিক্রান্ত, তবে এখানেই তো রচনার ধ্রুপদী সংজ্ঞা তার অনুষঙ্গ অন্বেষণ সার্থক। এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে সানন্দ বিহার করে বেড়াতে বর্তমান আলোচকের কোনো অসুবিধাই হয় না। তাঁর সুলিখিত প্রারম্ভ-প্রবন্ধে ("অজিত দত্তের কবিতা ও 'কুসুমের মাস' ") নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অজিত দত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মেষ অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সুশীলকুমার দে'র প্রিয় ছাত্র ছিলেন, গুরু-শিষ্য মিলে বৈষ্ণব সাহিত্য ও চর্যাগীতি গভীর ভালোবাসার বলে গুলে খেয়েছেন, 'কুসুমের মাস'-এর একাধিক কবিতায় তার প্রতিভাস, অথচ স্বভাবতই

রাগ-অনুরাগ-অনুভূতির প্রকাশের আদল অন্য ছাঁচে পরিবেশিত। প্রেমের আকর চিরকাল একই থেকে যায়, প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও তাই, শুধু পরিবেশ পাল্টায়, ভাষায় বিভঙ্গে কালপ্রবাহজনিত রূপান্তর ঘটে। বিদ্যাপতির 'চল দেখন যাই ঋতু বসন্ত / জহা কুন্দকুসুম কেতকী হসন্ত।।'' কী অগাধ স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন সজ্জায় ভূষিত হয়ে আমাদের নন্দিত করে : ''আমিও কুসুমপ্রিয়। আজিকে তো কুসুমের মাস।/ মোর হাতে হাত দাও, চলো যাই কুসুম-বিতানে।/ বসিয়া নিভৃত কুঞ্জে কহিব তোমার কানে কানে, / কোন ফুলে ভরিয়াছি জীবনের মধু-অবকাশ। / লঘুপদে চলো যাই, কেহ যেন আঁখি নাহি হানে, নিঃশ্বাসে জাগে না যেন তন্দ্রাস্তব্ধ রাতের বাতাস'।

কবিতার অন্তঃস্থিত এই মাদকতাবোধ—যাকে 'রোমান্টিক' বলে লেবেল মারা হয়েছে — এখন পাঠককুলকে হয়তো ঠিক তেমন করে মোহিত করবে না। কিন্তু বাংলা কাব্যের এই পর্ব তা বলে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়: রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে, ভাষাকে নতুন উপচারে সাজিয়ে বিদ্যাপতির এই পুনর্কথন। বাস্তবতার প্রসঙ্গ উপেক্ষার ব্যাপার, কেউই বলবেন না তা। যে-সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র সরবে ঘোষণা করেছেন, 'আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির / আর ছুতোরের, মুটে-মজুরের, / — আমি কবি যত ইতরের,' একই পরিমণ্ডলে অবস্থান করেই অজিত দত্ত 'কুসুমের মাস' নিয়ে বিভোর হচ্ছেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দেহতত্ত্বের গহনে ডুবে গিয়ে বলছেন : 'শাঙনের গাঙ ভাঙন ধরেছে এমনই তোমার দেহ।/ বুকেতে সোনার গাগরি ভরিয়া এনেছো কি অনুলেহ? / ময়ূরপঙ্খী তনু / ময়ূরের মতো পেখম মেলেছে, দেখিয়া উতলা হনু,' অথবা বুদ্ধদেব বসু নিয়ত রাত্রির মতো যার চুল, সেই কঙ্কাবতীর স্বপ্ন দেখছেন। এই সব জড়িয়েই তো বাস্তবতা, রোমান্টিক

আকুলি-বিকুলি। কাব্য ও সাহিত্যের কোনো অধ্যায়ই তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়, অতএব অপাঙ্‌ক্তেয় নয়।

এখন কবিতার প্রকরণ আদ্যন্ত পরিবর্তিত, নেহাত গেঁয়ো লোকেরা ছাড়া কেউ সনেটচর্চা করেন না, করলে জাত যাওয়ার ভয়। সেই কারণেই আলাদা করে উল্লেখ করতে হয়, বাংলা ভাষায় অজিত দত্তের চেয়ে উৎকৃষ্টতর সনেট কেউ রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ। কার্যকারণ সম্পর্কের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না; হয়তো অনুশাসনের নিগড় এত কঠিন বলেই, সনেটের ক্ষেত্রে কল্পনাকে সংহত সৌষ্ঠবে প্রকাশ করা জরুরি সেজন্যই এবং সেই হেতুই যে-রূপকথার জগতে অজিত দত্তের একচ্ছত্র অধিকার, তার বর্ণনা সনেটের মধ্যবর্তিতায় ঝিলকিয়ে ওঠে।

বহু বছর আগে অজিত দত্তের ছন্দপ্রয়োগে ঐশী নৈপুণ্যকে বাহবা জানিয়ে বুদ্ধদেব বসু ছড়া কেটেছিলেন : 'ছিলে তুমি ওস্তাদ ঘুড়ি-উড়িয়ে / ছন্দের বাঁকাচোরা মোড়-ঘুরিয়ে। / হাওয়ায় রঙ্গে কত রঙিন ঘুড়ি / ভেসেছে নিপুণ যার হাতের টানে / হৃদয় রঙিন যার খেয়াল-মুড়ি/ উছলেছে ছন্দে গানে'। এই প্রশস্তির দাবি প্রমাণে সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন কারো দেখা দিলে দু'পা বাড়াবারও দরকার পড়বে না; সেই বৈদগ্ধ্যের ভূরি-ভূরি উদাহরণ 'কুসুমের মাস'-এর সর্বত্র ছড়ানো।

অথচ অজিত দত্ত নিজের কবিকীর্তি সম্পর্কে বরাবর নির্মোহ থেকেছেন। কবিতাকে ভালোবেসেছেন, কবিতা রচনার শিহরিত আনন্দে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, তা হলেও কোনো আসক্তিতে নিমজ্জিত হননি। সেটা গুণ না দুর্বলতা তার বিচার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি নিজে কিন্তু নিঃসংকোচ, অতি-আন্তরিক কবুল করে গেছেন :

'একদিন মনে বড়ো ছিল গর্ব / পৃথিবীর সুর আমি গানে ধরবো', কিন্তু পরিক্রমা শেষ, উপলব্ধিতে ঋদ্ধ, 'আজ তাই চুপি-চুপি স্বীকার করি, / মাঝারির বড়ো দলে আমিও পড়ি'।

অজিত দত্ত নিজে যা-ই লিখে গিয়ে থাকুন, কালবিধাতা হয়তো অন্য নিদান ঘোষণা করবেন। 'কুসুমের মাস'-এ অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘতম কবিতা, 'মালতী', কবির অলজ্জ অপাপবিদ্ধ দয়িতা-বন্দনা। পরবর্তী পর্যায়ে ঈষৎ সংক্ষেপে সেই বন্দনা কবি পুনরুচ্চারণ করেছিলেন : 'মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম;/ মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম'।

'কুসুমের মাস' দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, সেই স্বাক্ষর আগুনে পুড়বে না, প্লাবনে ডুববে না, ক্লেদাক্ত ধুলোয় ধূসর হবে না।

কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, কৈশোরের উপান্তে অস্থির আমি, আধুনিকতায় প্রবেশ করেছিলাম বিশেষ একটি কবিতার বিশেষ একটি পঙ্‌ক্তির জাদুস্পর্শে। ওই বিশেষ পঙ্‌ক্তিটি আমার কাছে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিল। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সেই কবিতা—যা অবশ্য তার আগেই 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষের কোনো শাখায় ছাপা হয়ে গিয়েছিল—, বিষ্ণুবাবুর সেই আশ্চর্য পঙ্‌ক্তি আমার কাছে এখনো তার অফুরান মোহিনী মায়া নিয়ে প্রতিবার হাজির হয়; একই কাহিনী প্রতিবার, আমার বুদ্ধি শাণিততর হয়, আমার আবেগের শরীরে আরো অঢেল অনেক আনন্দ সংপৃক্ত হয় প্রতিবার।

'আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা'। আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন/কথা। আবহাওয়া/নিয়ে/ভাবনাহীন/কথা। আবহাওয়া/ নিয়ে, ভাবনাহীন/কথা। আবহাওয়া, নিয়ে, ভাবনাহীন, কথা। অন্ত্যানুপ্রাস, পরপর হ্রস্বিত স্বরবর্ণের প্রয়োগ, অথচ পাশাপাশি একটি বিশেষ ব্যঞ্জনবর্ণ জিভের ডগায় ঘুরে ফিরে বেড়ানো, প্রায় জীবনানন্দের সেই বিড়ালের মতো। আবহাওয়া, ভাবনাহীন। 'কহিলে

তুমি কহিলে তুমি কী যে 'আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন...'। যেন ব্যঞ্জনবর্ণের সাজিয়ে যাওয়া অনুপ্রাসের সঙ্গে অনুরূপ স্বরবর্ণের অনুপ্রাসের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আরো একটু বাদে, 'কী যে'-র সঙ্গে বঙ্গ করতেই যেন 'নিজে' দিয়ে মিল জুড়ে দেওয়া। আধুনিকতা কাকে বলে আমার বুঝতে বাকি রইলো না।

রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা, কবিতার বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথেরই দৃষ্টান্বিত প্রকরণ, কিন্তু বিষ্ণুবাবু আমাদের ওই একটি পঙ্‌ক্তির ওই কয়েকটি শব্দবিন্যাসের মধ্যবর্তিতায়, অনেক অনেক দূর পৌঁছে দিলেন, আধুনিক কবিতায় প্রবিষ্ট হলাম আমরা। 'কহিলে তুমি', 'কহিলে'-র সাধু প্রয়োগে কি একটু রঙ্গ লুকিয়ে আছে, তির্যক কোনো অনুষঙ্গ, পূর্বসূরিদের দিকে তাকিয়ে একটু মুখ-ভ্যাঙচানো? জনৈক প্রতীপ-রোমান্টিক কোনো আকাট রোমান্টিককে এক হাত নিচ্ছেন? 'কহিলে তুমি', কী বাণী তোমার চন্দনমুখ থেকে নির্গত হলো? 'দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে'। বাকিটুকু তো আর শোনাব যেন দরকারই নেই। এবার একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার পর্যায়ে চলে যেতে পারি আমরা, নিজ-নিজ কল্পনাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার সঙ্গে জুতে নিয়ে। কৌতুকে ব্যস্ত হতে পারি, অন্যমনস্কতায় আরো কিছু অলস পঙ্‌ক্তিতে বিহার করে ফিরতে পারি, আনন্দে উন্মুখর হতে পারি, অবসাদে ধূসর হতে পারি; আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথার মতো, আমরা দায়িত্বের অর্গল পেরিয়ে যথেচ্ছাচারী হ'তে পারি; আমাদের জন্য, অজুহাত বলুন, উপচার বলুন, তা তো তৈরি। অন্তর্বর্তী একটি পঙ্‌ক্তির সিঁড়ি পেরোলেই, 'আবেশ-বশে—কথার মাদকতা'। ফের অন্ত্যানুপ্রাস, সেই অনুপ্রাসের ঘোর, সেই ঘোরে বুঁদ হয়ে যেতে পারি এখন, কী যেন কথা এইমাত্র বিষ্ণুবাবু ব্যবহার করলেন, হ্যাঁ, 'মাদকতা'।

রবীন্দ্রনাথ থেকে, যদি ব্যাকরণের বা শব্দব্যবহারের নিরিখে

বিচার করা হয়, তেমন-একটা মস্ত দূরে চলে যাইনি আমরা। রবীন্দ্রনাথই তো 'বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'-র ইশারায় মাতিয়েছেন আমাদের একদা। প্রথা ভেঙে এক ভয়ঙ্কর শঙ্কাকুল নিষিদ্ধ প্রান্তরে বিষ্ণুবাবু অতএব নিয়ে যাননি আমাদের। কিন্তু ব্যাকরণের চেয়েও বড়ো ব্যাকরণ-ব্যবহারের ভঙ্গিমা। যে-মুহূর্তে বলা হলো, 'আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন', যোজনের পর যোজন অতিক্রম ক'রে চলে গেলাম আমরা। তার পব থেকে, যথার্থই, আমরা চলি সমুখপানে কে আমাদের বাঁধবে।

ইতিহাস তার দ্বান্দ্বিক প্রবাহে অবিচল থেকেছে, বিষ্ণুবাবুর সৃষ্টিপ্রবাহের তোড়ে ক্রমশ ভেসে গিয়ে, অতিক্রান্ত রাত্রিতে রজনীগন্ধাবনে যে-ঝড় বয়ে গেছে, তার বর্ণনায় চকিত হয়েছি, লুণ্ঠিত দ্বারকায় ব্যর্থ গাণ্ডীবের অক্ষম বিলাপ হৃদয়ে নিংড়ে উপলব্ধি করেছি, পার্টির স্লোগানে জোগান দিয়েছি, আইসায়ার দৃষ্টিক্ষেপের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে কারো পঁচিশ বছরের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েছি, সন্দীপের চরের অবয়বে ব-দ্বীপের মতো জড়িয়ে গেছি, তদ্‌গত প্রার্থনা জানিয়েছি, 'জল দাও আমার শিকড়ে,' কিন্তু নতুন ক'রে আর কোনোদিন বুকে চমক বেঁধেনি, 'কহিলে তুমি কহিলে তুমি'র উচ্চারণ যে-আধুনিকতায় আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল, তা থেকে আর অপসরণ ঘটেনি কখনো। আমার চেতনা-উন্মীলনের কাহিনী বিধৃত ক'রে আছে অসম্ভব-অভাবনীয় আধুনিক ওই পঙ্‌ক্তিপুঞ্জ। আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা; কথার মাদকতা পেরিয়ে অন্যত্র কোথায় যেন পৌঁছে যাওয়া। ভবঘুরে ঘোরে বেগানা? কিন্তু না, তা তো নয়, এক অমরাবতীর নিশ্চিন্ত দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, বিষ্ণুবাবু অমরাবতীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের, এখনো আঁকড়ে ধরে আছি সেই মায়াবী ভূখণ্ড।

অথচ, 'চোরাবালি'-র পরবর্তী সংস্করণগুলি ঘেঁটেও দেখিনি আর কোনোদিন। বিষ্ণুবাবু কবে, চুপিচুপি 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে'-কে 'বল্লে তুমি, বল্লে তুমি কী যে'-তে রূপান্তরিত করেছেন, নাকি আমারই স্মৃতিবিভ্রম, তা নিয়ে মাথা-ঘামানো প্রয়োজন মনে করিনি। হয়তো বিষ্ণুবাবু তাঁর বচনভঙ্গিকে, রঙের অতিরিক্ত প্রসঙ্গ বিসর্জন দিয়েই, আরো ঘরোয়া ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান করতে চেয়েছিলেন, হয়তো আমার স্মৃতিই আমাকে মুখ ভ্যাঙচাচ্ছে, কিন্তু না, আমি, নিজে অন্তত, 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে'-র প্রকোষ্ঠেই থেকে যাবো: 'কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কী যে,' যা আমাকে, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, এক দমকায় আধুনিকতায় পৌঁছে দিয়েছিল।

আমার মৃত্যুর পর

বছর কয়েক আগে একটি স্মৃতিকথা লিখতে সাহসী হয়েছিলাম, বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনার অর্ধ-কিংবা অসম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, সেই সঙ্গে যে-মানুষজনের সঙ্গে দশকের পর দশক ধরে পরিচয়-সখ্য-সংঘর্ষ, তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানের আখ্যানের সমষ্টি সেই স্মৃতিগ্রন্থ : 'আপিলা চাপিলা'। স্মৃতিকথাটির একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তি . '...এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে দুটি আলাদা চরিতার্থতাবোধ : এক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার জন্ম; দুই, আমার চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস।'

এখানেই সমস্যায় আক্রান্ত হতে হয়। বিভিন্ন প্রাঙ্গণ থেকে কৌতূহলী প্রশ্ন, অবিশ্বাসজনিত প্রশ্ন, চিমটি-কাটা প্রশ্ন : কী করে মেলাই আমি, কী করে মেলানো সম্ভব, যে-দুই প্রজ্ঞার প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করেছি, তাদের? নিজেকে মার্কসবাদী বলে গর্বিত প্রচার করি, মার্কসীয় বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজের জিজ্ঞাসা-বিবর্তন বিশ্লেষণে নিমগ্ন হই, মার্কসীয় ধ্যানধারণার প্রেক্ষিতে অর্থশাস্ত্রের গহনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অন্বেষণ করি। অথচ সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অভিভূত গরিমাবোধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জন্মগ্রহণ করেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি, তাঁর কবিতায় গানে প্রতিনিয়ত অবগাহিত

হয়ে অধরার সন্ধান পাই, আমার চেতনা জুড়ে, মার্কসের পাশাপাশি, সব সময়ই রবীন্দ্রনাথের আনন্দনিষ্যন্দিত উপস্থিতি।

না, এই আপাতহেঁয়ালি নিয়ে আমার মনে আদৌ কোনো দ্বিধানুভূতির যন্ত্রণা নেই। কী করে এটা অস্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা দিয়েছেন। আজ থেকে ছশো-সাতশো বছর আগে বাংলা একটি প্রায় নিরেট কোনোক্রমে-খুঁড়িয়ে-চলা ভাষা। দেবভাষা সংস্কৃত ভেঙে পালি, পালির অপভ্রংশ হিশেবে বাংলা ভাষার উন্মেষ-উন্মোচন। সেই সময়কালে আমাদের মাতৃভাষা যথার্থই অতি শাদামাটা অবস্থায়, শাদামাটা মানুষের চিন্তাপ্রকাশের চিন্তা-বিনিময়ের ভাষা, সেই ভাষার তরণী বেয়ে সংস্কৃতির-জ্ঞানের-চিন্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছনো সত্যিই অসম্ভব ছিল। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত-মদনমোহন তর্কালংকার-বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা আমি অস্বীকার করছি না। তা হলেও যে বাংলা আধুনিক পৃথিবীতে অন্যতম সুচারুতম সুঠামতম মধুরতম ভাষা বলে বন্দিত, তা প্রায় পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের দান। মাত্র পয়ষট্টি-সত্তর বছরের পরিচিকীর্ষায় তিনি বাংলা ভাষার আদল খোলনল্‌চে পালটে দিলেন। আধুনিক থেকে আধুনিকতর, আধুনিকতর থেকে আধুনিকতম, একটি সৌষ্ঠবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বাংলা ভাষা পৌঁছে গেল, এবং পৌঁছে গেল—ঠ্যাটা উক্তি করছি না—একান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে। বাংলা ভাষার মধ্যবর্তিতায় এখন যে আমরা দুরূহতম দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারি, কিংবা মহত্তম গুণবতী সাহিত্যসৃষ্টির তপস্যায় ব্রত হতে পারি, সাফল্যের অভাবনীয় শিখরচূড়ায় উত্তীর্ণ হতে পারি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষাকে তৈরি করে গিয়েছেন বলেই। আমরা হাসি, কাঁদি, গল্পগুজব করি, কেচ্ছা ছড়াই, গানে গুনগুনিয়ে উঠি, কলহে প্রবৃত্ত হই, সব-কিছুরই প্রকাশের পথ

বাতলে দেয় রবীন্দ্রনাথ দ্বারা নির্মিত-চর্চিত, রূপমণ্ডিত বাংলা ভাষা। ভাষার দার্ঢ্য এবং, সেই সঙ্গে বিস্তার না থাকলে চিন্তা এলিয়ে পড়ে, যুক্তির সারণি বেথুপমান হয়, ভাবনাকে সংহত রূপ দিতে আমরা অসমর্থ হই। রবীন্দ্রনাথ-দত্ত ভাষার ভেলায় ভেসেই আমরা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতে সমর্থ হই। হাটে-মাঠে-ঘাটে যখন মার্কসবাদী হিশেবে নিজের বিশ্বাসের কথা অন্যদের শোনাতে যাই, তখনো তো আমার প্রধান অবলম্বন আমার মাতৃভাষা, যা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রবীন্দ্রনাথ যা ভূষণে-রতনে আমাদের জন্য রচনা করে গিয়েছেন, অথচ ভূষণরত্নের ভারে প্রসাদগুণ বিমূঢ় হয়নি।

আমার মনে তাই কোনো জড়তা নেই, আত্মসংকটের প্রশ্ন ওঠে না। আমি মার্কসবাদী, সেই সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথে সমাচ্ছন্ন : এই যুগ্ম গর্বভাষণেই আমার সত্তা অহংকারে উচ্ছল। শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে তাঁর গল্পে-প্রবন্ধে ডুবে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই ক্রমশ আমার চেতনার বিকাশ ঘটেছে, আমি পৃথিবীকে বুঝতে শিখেছি, সমাজকে তাঁর বিবিধ অসামঞ্জস্য-পাপাচার সমেত, জানতে পেরেছি, এবং সে-সব সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সহায়ক ভাষা তৈরি করে দিয়েছিলেন বলেই, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের গতি নেই, বাঙালি হিশেবে এই সপ্রেম কাতরোক্তি করতে গিয়ে আমার মার্কসীয় বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় চিন্তায় আকুল-ব্যাকুল হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই তো আমি মার্কসবাদী হতে পেরেছি। একদা অনেক প্রগল্ভ বালখিল্য তর্ক-বিতর্কের আয়োজন হয়েছিল : রবীন্দ্রনাথ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সামন্তপন্থী, পদ্মার তীরে হাউসবোটে দিনযাপন করে প্রজাদের উপর খবরদারি করতেন, তাদের কাছ থেকে নির্মম ঔদাসীন্যে খাজনা আদায়

করাতেন, পরবর্তী জীবনে জমিদারি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ছেলেকে যখন উত্তরবঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে প্রতি চিঠিতে বিশদ উপদেশ ফিরি করতেন, যাতে প্রজাকুলের কাছ থেকে প্রাপ্য নিষ্কাশনে বিগলিত করুণাবশত কোনো ব্যত্যয় না ঘটে, ইত্যাদি নিয়ে মস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ফাঁদা হয়েছিল।

সামগ্রিক বিচারে এ-সমস্ত এলেবেলে প্রসঙ্গই উৎক্ষিপ্ত। কোন শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করেছি তার জন্য আমরা কেউই দায়ী নই। সেই শ্রেণিভুক্তিহেতু কিছু-কিছু দায়ভার, ইচ্ছা বা পছন্দ করি না করি, আমাদের বহন করতে হয়। কিন্তু জীবমণ্ডলের অন্য সদস্যাদের থেকে এখানেই মানুষ হিশেবে আমাদের পার্থক্য: আমাদের আদি সংস্থান থেকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি, বেরিয়ে যেতে পারি। আমরা পেরিয়ে যাই, এগিয়ে যাই, ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান শুনতে পাই, নিজেদের চেতনা ও সত্তাকে অহরহ শাণিততর, সংস্কৃততর করতে শিখি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কোন শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কী বিশেষ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থাকতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, কিংবা হয়তো-বা পছন্দ করেছিলেন, সে-সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক পৃথিবীকে, মনুষ্যসমাজকে, জাতিকে, দেশকে, তিনি কী দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া, এটাও বা কী করে ভুলে থাকি, যে যিনি অনুপ্রাস অথবা মিলের তাড়নায় লিখেছিলেন 'গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন দু'মুঠো অন্ন তাকে দুই বেলা দেন', তিনিই আড়াই-কুড়ি বছর আগে রচনা করেছিলেন 'দুই বিঘা জমি'। কী করে বা এটাও ভুলি, ভূস্বামী রবীন্দ্রনাথই জীবনের শেষ প্রান্তে প্রজ্ঞালব্ধ অমর্ত্যভূমিতে দাঁড়িয়ে, যারা কাজ করে তাদের জন্য অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেছিলেন, বিপ্লবের জন্য যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে, তাদের উদ্দীপ্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আয়ুর অন্তিম লগ্নে, কণ্ঠস্বর

ক্ষীণ হয়ে এলেও, তাঁর অন্তিম বিশ্বাসে এতটুকু দোদুল্যমানতা ছিল না, তাঁর রচিত শেষতম সংগীত, 'ওই মহামানব আসে'।

প্রসঙ্গান্তরে যাই। তবে এই প্রসঙ্গ পরিবর্তনও আমার চেতনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের যে-সর্বসমাচ্ছন্নকারী উপস্থিতি, তাকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপনের লক্ষ্যেই। যে-বয়সে পৌঁছেছি, মৃত্যুচিন্তা এড়ানো অসম্ভব, এবং সেজন্যই ইচ্ছাপত্র গোছের কিছু বাসনার কথা ব্যক্ত করছি।

ধরে নিচ্ছি আমার মৃত্যু কালে তখনো কয়েকজন বন্ধু অবশিষ্ট থাকবেন। উদ্ধত সাহসের সঙ্গে আরো ধরে নিচ্ছি, তাঁরা হয়তো আমার জন্য একটি ক্ষুদ্রায়তন স্মরণসভার আয়োজন করবেন। সেই সভায়, আমার বিনীত অনুরোধ, স্মৃতিচারণ ধাঁচের বক্তৃতাদি একেবারে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান, একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই কিছু গান, যেন গাওয়া হয়। সভার যাঁরা আয়োজক, তাঁদের কাছে আগাম একটি আবদার-মেশানো আবেদন পেশ করে যাচ্ছি।

যদি ধরে নিই বিভিন্ন গায়ক-গায়িকা সব মিলিয়ে মাত্র পঁচিশটি গান গাইবার সুযোগ পাবেন, তার বেশি সময় পাওয়া যাবে না, আমি চাইবো যে-তালিকা উপস্থাপন করছি, সেই অনুযায়ী গানগুলি অনুগ্রহ করে যেন বাছা হয়। রবীন্দ্রনাথ আড়াই হাজারেরও বেশি গান লিখে গেছেন, তাদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশটি নির্বাচন করে তাদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা বিশুদ্ধ পাগলামো। যে-গানগুলি নীচের তালিকাভুক্ত করছি সেগুলি রবীন্দ্রনাথ-রচিত শ্রেষ্ঠতম পঁচিশটি গান কি না আমি জানি না কিন্তু তারা আমার প্রিয়তম। এটুকু ভাবা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না, আমার স্মরণসভায় আমার প্রিয় গানগুলিই গাওয়া হবে। এই বিশেষ ক'টি গানের সঙ্গে হয়তো কিছু স্মৃতি আলোড়ন, কোনো সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ স্মৃতি, কোনো বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার নীলাঞ্জন ছায়া লগ্ন অথবা কোনো আনন্দের ফিকে চেয়ে যাওয়া দ্যোতনা।

১ অশ্রুভরা বেদনা
২. আকাশভরা সূর্যতারা
৩. আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
৪. আজি ঝড়ের রাতে
৫. আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে
৬. আমার নিশীথরাতের বাদল ধারা
৭ আমি তখন ছিলেম মগন
৮ এ পরবাসে রবে কে হায়
৯ এক দিন চিনে নেবে তারে
১০. একদা তুমি প্রিয়ে
১১. এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
১২. ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন
১৩ কখন দিলে পরায়ে
১৪ কে দিল আবার আঘাত
১৫. ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি
১৬. খোলো খোলো দ্বার
১৭. জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
১৮. তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
১৯. দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
২০. ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া
২১. নিবিড় অমা তিমির হতে
২২. মেঘ বলেছে যাব যাব
২৩. যখন এসেছিলে অন্ধকারে
২৪. যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
২৫. স্বপ্নে আমার মনে হলো

তবে অতি সাধারণ মানুষ আমি, তাই আমারও লোভের শেষ নেই। কল্পনা করতে সাহস পাই, কে জানে, আমার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় একটি স্মরণ সভারও উদ্যোগ গ্রহণ করবেন অন্য কয়েকজন সুহৃদ্, এবং সেই সভাতেও হয়তো রবীন্দ্রনাথের পঁচিশটি গান গাওয়া বরাদ্দ থাকবে। সেই গানগুলির তালিকাও আমি মনে-মনে স্থির করে রেখেছি :

২৬. অনেক কথা যাও যে বলে
২৭. আকাশ আমায় ভরল আলোয়
২৮. আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে।
২৯. আঁধার রাতে একলা পাগল
৩০. আমার যাবার বেলায়
৩১ আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
৩২. আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
৩৩. এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
৩৪ ও চাঁদ, চোখের জলের
৩৫ কী বেদনা মোর জানো
৩৬. কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
৩৭. ক্ষমিতে পারিলাম না যে
৩৮. তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
৩৯. তুমি কিছু দিয়ে যাও
৪০. তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
৪১. দখিন হাওয়া জাগো জাগো
৪২. দীপ নিভে গেছে মম
৪৩. বঁধু কোন আলো লাগল চোখে
৪৪. বিরস দিন বিরল কাজ
৪৫. ভরা থাক স্মৃতি সুধায়

৪৬. মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ

৪৭. রাঙিয়ে দিয়ে যাও

৪৮. রোদন ভরা এ বসন্ত

৪৯. সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে

৫০. সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে

তবে মোটরগাড়ির ক্ষেত্রে যে-রেওয়াজ, একটি বাড়তি চাকা গাড়ির পিছনে বন্দী থাকে; রাস্তায় যদি কোনো একটি চাকা ফেঁসে যায়, বাড়তি চাকাটি খুলে নিয়ে জুড়ে গাড়িকে ফের সচল করা হয়। দুই স্মরণসভার জন্য রবীন্দ্রনাথের পঁচিশটি গানের আলাদা দুই তালিকা তৈরি করার পর আরো দশটি গানের কথা আমি ভেবে রেখেছি। যদি অবধারিত কারণবশত ওই পঞ্চাশটি গানের একটি-দুটি গাওয়ার মতো গায়ক কিংবা গায়িকাকে হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বন্ধুদের কাছে অনুরোধ নীচে, উল্লেখিত দশটি গান থেকে বেছে নিয়ে দয়া করে শূন্যস্থান পূরণ করে নেবেন তাঁরা :

৫১. আগুনের পরশমণি

৫২. আজ জ্যোৎস্নারাতে

৫৩. আনন্দধারা বহিছে ভুবনে

৫৪. আমার মল্লিকাবনে

৫৫. আমি চঞ্চল হে

৫৬. এনেছ ওই শিরীষ বকুল

৫৭. তবু মনে রেখো

৫৮. বসন্তে ফুল গাঁথল

৫৯. মধু গন্ধে ভরা

৬০. শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে